গোবিন্দকুমার সংস্কৃত গ্রন্থাবলী—১

শান্তিদেব কৃত

বোধিচর্য্যাবতার

প্রজ্ঞাপারমিতা নামক নবম পরিচ্ছেদ

প্রথম ভাগ

সম্পাদক

শ্রীগোপালদাস চৌধুরী

গোবিন্দকুমার সংস্কৃত গ্রন্থাবলী—১

শান্তিদেব কৃত

বোধিচর্য্যাবতার

প্রজ্ঞাপারমিতা নামক নবম পরিচ্ছেদ।

শ্রীগোপালদাস চৌধুরী এম্, এ, বি-এল

সম্পাদিত

শ্রীগোপেন্দ্রকুমার চৌধুরী এম্, এ, বি, এল্, কর্ত্তৃক

প্রকাশিত

৩২নং বিডন রো, কলিকাতা

সন ১৩৪০, ইং ১৯৩৩

মূল্য ॥০ আট আনা

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীগোপেন্দ্রকুমার চৌধুরী এম্, এ, বি, এল্
৩২ বীডন রো, কলিকাতা।

প্রিণ্টার—শ্রীনন্দলাল শীল
অক্ষয় প্রেস
২৭।৫ তারক চাটুর্য্যের লেন, কলিকাতা

সম্পাদকের নিবেদন।

আমরা ভারতীয়গণ যে যে বিষয়ে অন্যান্য দেশবাসী অপেক্ষা আপনাদিগকে অধিকতর গৌরবান্বিত মনে করি তন্মধ্যে সংস্কৃত ভাষা অন্যতম, এবং উক্ত ভাষার মধ্য দিয়া যে ভাবধারা পবিত্র জাহ্নবীর ন্যায় মানব সভ্যতার প্রথম যুগ হইতে অদ্যাবধি অপ্রতিহত গতিতে বহমান হইয়া আসিতেছে তন্মধ্যে ভারতীয় দর্শন শাস্ত্র—আর্ষ ও বৌদ্ধ উভয়ই—আমাদের প্রধানতম গৌরবের বিষয় সন্দেহ নাই।

সমস্ত ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের দুইটী দিক্ আছে—একটী হৃদয় শুদ্ধির ও সাধুতার দিক্ আর অন্যটি দর্শনের দিক্ বা বুঝা ও বুঝানর দিক্। দর্শনের দিকেই মতভেদ। নিজের অবলম্বিত দর্শনকে সত্য ও সম্যক্ মনে করাই মনুষ্যের স্বভাব। মনুষ্য তাহার অন্যথা করিতে পারে না। কেহই নিজের মতকে অসত্য মনে করে না কারণ তাহা করিলেই তৎক্ষণাৎ সে তাহা ত্যাগ করিবে। কিন্তু এরূপ হইলেও আত্মোপমায় পরমতকে যথা সম্ভব মৈত্রী ও মুদিতার সহিত দেখাই যথার্থ উদারতা। সম্প্রদায়ের উপরে উঠা মনুষ্যের পক্ষে অস্বাভাবিক ও অকল্পনীয় (কারণ অসাম্প্রদায়িকতাও এক সম্প্রদায় বিশেষ) কিন্তু সংকীর্ণ সম্প্রদায়াভিমান সম্যক্ ত্যাজ্য। আর হৃদয়শুদ্ধি ও সাধুতার দিকে সর্ব্বসম্প্রদায়ে প্রভূত ঐক্য আছে। উহা উন্মুক্ত আকাশের ন্যায়, সর্ব্বত্র গতিশীল বায়ুর ন্যায়, সুস্মিত চন্দ্রিকার ন্যায়, সূর্য্যের প্রকাশের ন্যায় ও মহার্ণবের ন্যায় সকল দেশজ সকল সম্প্রদায়ের যৌথ সম্প্রত্তি ও সমান উপভোগের বস্তু। উদাহরণ স্বরূপ সাংখ্যযোগের মৈত্রী করুণাদি ভাবনা ও যমনিয়মরূপ শীল এবং "সর্ব্ব পাপস্‌স অকরণং কুসলস্‌স উপসম্পদা। সচিত্তপরিয়োদপনং এতং বুদ্ধান সাসনং" ধম্মপদস্থ

এই বুদ্ধোক্তি উদ্ধৃত হইতে পারে। ইহা যে সমস্ত সাধু সম্প্রদায়ের সম্মত ও আদরণীয় তাহা বলা বাহুল্য।

মনের এইরূপ বিশ্বাস লইয়া আমি বহুবৎসর পূর্ব্বে আমার শিক্ষা গুরু শ্রীমৎ পূর্ণানন্দ শ্রমণ মহাশয়ের মহানুভাবতা ও অগাধ পাণ্ডিত্যের উপর নির্ভর করিয়া "গোবিন্দকুমার সিরিজ" নাম দিয়া কতকগুলি মূল্যবান্ পালিগ্রন্থের বঙ্গানুবাদ ও মৌলিক গবেষণাপূর্ণ পুস্তকাদি প্রচার করিয়া বৌদ্ধভাব সমূহের প্রসার ও বঙ্গভাষার সমৃদ্ধি বৃদ্ধির জন্য চেষ্টিত ছিলাম। কিন্তু বৌদ্ধ সাধারণের ও বঙ্গভাষার এবং বিশেষ করিয়া ব্যক্তিগত ভাবে আমার নিজের দুরদৃষ্টবশতই শ্রদ্ধেয় শ্রমণ মহোদয় অকালে মহাপ্রস্থান করায় আমার চেষ্টা ফলপ্রসূ হইতে পারে নাই। এই কারণেই প্রধানত পালি সিরিজের কোন পুস্তক আমরা বর্ত্তমানে প্রকাশ করিতে পারিতেছি না। আশা আছে অদূর ভবিষ্যতে আমরা কৃতকার্য্য হইতে পারিব।

আমার পিতৃদেব ৺গোবিন্দকুমার চৌধুরী মহাশয় বহু ভাষাবিৎ এবং অশেষ পাণ্ডিত্যের আধার ছিলেন। তিনি একজন পরম বৈষ্ণব-ভাবাপন্ন নৈষ্ঠিক হিন্দু ছিলেন এবং যৌবনাবধি মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত নক্তব্রতী থাকিয়া একান্ত ভাবে নির্জ্জনে ধর্ম্ম ও সাহিত্য চর্চ্চা করিয়া মানবের চরম কাম্য পরাগতি প্রাপ্ত হইয়াছেন। যদিচ একাধারে কর্ম্মও জ্ঞান-যোগীর দর্শনলাভ সুদুর্ল্লভ কিন্তু আমার পিতৃদেব বস্তুতই একজন উচ্চ-শ্রেণীর কর্ম্ম ও জ্ঞানযোগী ছিলেন। সংস্কৃতে তাঁহার অসাধারণ জ্ঞান ছিল এবং আমার বিশ্বাস সংস্কৃতভাষা তাঁহার অতি প্রিয় ছিল। এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়াই তাঁহার অন্তরাত্মার (আমরা হিন্দুমাত্রেই জীবের অবিনশ্বরতায় বিশ্বাসী) তৃপ্তিকল্পে "গোবিন্দকুমার সংস্কৃত সিরিজের" প্রথমগ্রন্থ বোধিচর্য্যাবতারস্থ প্রজ্ঞাপারমিতা সানুবাদ প্রকাশ করিলাম।

এই কার্য্য মোটেই সম্ভব হইত না যদি না ঋষিকল্প মনীষী পরম পূজনীয় শ্রীশ্রীমৎ সাংখ্যযোগাচার্য্য হরিহরানন্দ আরণ্য মহাশয়ের আন্তরিক সহানুভূতি ও পূর্ণ সহায়তালাভে সক্ষম হইতাম। উক্ত আরণ্য মহাশয় কৃত প্রজ্ঞাপারমিতার পাণ্ডিত্যপূর্ণ ভূমিকা এবং সহজবোধগম্য বঙ্গানুবাদ পাঠক মাত্রকেই মুগ্ধ করিবে এই দৃঢ় বিশ্বাস আমার আছে।

আমাদের আশা আছে পূজনীয় আরণ্য মহাশয়ের স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ থাকিলে এবং তাঁহার সহায়তালাভে সক্ষম হইলে অদূর ভবিষ্যতে আমরা উভয়বিধ গোবিন্দকুমার সিরিজেরই কলেবর বৃদ্ধি করিতে পারিব। আশা করি বর্ত্তমান গ্রন্থ সাধারণের অতি প্রিয় ও আদরের বস্তু হইবে এবং আমাদের উদ্দেশ্যের সফলতা দেখিয়া কৃতার্থ হইব।

বুদ্ধপূর্ণিমা
১৩৪০ সাল

শ্রীগোপালদাস চৌধুরী

সূচী।

অনুবাদকের বিজ্ঞাপন

পালি বা শুদ্ধ মাগধী এবং সংস্কৃত ভাষায় লিখিত বৌদ্ধ গ্রন্থ সকলে যে নির্ব্বাণধর্ম্ম ব্যাখ্যাত হইয়াছে তাহার সহিত আর্য নির্ব্বাণধর্ম্মের কতদূর ঐক্য আছে এবং যে অল্পমাত্র ভেদ আছে (যাহা প্রধানত নামেরই ভেদ) তাহা ভূমিকাত্রয়ে ও গ্রন্থমধ্যে সবিশেষ দেখান হইয়াছে। বৌদ্ধ গ্রন্থসকল প্রাকৃত, ভাঙ্গা-সংস্কৃত ও সংস্কৃত ভাষায় লিখিত। বৌদ্ধদের মূল প্রামাণ্য আগম সুত্ত বা সূত্র নামে অভিহিত। সূত্রে শাস্ত্রপ্রণয়ন করা বহু প্রাচীন প্রথা। বৃহদারণ্যকে কয়েক স্থলে "সূত্রাণি ব্যাখ্যানানি অনুব্যাখ্যানানি" এরূপ পাওয়া যায়। তাহাতে ধর্ম্মসূত্র, গৃহ্যসূত্র, দার্শনিক সূত্র প্রভৃতি সূত্রগ্রন্থসকল প্রচলিত হয়। বৌদ্ধেরাও প্রাচীন প্রথাবলম্বনে সূত্রে শাস্ত্র-প্রণয়ন করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদের সূত্রগ্রন্থসকল অত্যধিক স্ফীত এবং পুনরুক্তি দূষিত। ঋষিদের সূত্র-ভাষ্য-টীকা সব লইয়াও বৌদ্ধদের সূত্রা-পেক্ষা বোধ হয় সংক্ষিপ্ত ও সারবান্। হীনযানদের শাস্ত্র পালিতে লিখিত। কিন্তু বর্ত্তমান পালিগ্রন্থসকল যে প্রাচীনতম তাহা না হইতে পারে। সিংহলী হইতে যে অনেক গ্রন্থ পালিতে অনূদিত হইয়াছে, তাহা নিশ্চয়, আর কণ্ঠে কণ্ঠে বহু শত বৎসর থাকিয়া যে কত পরিবর্ত্তন হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই।

মহাযানদের মূল গ্রন্থ ভাঙ্গা সংস্কৃতে (গাথার ভাষায়) প্রথমে বোধ হয় ছিল, পরে বিশুদ্ধ সংস্কৃতে প্রণীত হয়। পালিগ্রন্থ সকলে দার্শনিক বিশদতা অতি অল্পই আছে এবং তদ্গত ন্যায়ও নিম্নশ্রেণীর। ব্রহ্মজাল শ্রামণ্যফল আদিতে পরমত খণ্ডন করিয়া স্বপক্ষ স্থাপন যেরূপভাবে করা হইয়াছে তাহা ঋষিদের গ্রন্থের তুলনায় অতি অবিশদ ও স্থূল গোছের। সংস্কৃত

বৌদ্ধগ্রন্থের যে ন্যায় তাহা তদপেক্ষা অনেক উন্নততর ও গৌতমের ন্যায়ের প্রতিদ্বন্দ্বী। ন্যায় ও দর্শন ব্যতীত আত্মরক্ষা করা কোন সম্প্রদায়ের পক্ষে সম্ভব নহে, তজ্জন্য বৌদ্ধেরাও নিজেদের অনুকূল ন্যায় ও ন্যায়মূলক দর্শন প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন। তাদৃশ ন্যায়ের মধ্যে দিঙ্‌নাগের ন্যায়ই প্রাচীনতম। তদপেক্ষা প্রাচীন বৌদ্ধ ন্যায়শাস্ত্র ছিল বটে কিন্তু অধুনা বিলুপ্ত। পরে ধর্ম্মকীর্ত্তি আদি উন্নততর ন্যায় দর্শন (ন্যায়দর্শন শুদ্ধ logic নহে, উহা logic মূলক metaphysics বা আন্বীক্ষিকী) প্রণয়ন করেন। বৌদ্ধদের যে ন্যায় তাহা অনেক অংশে সংকীর্ণ প্রথানুগত (conventional) এবং উহার গণ্ডীর ভিতর ফেলিয়া তাঁহারা পরমত খণ্ডনের প্রয়াস পাইয়াছেন। অসঙ্গত অনৈকান্তিক উদাহরণ, অন্তর্ব্যাপ্তি বা উদাহরণহীন ব্যাপ্তি, অপোহ বা কোন ভাব পদার্থ বলিলে উহ অভাবও কথিত হওয়া বা থাকা প্রভৃতিতে ফেলিয়া ফাঁকি বাহির করিয়া পরপক্ষ খণ্ডন ও স্বপক্ষ স্থাপন করার চেষ্টা প্রভৃত দেখা যায়। পাঠক গ্রন্থমধ্যে তাহা দেখিতে পাইবেন।

বৌদ্ধদের প্রাচীন গ্রন্থে পদার্থের লক্ষণ ন্যায়সঙ্গত প্রথায় মোটেই নাই। উহাতে কেবল সমার্থক কতকগুলি প্রতিশব্দ দিয়া লক্ষণ করা হইয়াছে, যেমন নির্ব্বাণ=শূন্য, অনিমিত্ত, অসংস্কৃত, অভাব ইত্যাদি। পরের লেখকেরা অবশ্য প্রকৃত লক্ষণা (যাহা ন্যায্য দর্শনের প্রধান অঙ্গ) দিয়াছেন। পালিতে বিশুদ্ধিমার্গে বুদ্ধঘোষ এবং নাগার্জ্জুনাদি সংস্কৃত গ্রন্থকারেরা প্রকৃত ও ন্যায্য লক্ষণা দিয়াছেন।

মাধ্যমিকেরা মায়াবাদী ছিলেন এবং নানা যুক্তি ও ন্যায়ের ফাঁকি দিয়া ঐ বাদ উপপন্ন করার চেষ্টা করিয়াছেন। জগৎ শূন্যমূল এবং যাহা দেখা যায় তাহা যে মায়া ইহাই তাঁহাদের মত, পাঠক গ্রন্থমধ্যে সবিশেষ দেখিতে পাইবেন। জগৎ মায়াময় ইহা অতি প্রাচীন ও যথার্থ মত।

সাংখ্যেরাও উহা বলেন, কিন্তু শূন্যের উপর যে এই মায়া এবং মায়া যে কিছু নহে অথবা অনির্ব্বাচ্য তাহা বলা সর্ব্বথা অন্যায্য।

ঋষিমতের মায়াবাদী বেদান্তীরা যুক্তিবিষয়ে অবিকল পূর্ব্ববর্ত্তী মাধ্যমিকদের অনুকরণ করিয়াছেন। গৌড়পাদ বোধ হয় উহার মূল উদ্ভাবয়িতা। তাঁহার কারিকায় অনেক বৌদ্ধশাস্ত্রস্থ শব্দ পাওয়া যায়। তবে শূন্যের পরিবর্ত্তে আর্ষমায়াবাদীরা ব্রহ্মপদার্থ গ্রহণ করিয়াছেন। শঙ্করাচার্য্য প্রধানতঃ আগম বা বেদকে প্রমাণস্বরূপ করিয়া উহা স্থাপন করার চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু পরবর্ত্তী গ্রন্থকারেরা (যেমন ভামতী কার বাচস্পতি খণ্ডন খণ্ড খাদ্য কার শ্রীহর্ষ প্রভৃতিরা) ঐ দার্শনিক দোষ শুধরাইতে যাইয়া অবিকল বৌদ্ধদের যুক্তির আশ্রয় লইয়াছেন।

মাধ্যমিকেরা মায়া (ও শূন্যকে) সৎও বলেন না অসৎও বলেন না। বেদান্তীরাও মায়াকে 'সদসদ্ভ্যামনির্বাচ্যা" বলেন। মাধ্যমিকদের যুক্তি এই যে সৎ ও অসৎ বিরুদ্ধ স্বভাব, তাহারা এক পদার্থে (বিকারী পদার্থে) থাকিতে পারে না অতএব বিকারী পদার্থ শূন্য। বেদান্তীরা ('ভামতী' দ্রষ্টব্য) ঠিক ঐ যুক্তিতে বলেন মায়া মিথ্যা (মিথ্যা অর্থে বৌদ্ধদের ন্যায় বেদান্তীরা বলেন—যাকে আছে বলিতে পারি না, নাই-ও বলিতে পারিনা)। কেহ কেহ মিথ্যা অর্থে "নাই" করেন এবং ব্রহ্মই আছে জগৎ নাই—এরূপ মনে করার চেষ্টা করেন। অন্যেরা বলেন—জগৎ ঐরূপ মিথ্যা, ব্রহ্ম উহার বিপরীত বা সত্য। বলা বাহুল্য সৎ-অসৎ, সত্য-মিথ্যা এই পদ সকলকে নিজেদের মনোমত অর্থে লক্ষিত করিয়া—উহাদের প্রসিদ্ধ অর্থ অপলাপিত করিয়া, এইরূপ অসঙ্গত বাদ স্থাপিত হয়। মায়া নাই বলা প্রলাপমাত্র, তাহাকে আছেও বলিব না নাইও বলিব না" এরূপ বলাও দর্শন নহে কিন্তু 'অদর্শন।' তাহাকে "এককে অন্য জ্ঞান" এরূপ ভ্রান্তি বলাই প্রকৃত দর্শন। সেই "এক" ও 'অন্য' এই দুই পদার্থ থাকিলে তবেই উহা সঙ্গত বাদ হয়। সেই দুই পদার্থ দ্রষ্টা পুরুষ ও দৃশ্য ত্রিগুণ।

দ্রষ্টাকে দৃশ্যবৎ মনে করা ভ্রান্তি এবং দৃশ্যকে দ্রষ্টা মনে করাও ভ্রান্তি, আর ত্রিগুণকে এই জগদ্রূপে দেখা যে মহা ইন্দ্রজাল বা মায়া তাহা বলাই বাহুল্য। সাংখ্য তাহাই বলেন। গুণানাং পরমং রূপং ন দৃষ্টিপথমৃচ্ছতি। যত্তু দৃষ্টিপথং প্রাপ্তং তন্মায়েব সুতুচ্ছকম্॥ ইহাই সাংখ্যের সম্যক্ দর্শন। শূন্যবাদ এবং বৌদ্ধদর্শন ও আত্মা' এই দুইটি পৃথক্ নিবন্ধ একত্র সংক্ষিপ্ত করিয়া তৃতীয় ভূমিকায় দেওয়া হইয়াছে। 'নৈরাত্ম্যবাদ ও আত্মবাদ' প্রবন্ধের কিয়দংশ মাত্র মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল।

শুদ্ধি।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
(৯)	১৯	১৫।১৬	১।১৫-১৬
(১৮)	৯	ওল্থারিক	ওল্হারিক
(১৮)	১৪	পারিসী পুরিয়ার	পারিপুরিয়ার
(১৮)	১৭	এবং পরম	এবং
(২৫)	৪	ভঙ্গনবাদ	ভঙ্গ বাদ
(২৬)	৯	নির্ম্মাণ।	নির্ম্মাণ-
(৩২)	৫	বুদ্ধৈরাত্মা	বুদ্ধৈর্নাত্মা
(৩৩)	৮	তিষ্ঠেদাপাক	তিষ্ঠত্যাপাক
৩৩)	৯	তৎ	সৎ
(৪২)	২৫	নিত্যত্বাদবহীয়তে	নিত্যত্বমবহীয়তে
(৪৮)	১৭	অক্ষ্যার্থা	অক্ষ্যর্থা
(৫৪)	৮	নৈকজাত্যন্বিত্যং	নৈকজাত্যন্বিতং
(৬২)	৯	বৈশ্য	বৈশ্ব
(৬৯)	৯	ভাবতা	ভাবনা

শান্তিদেব কৃত বোধিচর্য্যাবতারের নবম পরিচ্ছেদ

প্রজ্ঞা পারমিতা

ভূমিকা

১। বৌদ্ধ ধর্ম্মের ভিত্তি (পালি হইতে)।

(১৩১৪ সালের 'হিন্দু পত্রিকা'য় প্রকাশিত)

ভারতই মোক্ষ বা নির্ব্বাণ ধর্ম্মের জন্মভূমি। যে অবস্থায় দুঃখের একান্ত ও অত্যন্ত নিবৃত্তি হয় সেই ইন্দ্রিয় ও মনের অতীত অবস্থাকে নির্ব্বাণ-মুক্তি কহে। নির্ব্বাণসাধক আচরণসমূহ নির্ব্বাণধর্ম্ম। নির্ব্বাণ ইন্দ্রিয় ও মনের অতীত অবস্থা বলিয়া ইন্দ্রিয় ও মনকে সম্যক্ নিরুদ্ধ করাই নির্ব্বাণ-ধর্ম্মসমূহের শেষ ফল। সমাধি এবং ঐন্দ্রিয়িক ও মানস বিষয়ে সম্যক্ বৈরাগ্যই ইন্দ্রিয় ও মনকে সম্যক্ নিরোধ করার উপায়। সুতরাং সম্যক্ সমাধি ও সম্যক্ বৈরাগ্য (যোগশাস্ত্রের ভাষায় নিরোধসমাধি ও পর-বৈরাগ্য), নির্ব্বাণের মুখ্য ও সাধারণ উপায়।

বেদের মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ ভাগের ক্বচিৎ ক্বচিৎ এবং প্রধানত উপনিষদে নির্ব্বাণধর্ম্মের উপদেশ দেখা যায়। তদ্ব্যতীত বেদের অনুগত সাংখ্য ও বেদান্ত (শাঙ্কর) শাস্ত্রে নির্ব্বাণের উপদেশ পাওয়া যায়। বৌদ্ধ শাস্ত্রেও উহা পাওয়া যায়।

সমাধি ও বৈরাগ্য সম্বন্ধে সাংখ্যাদি আর্যশাস্ত্রে এবং বৌদ্ধশাস্ত্রে যেরূপ নির্ব্বাণধর্ম্মের বিধি আছে, তাহা যে বস্তুত এক তাহা নিম্নে প্রকাশিত হইতেছে।

১ আর্য শাস্ত্র ঃ তদেবার্থমাত্রনির্ভাসং স্বরূপশূন্যমিব সমাধিঃ। যোগসূত্র। অর্থাৎ ধ্যান বা চিত্তের একতানতা পরিপুষ্ট হইয়া যখন কেবল ধ্যেয় বিষয়মাত্রই বোধগোচর থাকে, আত্মহারার ন্যায় সেই ধ্যানই সমাধি।

১ বৌদ্ধশাস্ত্র ঃ কুসলচিত্তেকগ্‌গতা সমাধি। অবিক্খেপলক্খণং। অবিকম্পনং। বিসুদ্ধি মগ্‌গো, ৩অঃ। অর্থাৎ কুশল চিত্তের একাগ্রতা যাহা অবিক্ষেপলক্ষণ ও অবিকম্পন তাহাই সমাধি।

২ আঃ ঃ সমাধি ফলভেদে দুই প্রকার—বিভূতিমাত্র ফল ও কৈবল্য ফল। তন্মধ্যে সম্প্রজ্ঞাত ও অসম্প্রজ্ঞাত যোগ কৈবল্যফল আর কৈবল্য বিষয়ে অপ্রযুক্ত, সম্যক্ জ্ঞানের দ্বারা অননুবিদ্ধ সমাধিই বিভূতিমাত্র ফল।

২ বৌঃ ঃ বৌদ্ধদের সমাধিও গতিভেদে দ্বিবিধ—লৌকীয় ও লোকোত্তর। তন্মধ্যে 'তিসু ভূমিসু কুসলচিত্তেকগ্‌গতা লোকীয়ো সমাধি। অরিয়মগ্‌গ সম্পযুত্তা লোকুত্তরো সমাধি।' বিসুদ্ধি, ৩ অঃ। অর্থাৎ কামাবচর, রূপাবচর ও অরূপাবচর এই তিন ভূমিতে লৌকীয় সমাধি হয় আর আর্য্যমার্গের সহগত সমাধি লোকোত্তর. বৌদ্ধদেরও লৌকীয় সমাধির ফল সিদ্ধি বা দেবত্বপ্রাপ্তি ব্যতীত আর কিছু নহে।

৩ আঃ ঃ নির্ব্বাণের উপায় সংগ্রহ যথা "শ্রদ্ধাবীর্য্যস্মৃতিসমাধি-প্রজ্ঞাপূর্ব্বকমিতরেষাং।" যোগসূত্র। অর্থাৎ শ্রদ্ধা হইতে বীর্য্য, বীর্য্য হইতে স্মৃতি, স্মৃতি হইতে সমাধি ও সমাধি হইতে যোগজা প্রজ্ঞা এই উপায়ের দ্বারাই কৈবল্য হয়।

৩ বৌঃ ঃ "সদ্ধায় সীলেন চ বীরিয়েণ চ সমাধিনা ধম্মবিনিচ্ছয়েন চ" ইত্যাদি। ধম্মপদ ১০।১৬। অর্থাৎ শ্রদ্ধা, শীল, বীর্য্য, সমাধি, ধর্ম্ম-বিনিশ্চয় এবং বিদ্যাচরণসম্পন্ন ও স্মৃতিযুক্ত হইয়া দুঃখবিয়োগ লাভ করিবে। বৌদ্ধদের শীল, যোগীদের যম ও নিয়ম ছাড়া আর কিছু নহে। নিয়মের মধ্যে ঈশ্বর-প্রণিধান আছে। বৌদ্ধদের তাহা না থাকিলেও বুদ্ধানুস্মৃতি আছে। যোগীদের ঈশ্বর মুক্ত পুরুষ। বুদ্ধানুস্মৃতিও মুক্ত

পুরুষের প্রণিধান। 'বীতরাগবিষয়ং বা চিত্তং' এই যোগসূত্রানুসারে বুদ্ধ-প্রণিধানও যোগশাস্ত্রসম্মত। স্মৃতি একটি প্রধান সমাধিসাধন বৌদ্ধের ধর্ম্মবিনিশ্চয় এবং বিত্থা যোগের প্রজ্ঞা। সমাধির ফল যে প্রজ্ঞা তাহা বুদ্ধঘোষও বলেন, যথা, বিসুদ্ধি মগ্‌গো ১৪ অঃ "সমাধিতো যথাভূতং পজানাতি পস্‌সতীতি বচনতো পন সমাধি তস্‌সা (পঞ্‌ঞায়) পদট্‌ঠানং * ।"

৪ আঃ ঃ বিতর্ক, বিচার, আনন্দ ও অস্মিতা এই চারি পদার্থের অনুগমভেদে সবীজ সমাধি চারি প্রকার। 'যথা—বিতর্কবিচারানন্দাস্মিতা-রূপানুগমাৎ সম্প্রজ্ঞাতঃ'। যোগসূত্র। "তত্র প্রথমঃ চতুষ্টয়ানুগতঃ সমাধিঃ সবিতর্কঃ। দ্বিতীয়ো বিতর্কবিকলঃ সবিচারঃ। তৃতীয়ো বিচারবিকলঃ সানন্দঃ চতুর্থ স্তদ্বিকলোঽস্মিতামাত্র ইতি'। যোগভাষ্য। অর্থাৎ সবিতর্ক বিতর্কাদি চারি ভাবের অনুগত। সবিচার বিতর্ক-রহিত। সানন্দ বিচার-রহিত। সাস্মিত ঐ সব ও আনন্দ রহিত। সানন্দ সমাধি আনন্দানুভব-বিষয়ক সুতরাং আধ্যাত্মিক। ইহাতে হৃদয়মূলা সর্ব্বব্যাপী সাত্ত্বিকতা বা সুখ অনুভূত হয়। ভগবান্ পতঞ্জলি বলেন "নির্ব্বিচার-বৈশারদ্যেঽধ্যাত্মপ্রসাদঃ।"

---

* পাশ্চাত্য মতে বৌদ্ধশাস্ত্রাপেক্ষা যে সব প্রাচীন উপনিষদ্ আছে তন্মধ্যে ছান্দোগ্য একটি। তাহাতে আছে "আহারশুদ্ধৌ সত্ত্বশুদ্ধিঃ, সত্ত্বশুদ্ধৌ ধ্রুবাস্মৃতিঃ স্মৃতিলম্ভে সর্ব্বগ্রন্থীনাং বিপ্রমোক্ষঃ"। বৌদ্ধেরাও বলেন "একয়নো অয়ংভিক্‌খবে মগ্‌গো সত্তানং বিসুদ্ধিয়া * * যদিদং চত্তারো সতিপট্‌ঠানো।" মজ্ঝিম নিকায়ে সতিপট্‌ঠান সুত্তং। অর্থাৎ হে ভিক্ষুগণ এই যে চারিটী স্মৃতি প্রস্থান ইহারা প্রাণীদের বিশুদ্ধির জন্য একমাত্র উপায়। অতএব এই প্রধান স্মৃতিরূপ সাধন যে বৌদ্ধেরা প্রাচীন উপনিষদ্ হইতেই গ্রহণ করিয়াছেন তাহাতে সংশয় নাই।

অধ্যাত্ম ভাবের চরম সীমা অস্মি বা আমিমাত্র বোধ এই আমিত্ব-মাত্র-বিষয়ক সমাধিই যোগের সাস্মিত সমাধি। অনাত্ম বোধের অর্থাৎ ব্যবহারিক আত্মবোধের ইহা চরমসীমা। পঞ্চশিখাচার্য্য বলেন "তমণু-মাত্রমাত্মানম্ অনুবিদ্যাস্মীতি এবং তাবৎ সম্প্রজানীতে।"

৪ বেবাঃ ঃ 'সো বিবিচ্চেব কামেহি বিবিচ্চেব অকুসলেহি ধম্মেহি সবিতক্কং সবিচারং বিবেকজং পীতিসুখং পঠমং ঝানং উপসম্পজ্জ বিহরতি।' পোট্‌ঠপাদ সুত্তং। অর্থাৎ কাম ও অকুশল ধর্ম্ম হইতে পৃথক্ হইয়া সবিতর্ক সবিচার বিবেকজ বা বিবিক্ততাজনিত (ধ্যেয়ে তন্ময় হইয়া) প্রীতি সুখযুক্ত ধ্যানই প্রথম।

বৌদ্ধদের দ্বিতীয় ধ্যান "বিতর্কবিচার-রহিত আধ্যাত্মিক 'একোদি ভাব' বা একতানতা সহগত প্রীতিসুখ স্বরূপ"। (হংসাবতী) ধর্ম্ম সঙ্গনি, ২৮ পৃঃ। এই দ্বিতীয় নির্বিচার ধ্যানও, 'অজ্‌ঝত্তং সম্পসাদন'-লক্ষণে লক্ষিত (যোগের অধ্যাত্মপ্রসাদের ন্যায়)।

তৃতীয় ধ্যান প্রীতিশূন্য বা চিন্তাগত-হ্লাদশূন্য। তাহাতে "সুখং কায়েন পটিসম্বেদেতি" অর্থাৎ কায় বা ইন্দ্রিয়গত (করণগত) হ্লাদযুক্ত।

বৌদ্ধদের চতুর্থ ধ্যান সংজ্ঞাগ্রবিষয়ক, যথা, 'ততো খো পোট্‌ঠপাদ ভিক্‌খু ইধ সকসঞ্‌ঞী হোতি সো ততো অমুত্র ততো অমুত্র অনুপুব্বেন সঞ্‌ঞগ্‌গং ফুসতি।' সীলক্‌খন্ধের পোট্‌ঠপাদ সুত্তং। অর্থাৎ হে পোট্‌ঠপাদ, তদনন্তর ভিক্ষু স্বকসংজ্ঞী (স্ব বা আত্ম-সজ্ঞী) হইতে থাকেন ও পরে 'ইহা হইতে পৃথক্' 'ইহা হইতে পৃথক্' (উপনিষদের 'নেতি নেতি') এইরূপ ক্রমে সংজ্ঞার (সাধারণ আত্মসংজ্ঞার) অগ্র বা সীমা স্পর্শ করেন। ইহাই যোগের অস্মীতিমাত্র সাস্মিত সমাধি।

যোগশাস্ত্রের সবিতর্ক-সবিচারাদি সমাধির ন্যায় বৌদ্ধদেরও বিভাগ আছে। অথসালিনীর চিত্তুপ্‌পাদ কণ্ডে ধ্যানের পঞ্চক নয় দ্রষ্টব্য।

৫ আঃ ঃ সম্প্রজ্ঞাত যোগই কৈবল্যের সাক্ষাৎ উপায়। সবিতর্কাদি

সমাধিজাত প্রজ্ঞা চিত্তের সম্যক্ নিরোধে প্রযুক্ত হইলে তাহাকে সম্প্রজ্ঞাত যোগ বলে। যথা, 'যস্ত একাগ্রে চেতসি সদ্ভূতমর্থং প্রদ্যোতয়তি ক্ষিণোতি চ ক্লেশান্ কর্ম্মবন্ধনানি শ্লথয়তি, নিরোধমভিমুখং করোতি স সম্প্রজ্ঞাতো যোগঃ।' যোগভাষ্য ১।১। অর্থাৎ একাগ্রভূমিকায় উৎপন্ন যে সমাধি যাহা (১) যথাভূত বিষয় প্রকাশ করে, (২) ক্লেশ ক্ষয় করে, (৩) কর্ম্ম বন্ধন বিশ্লথ করে, এবং (৪) নিরোধকে অভিমুখ করে তাহাই সম্প্রজ্ঞাত যোগ, তাহার নিষ্ঠা সপ্ত প্রান্তভূমি প্রজ্ঞা। সেই প্রান্তপ্রজ্ঞা এবং পরবৈরাগ্য পূর্ব্বক সম্যক্ নিরোধ হইলে তাহাকে অসম্প্রজ্ঞাত যোগ কহে। তাহারই ফল কৈবল্য বা নির্ব্বাণমুক্তি। যে প্রজ্ঞায় জ্ঞাতব্য, ক্ষেতব্য ও হাতব্য শেষ হয় ও যৎপরে আর জ্ঞাতব্য, ক্ষেতব্য ও হাতব্য থাকে না তাহাই প্রান্তভূমি প্রজ্ঞা। ফলত যোগশাস্ত্রের সম্প্রজ্ঞাত যোগে—(ক) যথাভূত প্রজ্ঞা হয়; (খ) অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশরূপ ক্লেশ ক্ষয় পায়; (গ) কর্ম্মবন্ধন বা সংস্কার ক্ষীণ হয়; (ঘ) অবিদ্যাদিরা প্রান্তভূমি প্রজ্ঞার ও পর-বৈরাগ্যের দ্বারা সমূলে বিনষ্ট হয়।

৮ **বৌঃ।** লোকুত্তর মার্গ নির্ব্বাণের সাক্ষাৎ উপায়। তাহা চারি অবস্থায় বিভক্ত। তাহারা সকলেই 'নির্য্যানিক' বা বন্ধনচ্ছেদ করিয়া ঊর্দ্ধগতিশীল; 'অপচয়গামী' বা সংস্কারক্ষয়কারী সমাধি। তাহার প্রথম ভূমিতে 'অঞ্ঞাত ঞ্ঞস্সামীতিন্দ্রিয়ং' অর্থাৎ অজ্ঞাত জানিব—এইরূপ ইন্দ্রিয়শক্তি নিশ্চয় হয়। এবং তাহারা দিট্‌ঠিগতানং বা অযথা-জ্ঞানের প্রহাণকারী। দ্বিতীয় ভূমিতে কামরাগ এবং ব্যাপাদ বা হিংসার তনুভাব বা ক্ষীণতা হয়। তৃতীয় ভূমিতে কামরাগ ও ব্যাপাদের অনবশেষ প্রহাণ বা সমূলঘাতে নাশ হয়। চতুর্থ ভূমিতে রূপরাগ, অরূপরাগ, মান, উদ্ধচ্চ (ঔদ্ধত্য বা চিত্তের বিক্ষিপ্তাবস্থা) ও অবিদ্যার অনবশেষ প্রহাণ হয়। ইহাতে 'অঞ্ঞিন্দ্রিয়' অর্থাৎ জ্ঞাত, প্রাপ্ত, বিদিত সমস্ত ধর্ম্মের সাক্ষাৎকারবতী প্রজ্ঞা হয়, (বিশেষ ধর্ম্মসঙ্গনি ১।৫ দ্রষ্টব্য)। অতএব

বৌদ্ধশাস্ত্রের লোকুত্তর মার্গেও (ক) প্রজ্ঞা বা আজ্ঞা হয়। (খ) অবিদ্যা, ত্রিবিধ রাগ, ব্যাপাদ (দ্বেষ), অভিমান (অস্মিতা) এবং বিক্ষেপ ক্ষয় হয়। (গ) সংস্কার ক্ষয় হয় এবং বন্ধন ভেদ হয়। (ঘ) উহাদের অনবশেষ প্রহাণ হয়। ফলত উপর্যুক্ত ঋষিমতের সহিত এ বিষয়ে বৌদ্ধমত বস্তুত একই হইল।

৬আঃ। সম্প্রজ্ঞাতযোগ সম্যগাচরিত হইলে, নিরোধভূমিক অসম্প্রজ্ঞাতযোগ হয়। অসম্প্রজ্ঞাতযোগ সিদ্ধ হইলে ইহজীবনেই বিদেহকৈবল্য লাভ হয়।

৬ বৌঃ। বৌদ্ধ শাস্ত্রে এ বিষয়ের স্পষ্ট উল্লেখ দেখা যায় না তবে তাহাদের 'সংজ্ঞাবেদয়িত নিরোধ' সমাধি, যোগের নিরোধ সমাধির অনেক নিকট ও বোধ হয় একই। কিঞ্চ "আকাসে বসকুন্তানং গতি তেসং দুরন্নয়া"। 'সুঞ্ঞাগার পবিট্ঠস্স'। অর্থাৎ অর্হৎদের গতি আকাশে পক্ষীর গতির ন্যায় দুর্লক্ষ্য, শূন্যাগারে প্রবিষ্ট ইত্যাদি বচন হইতে উহা অনুমিত হয়। ফলে যে-চিত্ত সম্যক্ রাগশূন্য এবং সংজ্ঞাবেদয়িতারও নিরোধে অনুরক্ত তাদৃশ চিত্ত সমাহিত থাকিলে শেষে যোগের নিরোধ সমাধিতেই যাইবে। বৌদ্ধদের উপদিসেস নির্ব্বাণ এবং অনুপদিসেস নির্ব্বাণ এই দুইয়ের মধ্যে প্রথম অবস্থা ঠিক যোগের জীবন্মুক্তি এবং দ্বিতীয়টী বিদেহ মুক্তি। সংজ্ঞাবেদয়িতা = সংজ্ঞার বেদয়িতা ; সংজ্ঞা = প্রাথমিক নামাদিহীন বোধ = সাংখ্যের আলোচন জ্ঞান।

৭ আঃ। যোগমতে প্রথমকল্পিক, মধুভূমিক, প্রজ্ঞাজ্যোতি এবং অতিক্রান্ত-ভাবনীয় যোগীদের এই চতুর্ব্বিধ অবস্থা আছে। অতিক্রান্ত-ভাবনীয়স্থ প্রান্তভূমিপ্রজ্ঞাসম্পন্ন যোগীরাই সাক্ষাৎ কৈবল্য লাভ করেন। অন্যেরা দেহপাতে ব্রহ্মলোকে গমন করিয়া পরে মুক্ত হন।

(ক) সাংখ্য-যোগ মতে প্রজ্ঞার অন্যতম প্রধান বিষয়—হেয় বা

অনাগত দুঃখ, হেয়হেতু বা দুঃখহেতু, হান বা মোক্ষাবস্থা এবং হানোপায় বা যোগ।

(খ) সমাধির দ্বারা সিদ্ধি বা অলৌকিক ক্ষমতা হয়।

৭ বৌঃ। বৌদ্ধদের লোকোত্তরমার্গস্থদেরও চারি ভেদ আছে; যথা স্রোতআপন্ন, সকৃদাগামী, অনাগামী ও অর্হৎ। অর্হতেরাই পরিনির্ব্বাণ (বিদেহমুক্তি) লাভ করেন, অন্যেরা ব্রহ্মলোকে বা উচ্চ স্বর্গে গমন করেন ও পরে মুক্ত হন।

(ক) বৌদ্ধমতেও সম্যক্ দৃষ্টির বিষয় চারিটি যথা দুঃখ, দুঃখহেতু দুঃখনিরোধ ও দুঃখনিরোধের পথ। মার্গবিভঙ্গ সূত্র দ্রষ্টব্য।

(খ) সমাধির দ্বারা বৌদ্ধমতেও ইদ্ধি বা ঋদ্ধি অর্থাৎ অলৌকিক ক্ষমতা লাভ হয়।

৮ আঃ। সাংখ্যাদি মতে অবিদ্যাই বন্ধনের মূল। তাহার আদি নাই।

৮ বৌঃ। অবিদ্যা মূল সংযোজন (বন্ধন) ও মূল আসব। অত্থসালিনীতে উদ্ধৃত বুদ্ধ বচন হইতে জানা যায় যে অবিদ্যার আদি বা যাহার পূর্ব্বে অবিদ্যা ছিল না তাহা জানা যায় না।

৯ আঃ। "যে চৈতে মৈত্র্যাদয়ঃ ধ্যায়িনাং বিহারাঃ" যোগভাষ্যে উদ্ধৃত এই প্রাচীন সাংখ্যাচার্য্যের বচনে জানা যায় যে মৈত্রী, করুণা, মুদিতা ও উপেক্ষা এই চারিটী ধ্যায়ীদের বিহার।

৯ বৌঃ। মৈত্রী আদিকে বৌদ্ধেরা ব্রহ্ম-বিহার বলেন। সমস্ত বৌদ্ধশাস্ত্রের মতে উহা প্রাচীন সাধন। *

১০ আঃ। ধর্ম্মচর্য্যা দ্বিবিধ বাহ্য ও আধ্যাত্মিক। "বাহ্যং স্তুতি-

---

* যদিচ নিকায়-জাতকাদি সমস্ত বৌদ্ধগ্রন্থের মতে ব্রহ্মবিহার (এই নামই ইহার অবৌদ্ধ উদ্ভব সূচিত করিতেছে) বুদ্ধের পূর্ব্বকাল হইতে আছে তথাপি Rhys Davids উহা বৌদ্ধদের উদ্ভাবিত বলিতে চান।

দানাভিবাদনাদি চিত্তমাত্রাধীনং শ্রদ্ধাত্বাধ্যাত্মিকং...তয়ো মানসং বলীয়ঃ” যোগভাষ্য ৪।১১। “পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।” গীতা

তিনি আরও বলেন “But they have not been found in any Indian book that is not a buddhist work and therefore almost certainly exclusively buddhist” কিন্তু ইহা সম্পূর্ণ ভ্রান্তি। উদ্ধৃত সাংখ্যাচার্য্যের বচন ও যোগসূত্রস্থ ঐ সাধন তাহার প্রমাণ।

এতদ্ব্যতীত তিনি আরও কয়েকটী উদ্ভট তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, পূর্ব্বে ধ্যান ছিল বটে কিন্তু সমাধি বৌদ্ধদের আবিষ্কার। তাঁহার মতে “Samadhi has not yet been fonnd in any Indian book older than the Pitakas.” অথচ তিনি বৃহদারণ্যককে বুদ্ধাপেক্ষা প্রাচীন বলেন। তাহাতে আছে ‘সমাহিতো ভূত্বা” ইত্যাদি। প্রকৃতপ্রস্তাবে কঠ মুণ্ডক আদি উপনিষদের ভাষা বৌদ্ধদের ধর্ম্মপদের ভাষা অপেক্ষা যে বহু প্রাচীন তাহা ভাষাজ্ঞ পণ্ডিত মাত্রেই বুঝিতে পারেন (ডাঃ বেল্বল্‌কার কঠ আদিকে বুদ্ধাপেক্ষা বহু প্রাচীন বলিয়াছেন। প্রকাশক)। এ বিষয়ে পাশ্চাত্যদের কোনই নিশ্চায়ক যুক্তি নাই কেবল অবিশ্বাস ও অন্ধকারে ঢিল মারা মাত্র আছে। অবিশ্বাস মাত্রের দ্বারা কিছু প্রমাণ হয় না। যেরূপ ঐতিহ্য চলিয়া আসিতেছে তাহা গ্রহণ করাই ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব বিষয়ে সমীচীন পন্থা, যতদিন না প্রকৃত যুক্তির দ্বারা তাহার অন্যথা প্রমাণিত হয়।

ধ্যান ও সমাধি নির্ব্বিশেষে বৌদ্ধ ও আর্ষ শাস্ত্রে ব্যবহৃত হয়। ব্রহ্মজালসূত্রে শাশ্বতবাদীদের ধ্যানকে সমাধিপদের দ্বারা উল্লেখ করা হইয়াছে, এবং মার্গবিভঙ্গ-সূত্রেও বৌদ্ধদের চারিধ্যানকে সমাধি বলা হইয়াছে, যথা, ‘চতুত্থং ঝানং উপসম্পজ্জ বিহরতি অয়ং বুচ্চতি সম্মা সমাধি।” প্রগাঢ়তম ধ্যানই সমাধি।

১০ বৌঃ। এই সাংখ্যীয় তত্বটী (মানস ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব) বৌদ্ধ-ধর্ম্মেরও মূল তত্ব। বস্তুতঃ চিত্তমাত্রাধীন ধর্ম্মচর্য্যার বহুল প্রচার করাই বৌদ্ধদের বিশিষ্টতা। তবে বাহ্য ধর্ম্মও তাঁহাদের সম্যক্ ত্যাজ্য নহে, যথা, প্রজ্ঞাপারমিতায় "পুষ্প-ধূপ-মাল্য-বিলেপন-চূর্ণ-চীবর-ছত্র-ধ্বজ-ঘণ্টা-পতাকাভিঃ সুবর্ণরৌপ্যময়ৈশ্চ পুষ্পৈ র্দিব্যৈশ্চ বাদ্যৈঃ" ইত্যাদি বচনে বাহ্য পূজার বিধি দেখা যায় (৩০ বিবর্ত্ত)।

১১ আঃ। সাংখ্যমতে জগতের মূল উপাদান ও হেতু ঈশ্বরের সৃষ্ট নহে, কিন্তু অনাদি। জগৎ অনাদি কারণকার্য্য-পরম্পরা মাত্র। কিঞ্চ অনাদিমুক্ত ঈশ্বর ও হিরণ্যগর্ভাখ্য ব্রহ্মাণ্ডাধিপতি স্বীকৃত আছে।

১১ বৌঃ। বৌদ্ধশাস্ত্রেও জগতের উপাদান সকর্ত্তৃক নহে। কিঞ্চ উদীচ্য বা মহাযানেরা অনাদিমুক্ত আদিবুদ্ধ এবং অবলোকিতেশ্বর আদি জগৎপাতা স্বীকার করেন। আর উদীচ্য বা যাম্য দুইমতেই ব্রহ্মা, ইন্দ্র আদি স্বীকৃত আছে। (অগ্রে দ্রষ্টব্য)

১২ আঃ। পাপের দ্বারা নিরয়ে ও পুণ্যকর্ম্মের দ্বারা স্বর্গে গমন হয় এবং প্রেতের উপকারার্থ দানাদি করা কর্ত্তব্য। ইহা প্রাচীন ঋষিমত।

১২ বৌঃ। বৌদ্ধেরাও ইহা স্বীকার করেন। 'পাপকৃদ্ উভয়ত্রৈব ইহ প্রেত্য চ শোচতি। পুণ্যকৃদুভয়ত্রৈব ইহ প্রেত্য চ মোদতে'॥ ধর্ম্মপদ ১৫।১৬। 'এবমেব ইতো দিন্নং পেতানং উপকপ্পতি।' তিরোকুড্য সুত্তং। অর্থাৎ এইরূপে ইহলোকে দান করিলে প্রেতদের উপকারক হয়।

আর্ষদের ন্যায় পুণ্য ও পাপ কর্ম্ম হইতে মৃত্যুর পর দিব্য ও নারক শরীর গ্রহণ হয় ইহা বৌদ্ধমতেরও অঙ্গ, যথা, "যে কেচি বুদ্ধং সরণং গতাসে ন তে গমিস্সন্তি অপায়ং। পহায় মানুসং কায়ং দেবকায়ং পরিপূরেস্সন্তীতি॥" মহা সময়সুত্তং।

এই তালিকা হইতে পাঠক দেখিবেন যে তত্বতঃ বৌদ্ধ ধর্ম্ম ও

আর্যধর্ম্ম এক। তাহাদের সাদৃশ্য ও একত্ব আরও অনেক দেখান যাইতে পারে, কিন্তু বাহুল্যভয়ে দেখান হইল না। অবশ্য বুঝাইবার প্রণালী, পদার্থের গুণ প্রভৃতি সামান্য বিষয়ে বহু ভেদ আছে, কিন্তু মূল ধর্ম্মতত্ত্বে কিছু ভেদ নাই। ফলে প্রাচীন সাংখ্য ও যোগের উপর প্রধানতঃ বৌদ্ধধর্ম্ম স্থাপিত।

কিন্তু আধুনিক বৌদ্ধপক্ষীয়েরা ইহা সম্পূর্ণ স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন—"শীল, স্মৃতি, ব্রহ্মবিহার, সমাধি (চারি ধ্যান), রূপাবচর ধ্যান, অরূপ ধ্যান, ইহা সব বুদ্ধ অপেক্ষা প্রাচীন বটে (কারণ সমগ্র বৌদ্ধশাস্ত্রের তাহাই তাৎপর্য্য) * কিন্তু লোকোত্তর মার্গ বুদ্ধদেবের নিজের আবিষ্কার, তিনিই উহার আদি শাস্তা। আর্য শাস্ত্রে নির্ব্বাণের কথা নাই। তাহার মুক্তি ব্রহ্মলোকে গমন পর্য্যন্ত।" এ বিষয়ে বৌদ্ধদের যুক্তি এইরূপ—

(ক) লোকনাথ বুদ্ধ বলিয়াছেন "ইমে খোতে ভিক্‌খবে ধম্মা, গম্ভীরা, দুদ্দস্‌সা, দুরনুবোধা, সন্তা, পনীতা, অতক্কাবচরা, নিপুণা, পণ্ডিতবেদনীয়া, যে তথাগতো সয়ং অভিসঞ্ঞায় সচ্ছিকত্বা পবেদেতি। (ব্রহ্মজাল সুত্তং)। অর্থাৎ হে ভিক্ষুগণ! এই যে ধর্ম্ম সকল (লোকুত্তর) ইহারা গম্ভীর, দুর্দ্দর্শ, দুরনুবোধ, শান্ত, পনীত বা পূর্ণ (প্রণীত), তর্কমাত্রের অগোচর, নিপুণ বা সূক্ষ্ম ও পণ্ডিতবেদনীয়। তথাগত ইহা স্বয়ং

* Rhys Davids সাহেবও ইহা স্বীকার করিয়াছেন,—যথা,—Now it is perfectly true that of these thirteen (অর্থাৎ শীল সমাধি আদি হইতে লোকোত্তর মার্গ পর্য্যন্ত) consecutive propositions or groups of propositions, it is only the last, that is No, 13 (অর্থাৎ লোকুত্তর মার্গ) that is exclusively Buddhist,—Dialogues of the Buddha.

অভিজ্ঞার দ্বারা সাক্ষাৎ করিয়া প্রবেদন বা উপদেশ করিতেছেন। অতএব বুদ্ধই "লোকুত্তর" ধর্ম্মের আবিষ্কর্ত্তা।

(খ) বৌদ্ধদের 'সীলব্বত পরামাস' নামক সংযোজন বা বন্ধনের বিবরণে আছে, "ইতো বহিদ্ধা সমন ব্রাহ্মণানং" ইত্যাদি। (ধর্ম্ম সঙ্গনি। নিক্‌খেপ কণ্ডং)। অর্থাৎ এই শাস্ত্রের (বৌদ্ধ শাস্ত্রের) বাহিরে যে শীল ব্রতের দ্বারা শুদ্ধি ইত্যাদি তাহাই উক্ত বন্ধন। অতএব বৌদ্ধশাস্ত্রের বহির্ভূত অন্যশাস্ত্রের দ্বারা বন্ধনমোচন হয় না। অর্থাৎ তাহাতে নির্ব্বাণের প্রকৃত মার্গ নাই।

(গ) বৌদ্ধশাস্ত্রে সাংখ্যযোগিগণের উল্লেখ নাই। যদি তাঁহারা পারদর্শী হইতেন, তবে অবশ্য উল্লেখ থাকিত।

এই সকল যুক্তির উত্তরে বক্তব্য এই যে—আর্ষশাস্ত্রের মোক্ষ যে ব্রহ্মলোকে গমন পর্য্যন্ত, লোকাতীত নির্ব্বাণ মুক্তি যে আর্যশাস্ত্রে নাই, এই দৃষ্টি যে অজ্ঞতামাত্র পূর্ব্বেই তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে।

বৌদ্ধদের প্রথম যুক্তিতে যে 'তথাগত স্বয়ং সাক্ষাৎ করিয়া উপদেশ করিতেছেন' এই বাক্য আছে তন্মধ্যস্থ 'স্বয়ং' শব্দের অর্থে কেবল তথাগতই উহার আবিষ্কর্ত্তা—এরূপ নহে। উহার অর্থ—তথাগত নিজে সাক্ষাৎ করিয়া বলিতেছেন, শুনিয়া বা অনুভব না-করিয়া বলেন নাই।

বৌদ্ধদের 'দিট্‌ঠুপাদান' (মিথ্যাদৃষ্টি গ্রহণ করিয়া থাকা) নামক দোষের বিবরণে আছে "নত্থি লোকে সমনব্রাহ্মণা যে সমগ্‌গতা পটিপন্না। যে ইমঞ্চ লোকং পরঞ্চ লোকং সয়ং অভিঞ্‌ঞায় সচ্ছিকত্বা পবেদেন্তীতি।" (ধর্ম্ম সঙ্গনি। উপাদান গোচ্ছকং)। এস্থলে 'সয়ং'-শব্দের অর্থ ঠিক উপরের ন্যায়। বিশেষত কোন শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ যে সর্ব্বোচ্চ পদ লাভ করিয়া তদ্বিষয়ে উপদেশ করেন নাই এরূপ মনে করা একটী দুষ্ট মত। এই দুষ্ট মত (দিট্‌ঠুপাদান) অবশ্য বুদ্ধদেবের

ছিল না, অর্থাৎ তিনি অবশ্যই পারদর্শী সমন-ব্রাহ্মণের অস্তিত্ব স্বীকার করিতেন ও তাঁহাদিগের উপর শ্রদ্ধাবান্ ছিলেন।

বৌদ্ধপক্ষের তৃতীয় যুক্তিতে বক্তব্য এই যে—নির্ব্বাণধর্ম্ম যে পূর্ব্বকাল হইতে প্রচলিত ছিল, এই বিশ্বাসে সমগ্র বৌদ্ধ শাস্ত্র অনুপ্রাণিত। বৌদ্ধ-শাস্ত্রের সর্ব্বত্রই কতকগুলি সাধারণ বাক্য পাওয়া যায়। সেই সমস্ত সাধারণ বাক্য (Stock passages) সর্ব্বত্রই উদ্ধৃত দেখা যাওয়াতে—তাহা অতি প্রাচীন এবং বুদ্ধদেবের মুখনিঃসৃত বলিয়া অনুমিত হইতে পারে। তাঁহাদের—তৃতীয় ধ্যানের লক্ষণে আছে 'যন্তং অরিয়া আচিক্-খন্তি উপেক্খকো সতিমা সুখবিহারীতি'। অর্থাৎ ধ্যান-বিষয়ে আর্য্যেরা বলেন 'উপেক্ষক, স্মৃতিমান্, সুখবিহারী'। ইহা এক সাধারণ বাক্য। এই বাক্যস্থ আর্য্যেরা কে? বুদ্ধদেব কোন্ আর্য্যদের কথা উদ্ধৃত করিয়া-ছেন? অবশ্যই তৎপূর্ব্বেকার যোগাচার্য্যদের বাক্য। তাঁহাদেরই বুদ্ধদেব আর্য্য বা পারদর্শী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ('কতমো পুগ্‌গলো অরিয়া? অট্‌ঠারিয় পুগ্‌গলা অরিয়া, অবসেসা পুগ্‌গলা অনরিয়া'। পুগ্‌গল পঞ্‌ঞত্তি, এককং। অর্থাৎ বুদ্ধ-প্রত্যেকবুদ্ধাদি অষ্ট প্রকার পুরুষই আর্য্য)। ঐ ধ্যান-চর্চ্চা যে পূর্ব্ব হইতেই ছিল, বুদ্ধের শিক্ষক অড়ার-কালাম (যাঁহাকে অশ্বঘোষ বুদ্ধচরিতে সাংখ্যমতাবলম্বী বলিয়াছেন) তিনি যে ঐ সব ধ্যানে পারদর্শী ছিলেন, বৌদ্ধ শাস্ত্রে তাহার স্পষ্ট উল্লেখ আছে। মজ্‌ঝিম নিকায়, অত্থসালিনী প্রভৃতি দ্রষ্টব্য। ইহাতে কোন কোন বৌদ্ধেরা বলিবেন যে উহা পূর্ব্বতন বুদ্ধদের উক্তি অনুসারে বলা হইয়াছে। কিন্তু ইংরাজী বচনে বলিলে 'That is looking too far back' কারণ পূর্ব্ব-বর্ত্তী কাশ্যপ বুদ্ধের ২০,০০০ বৎসর পরমায়ু ছিল। তাঁহার ধর্ম্ম ৭০,০০০ বৎসর বর্ত্তমান ছিল, পরে লোপ হইবার বহু বহু সহস্র বৎসর পরে গৌতম বুদ্ধের আবির্ভাব হয়।

প্রকৃত পক্ষে বুদ্ধের কথাবার্ত্তা বলিয়া যাহা প্রসিদ্ধ—তাদৃশ অধিকাংশ

বৌদ্ধশাস্ত্রই তাঁহার অনেক পরে রচিত। যেমন 'ব্রহ্মজাল সূত্র', ইহার শেষে আনন্দ বক্তা থাকাতে উহা আনন্দের পরবর্ত্তী কাহারও দ্বারা রচিত বুঝিতে হইবে। বিশেষত বুদ্ধ যখন ঐ সূত্র বলেন তখন দশ হাজার লোকধাতু কম্পিত হইয়া উঠিয়াছিল ইত্যাদি অলীক কথা থাকাতে, যখন তাদৃশ কথা নিঃসঙ্কোচে বলা যাইতে পারে তাদৃশ উত্তরকালে উহা (বা ঐ অংশ) রচিত বলা যাইতে পারে। সেইরূপ যে-সমস্ত সূত্রে বুদ্ধ, পূর্ব্ববুদ্ধ বা স্বীয় পূর্ব্ব জন্মের কাহিনী বলিয়াছেন সেই সব সূত্রও কাল্পনিক, বস্তুত তাহারা উত্তরকালে বুদ্ধের মাহাত্ম্য ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠতা ও একটি একটি ধর্ম্মনীতি ব্যাখ্যার জন্য রচিত হয়।

একথা নিশ্চয় ছিল যে বুদ্ধ তাঁহার পূর্ব্ব হইতে প্রচলিত যোগচর্য্যা অবলম্বন পূর্ব্বক সিদ্ধ হইয়াছিলেন এবং তাঁহার ধর্ম্ম মূলত পূর্ব্বপ্রচলিত ধর্ম্মের অধমর্ণ *। কিন্তু পাছে তাঁহার মাহাত্ম্যের হানি হয়, পাছে প্রচলিত শাস্তা সকল হইতে তাঁহার পৃথক্ত্বের ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্বেরহানি হয় ইত্যাদি কারণে তাঁহার অধমর্ণতা বৌদ্ধশাস্ত্রকারগণ স্বীকার করিতে নিতান্ত অনিচ্ছু। বস্তুত পৃথিবীর সমস্ত ধর্ম্মপ্রবর্ত্তয়িতার ভক্তগণ নিজেদের আদর্শ পুরুষকে ঐরূপ করিয়া গিয়াছেন। বৌদ্ধশাস্ত্রে অশেষ প্রকারে বুদ্ধের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিবার যেরূপ মুখ্য ও গৌণ সুকৌশল দেখা যায় তাহাতে স্পষ্টই জানা যায় যে, বৌদ্ধেরা উহাকে অতি উচ্চদরের কলা কৌশলে (fine artএ) পরিণত করিয়াছিলেন। এ পর্য্যন্ত পৃথিবীতে এবিষয়ে কেহই তাঁহাদের পরাজয় করিতে পারেন নাই।

উক্ত কারণে বৌদ্ধশাস্ত্রকারগণ প্রাচীন কোনও প্রকৃত ব্যক্তির নাম করেন নাই। কেবল স্ব স্ব ধারণার অনুরূপ কতগুলি প্রাচীন শাস্তা কল্পনা করিয়া গিয়াছেন এবং স্বর্গ লোককেও গোঁড়া বৌদ্ধের দ্বারা

* R. Davids বলেন Buddha was a Hindu and the best of the Hindus.

অধিবাসিত করিয়া গিয়াছেন। ('মোদন্তি বত ভো দেবা তাবতিংসা সইন্দকা। তথাগতং নমস্সন্তা ধর্ম্মস্স চ সুধম্মতন্তি'—মহাগোবিন্দ সুত্তং)। এ বিষয়ে দু একটি উদাহরণ দিলেই পাঠক বুঝিতে পারিবেন। দীর্ঘ নিকায়ের মহাপদান সূত্রে বুদ্ধ কতকগুলি পূর্ব্ব বুদ্ধের বিবরণ বলিয়াছেন বলিয়া উক্ত হইয়াছে। বৌদ্ধদের এই প্রচলিত ভদ্রকল্পের পূর্ব্বে ৯১তম কল্পে বিপস্সী (সংস্কৃত বিপশ্চিৎ), ৩১তম কল্পে সিখী, এই কল্পে ককুসন্ধো [ক্রকুসন্ধ], কোণগমনো [কনকমুনি] ও কাশ্যপ বুদ্ধ হইয়াছিলেন। গৌতম বুদ্ধের মত ঠিক তাঁহাদের সমস্তই ছিল, মায় সিদ্ধ হইবার এক একটি 'বোধিদ্রুম' পর্য্যন্ত। তাঁহারা ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয় জাতীয় [ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় ব্যতীত কেহ বুদ্ধ হয় না] এবং কাশ্যপাদি গোত্রীয় ছিলেন। তবে কেহ রাজগৃহে, কেহ বারাণসীতে, কেহ পাঞ্চালদেশে জন্মগ্রহণ করেন। আর তাঁহাদের আয়ু ৮০,০০০ বৎসর হইতে ২০,০০০ বৎসর পর্য্যন্ত! এমন কি গৌতমের ন্যায় তাঁহাদের শরীরের ভস্মাবশেষ রাখিবার জন্য এক বা অধিক চৈত্যেরও উল্লেখ আছে (ইহা 'আর্য্যভদ্রকল্পিক' নামক মহাযান সূত্রে আছে, ঐ সূত্রে আরও ১০০৩ ভবিষ্যবুদ্ধের উল্লেখ আছে)।

আর এক উদাহরণ মহাসুদর্শন সূত্র। তাহাতে বুদ্ধদেব পূর্ব্বজন্মে কুশীনারায় ঐ নামীয় চক্রবর্ত্তী রাজা ছিলেন এরূপ বিবরণ আছে। কুশীনারার নাম কুশাবতী ছিল। তাহা অতি সমৃদ্ধ নগর ছিল। তাহাতে স্বর্ণ, রৌপ্য, স্ফটিক, বৈদূর্য্য লোহিতাঙ্ক (Blood Stone ?) ও সর্ব্ব-রত্নময় সাত প্রাকার ছিল। প্রাকারে চারি চারি ঐ ঐ রত্নময় দ্বার ও দ্বারে ঐ ঐ রত্নময় সাত সাত, দশ মানুষ উচ্চ স্তম্ভ ছিল। আর কুশাবতীতে সপ্ততাল-পংক্তি ছিল, ঐ সকল তাল ঐ ঐ রত্নময়। কোনটার সোণার স্কন্ধ, রূপার পাতা, মণির ফল; কোনটার বা রূপার স্কন্ধ, সোণার পাতা, মণির ফল ইত্যাদি। আর মহাসুদর্শন রাজার পক্ষীরাজ হাতী ও ঘোড়া ছিল এবং তাঁহার ৮৪,০০০ করিয়া স্ত্রী, প্রাসাদ, পালংখাট, রথ.

প্রা, আদি ছিল। তিনি ৮৪,০০০ বৎসর বাল্য, ৮৪,০০০ বৎসর যৌবন ইত্যাদি পরিমিত আয়ুষ্ক ছিলেন, ইত্যাদি ইত্যাদি।

এই স্বর্ণরৌপ্য মণি আদি লইয়া বালোচিত কল্পনার পর এই সূত্রে যে সুন্দর ধর্ম্মনীতি আছে তদ্বিষয়ে অবশ্য কোন কথা নাই। তাহা যথা, অনিচ্চা বত সংখারা উপ্‌পাদবয় ধম্মিনো। উপ্‌পজিত্বানিরুজ্‌ঝন্তি তেসং বূপসমো সুখোতি॥ অর্থাৎ অনিত্যা-বত সংস্কারা উৎপাদব্যয় ধর্ম্মিণঃ। উৎপদ্য চ নিরুন্ধতি তেষাং ব্যূপশমঃ সুখঃ॥

বুদ্ধদেব অবশ্য অলৌকিক জ্ঞানসম্পন্ন ছিলেন, কিন্তু যিনি সত্য এবং বাক্, কায় ও মনের ঋজুতার বিষয়ে এত উপদেশ করিয়া গিয়াছেন, তিনি যে এরূপ বালোচিত কল্পনার দ্বারা স্ব-মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিবেন তাহা কখনই বিশ্বাস্য নহে। ফলতঃ তাঁহার ভক্তগণ কয়েক শতাব্দ পরে তাঁহার শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদন করার জন্য ঐ সব গল্প রচনা করিয়াছেন এবং প্রাচীন কোনও প্রকৃত ব্যক্তির নিকট তাঁহার অধমর্ণতা স্বীকার করেন নাই, কতকগুলি কাল্পনিক উপাখ্যান সৃজন করিয়া গিয়াছেন মাত্র।

বৌদ্ধগণ আরও বলেন, ভগবান্ যদি তাঁহার শিক্ষকদের নিকট নির্ব্বাণ ধর্ম্ম সম্যক্ শিখিতেন, তাহা হইলে তাঁহাকে বোধি মূলে ছয় বৎসর 'দুষ্ক্রিয়া' বা কঠোর আচরণ করিতে হইত না। বোধিমূলে গৌতম যে সাধন করিয়াছিলেন তাহার যে বিবরণ অধুনা পাওয়া যায় তাহা বুদ্ধের অনেক পরে লিপিবদ্ধ হয় এবং তাহা বহু পরিমাণে অলীক কল্পনা-মিশ্রিত। সহস্র-বাহু মার, মারবধূ, মারানুচর প্রভৃতির সহিত যুদ্ধ, গৌতম মনে কি কি চিন্তা করিয়াছিলেন তাহার বিবরণ, ব্রহ্মাদি দেবগণের আগমন ও অনুরোধ ইত্যাদি বিষয় যে অলীক কল্পনা তাহা বিজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেই বুঝিবেন। তাদৃশ কাল্পনিক আখ্যায়িকার রচয়িতারা বুদ্ধের অধমর্ণতার অপলাপ করিয়া মৌলিকতা সম্যক্ প্রতিপাদিত করিবার জন্য ঐরূপ কথা প্রতিপাদিত করিয়া গিয়াছেন।

বস্তুত মোক্ষমার্গের জ্ঞান হইলেই নির্ব্বাণ সিদ্ধ হয় না, কঠোর সাধনের দ্বারাই তাহা সিদ্ধ হয়। গৌতম ছয় বৎসর ব্যাপী প্রযত্নের দ্বারা সমাধিসিদ্ধ ও বুদ্ধ হইয়াছিলেন। বৃহদারণ্যকে আছে 'বিদ্যয়া তদারোহন্তি যত্র কামাঃ পরাগতাঃ। ন তত্র দক্ষিণা যন্তি নাবিদ্বাংসস্তপস্বিনঃ॥' অতএব গৌতম যদি মোক্ষবিরোধী কোন কঠোর তপঃ করিয়া থাকেন তাহা হইলে তিনি পূর্ব্ব-প্রচলিত মোক্ষবিদ্যায় কতক অনভিজ্ঞ ছিলেন ইহা অবশ্যই বলিতে হইবে। আর যদি তিনি পূর্ব্ব-প্রচলিত ঔপনিষদ মোক্ষবিদ্যায় সুশিক্ষিত ছিলেন ইহা স্বীকার করা যায় (বৌদ্ধেরা বলেন তিনি সমস্ত বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন) তাহা হইলে তিনি উপনিষদুক্ত প্রথায় 'অকাম, নিষ্কাম, আপ্তকাম' হইয়া 'পরম, অজর, অমৃত' পদে সমাহিত হইতে পারিয়াছিলেন। ইহা পরে দেখান হইবে যে উপনিষদুক্ত পরম পদকে তিনি অতিক্রম করেন নাই এবং কেহ করিতেও পারে না। তবে তিনি যে প্রাকৃত ভাষায় মৌলিক ভাবে মোক্ষতত্ত্বের উপদেশ দিয়াছিলেন তাহা নিশ্চয় ; এবং সেই সূত্রাবলম্বন করিয়া তদীয় ভক্তগণ পরে তাঁহাকে মোক্ষমার্গের অদ্বিতীয় আবিষ্কর্ত্তা বলিয়া প্রতিপাদন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

পাশ্চাত্যদের মধ্যেও কেহ কেহ সাংখ্য ও যোগকে অপ্রাচীন মনে করিয়া বৌদ্ধদের প্রাচীনতা স্বীকার করেন। তাঁহাদের যুক্তি এইরূপ দেখা যায় ঃ—

(১) বৌদ্ধশাস্ত্রে ৬২ প্রকার মত নিরসিত হইয়াছে, কিন্তু তাহাতে সাংখ্যমতের উল্লেখ বা নিরসন নাই *। (২) সাংখ্যীয় শাস্ত্র গ্রন্থ সকল অপ্রাচীন ও তাহা বৌদ্ধমত হইতে গৃহীত।

* তবে ব্রহ্মজাল সূত্রে এরূপ এক মতের উল্লেখ আছে যে—যাঁহারা "মীমংসা বা যুক্তির দ্বারায় আত্মা সিদ্ধ করেন।" তাহা আর্যমতের

অন্ধদের হস্তি-দর্শন-ন্যায়ের মত পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের নির্ব্বাণ ধর্ম্মের আলোচনা করা। তাঁহাদের ভাষায় নির্ব্বাণধর্ম্মশাস্ত্রের কোন শব্দ নাই বলিলেই হয় এবং তাঁহারা উহার বহিস্তর ব্যতীত অন্তরের কিছুই বুঝেন না। এরূপ ক্ষেত্রে তাঁহাদের পক্ষে মোক্ষসম্বন্ধীয় দার্শনিক মত বিচার-পূর্ব্বক কোনও তত্ত্ব স্থির করা যে সর্ব্বতোভাবে ভ্রমপূর্ণ হইবে তদ্বিষয়ে সংশয় নাই। যাহা হউক তাঁহাদের যুক্তি কতদূর সঙ্গত তাহা দেখা যাউক।

বৌদ্ধশাস্ত্রে যে ৬২ প্রকার মত নিরসিত হইয়াছে তাহা সমস্তই মোক্ষ-ধর্ম্মের প্রতিপক্ষ। তাহারা যেমন বৌদ্ধদের হেয় সেইরূপ আর্যমোক্ষ-শাস্ত্রেরও হেয়। সুতরাং এরূপ হইতে পারে যে যোগমত বুদ্ধদেবের নিকট অনবদ্য ছিল বলিয়া তাহাই তাঁহার অবলম্বিত ছিল সেজন্য তিনি উহার নাম করিয়া উহার বিরুদ্ধে কিছু বলেন নাই, এবং তজ্জন্য পরবর্ত্তী বৌদ্ধশাস্ত্রকারগণও সে বিষয়ে কিছু বলিতে পারেন নাই। ব্রহ্মজাল-সূত্রে আছে যে 'পূর্ব্ব প্রচলিত কোন কোন অবৌদ্ধেরা আতপ্প, পধান, অনুযোগ, অপ্রমাদ, ও সম্যক্ মনসিকারের দ্বারা সমাধিসিদ্ধ হন, তাহাতে তাঁহাদের চিত্ত পরিশুদ্ধ, পর্য্যবদাত, অনঙ্গন ও উপক্লেশশূন্য হয়'। এই পূর্ব্ব প্রচলিত সাধন বৌদ্ধেরাও অবিকল গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু যাহারা উহার দ্বারা ক্ষুদ্র সিদ্ধিলাভ করিয়াই কৃতার্থম্মন্য হন তাঁহাদেরই নিন্দা বৌদ্ধেরা করেন। অতএব পূর্ব্ব-প্রচলিত যোগ-সাধন যে বৌদ্ধেরা গ্রহণ করিয়াছেন তাহা নিশ্চয়। *

আত্মাকে লক্ষ্য করিয়া উক্ত হইতে পারে। কিন্তু সাংখ্যেরা আত্মাকে যে জন্য শাশ্বত বলেন, বৌদ্ধেরা তাহার উল্লেখ না করিয়া অন্যরূপ বলাতে উহা কাহাকে লক্ষ্য করিতেছে তাহা সংশয়স্থল। বৌদ্ধেরা সাংখ্যবিদ্যায় যে অত্যন্ত অনভিজ্ঞ ছিলেন, তাহাও নিশ্চয়।

* গৌতম স্বকালে অপর সব শাস্তা অপেক্ষা সম্যক্ শীলসম্পন্ন হইতে

ফলতঃ যে ব্রহ্মজালসূত্রে ঐ ৬২ মত হেয় বলিয়া উক্ত হইয়াছে তাহাতে পুনঃ 'ন ইতো বহিদ্ধা'—এই বাক্যের দ্বারা আর তাহা ছাড়া অন্য কুমত নাই এরূপ বলা হইয়াছে। যেমন, শাশ্বতবাদী যাহারা আছে তাহারা সেই গ্রন্থোক্ত চারিপ্রকারের, তদ্ব্যতীত আর কোনরূপ শাশ্বতবাদী নাই, ইত্যাদি।

কিন্তু আবার পাশ্চাত্যগণের মতে যাহা বুদ্ধাপেক্ষা বহু প্রাচীন উপনিষৎ সেই বৃহদারণ্যকে ও ছান্দোগ্যে যে ব্রহ্মপ্রাপ্তির উপদেশ আছে বৌদ্ধশাস্ত্রে তাহার মোটেই উল্লেখ নাই। ক্লীবলিঙ্গ ব্রহ্মশব্দ, তত্ত্বমসি, ওঙ্কারমূলক সাধন, আত্মা (বৌদ্ধদের মতেও ওল্থারিক বা স্থূল, মনোময় এবং সংজ্ঞাময়—এই ত্রিবিধ আত্মা আছে, কিন্তু উহার অতিরিক্ত ঔপনিষদ আত্মার উল্লেখ নাই), দহর-পুণ্ডরীক বিদ্যা (বৌদ্ধেরা ইহারও কিছু গ্রহণ করিয়াছেন) প্রভৃতির নাম গন্ধও ব্রহ্মজালাদি বৌদ্ধসূত্রে পাওয়া যায় না। অতএব বৌদ্ধসূত্রে সাংখ্যমতের উল্লেখ না থাকাতে উহার

পারিতেন, কিন্তু ঐ 'সীলপারিসীপুরিয়ার' তিনি আবিষ্কর্ত্তা নন। অনেকে মনে করেন অহিংসা ধর্ম্ম বৌদ্ধদেরই আবিষ্কার, ইহা সম্পূর্ণ ভ্রান্তি। বস্তুত বৌদ্ধশাস্ত্রে অহিংসা শব্দের ব্যবহার প্রায়ই নাই, 'পানাতিপাত পটিবিরত' এবং পরম 'অব্যাপাদ' এই শব্দদ্বয় অহিংসাস্থলে বহুশ ব্যবহৃত দেখা যায়।

হিংসাভয়ে গলিত পত্র-ফল ভক্ষণ প্রভৃতি কঠোর নিয়ম গৌতমের বহু পূর্ব্বকাল হইতে প্রচলিত ছিল। কি পূর্ব্বে কি পরে বৌদ্ধাপেক্ষা আর্যমতাবলম্বিগণ অধিকতর অহিংসাপরায়ণ ছিলেন। আর্যমোক্ষমার্গী-দের নিকটও পশুবলি আদি 'নিয়মাবচ্ছিন্ন' অহিংসা সম্যক্ পরিহার্য্য ছিল। যোগসূত্রে যে অহিংসার সার্ব্বভৌম মহাব্রতের নির্দ্দেশ করা আছে তাহা অপেক্ষা বিশুদ্ধতর অহিংসাব্রতের উল্লেখ জগতে কোথাও নাই।

অপ্রাচীনতা প্রমাণ হয় হয় না ; কিন্তু উহা বুদ্ধ যে হেয় পক্ষে নিক্ষেপ করেন নাই ইহাই অনুমিত হয়।

প্রত্যুত দশোপনিষদ্ অপেক্ষা অপ্রাচীন বলিয়া খ্যাত শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্‌ও যে বুদ্ধের পূর্ব্ববর্ত্তী ইহা পাশ্চাত্যগণের যুক্তিপ্রণালী (বলা বাহুল্য প্রত্নব্যবসায়ীদের এরূপ যুক্তিপ্রণালী সর্ব্বথা অপ্রতিষ্ঠ) অবলম্বন করিয়া প্রমাণিত হইতে পারে। শ্বেতাশ্বতরে 'কালঃ স্বভাবো নিয়তির্যদৃচ্ছা ভূতানি যোনিঃ কবয়ো বদন্তি', ইত্যাদি যে পূর্ব্ববর্ত্তী প্রধান প্রধান মত উক্ত হইয়াছে তাহার কোনওটি বৌদ্ধমত নহে। বৌদ্ধেরাও ঐ সব মত খণ্ডন করিয়াছেন। বুদ্ধের সমসাময়িক আজীবকাদি সম্প্রদায়ের সহিত ইহার কোন কোন মতের সাদৃশ্য আছে বটে, কিন্তু তাহা যে সেই সময়ে উদ্ভাবিত তাহার কোন প্রমাণ নাই, তাহা তৎপূর্ব্বে সহস্র বৎসর হইতেও প্রচলিত থাকা সম্ভব। আর শ্রুতির মধ্যে শ্বেতাশ্বতর উপনিষদেই প্রাণায়ামের বিশেষ উপদেশ আছে। বুদ্ধও প্রথমে প্রাণায়াম করিয়াছিলেন। মানবাদি ধর্ম্মশাস্ত্রেও প্রাণায়াম গৃহীত দেখা যায়। মনুর ন্যায় প্রাচীন গ্রন্থ (যাহাতে বৌদ্ধ মতের বিন্দুমাত্রও আভাস নাই), শ্রুতিই যাহার একমাত্র প্রমাণ, তাহা যে বেদবিহিত না হইলে প্রাণায়াম গ্রহণ করিয়াছে তাহা কখনই সম্ভবপর নহে। সুতরাং উহা শ্বেতাশ্বতর হইতেই গৃহীত হইয়াছে বলিতে হইবে। বুদ্ধ ও তৎসময়ের আর্ষমতাবলম্বী প্রাণায়ামিগণের অবশ্য ঐ শ্রুতিই প্রমাণ ছিল।

মনুর প্রাচীনতার দুই একটি যুক্তি এস্থলে নিবদ্ধ হইতেছে। মনুতে সহমরণ প্রথার কিছুমাত্রও প্রসঙ্গ নাই, কিন্তু মহাভারতের মূল ঘটনা অনুসারে মাদ্রী পাণ্ডুর সহিত সহমৃতা হন। গ্রীকদূত মেগাস্থেনিস্ খৃষ্টপূর্ব্ব চতুর্থ শতাব্দে মগধে ঐ প্রথা সম্পূর্ণ প্রচলিত দেখিয়া যান। চতুর্বিংশতি সহস্র শ্লোকাত্মক যে মূল মহাভারত বেদব্যাস রচনা করেন তাহা অতি প্রাচীন। আশ্বলায়ন, পাণিনি প্রভৃতির পূর্ব্বে যে মহাভারতের

মূল আখ্যায়িকা প্রচলিত ছিল তাহা তাঁহাদের গ্রন্থ হইতে জানা যায়। যখন সহমরণের ন্যায় এক প্রাচীন বিষয় মনুতে নিবদ্ধ নাই, কিন্তু মহাভারতের মূল ঘটনায় নিবদ্ধ রহিয়াছে তখন মনু যে তদপেক্ষা (ও পাণিনি মেগাস্থানীস্ অপেক্ষা) বহু প্রাচীন তৎপক্ষে সংশয় নাই। মনুতে ত্রিগুণ, পুরুষ, প্রকৃতি আদি সাংখ্যীয় পদার্থের প্রসঙ্গ আছে। আর মনুতে যে সন্ন্যাসচর্য্যা আছে, বৌদ্ধ ভিক্ষুদের শীল তাহাকে কোন অংশেই অতিক্রম করেনা।

পাশ্চাত্য মতানুযায়ী উপনিষদের মধ্যে সর্ব্বপ্রাচীন বৃহদারণ্যকে যে মোক্ষ ও তদাচরণ উক্ত হইয়াছে, বৌদ্ধেরা তাহার অধিক কিছুই বলেন নাই। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে সমাধি ও সম্যক্ বিরাগ মুক্তির কেবল মাত্র উপায়। বৌদ্ধেরাও তাহাই করেন ঋষিরাও তাহাই করেন। মোক্ষধর্ম্ম সম্বন্ধে বৃহদারণ্যকে এইরূপ আছে যথাঃ—'শান্ত, দান্ত, উপরত তিতিক্ষু ও সমাহিত হইয়া—আত্মাতে আত্মাকে অবলোকন করিবে,' 'যদা সর্বে প্রমুচ্যন্তে কামা যেঽস্য হৃদিশ্রিতাঃ', 'অকামঃ, নিষ্কামঃ, আপ্তকামঃ,' 'পুত্রৈষণা, বিত্তৈষণা, লোকৈষণা' ইত্যাদি ত্যাগ। ফলতঃ যিনি শান্ত, দান্ত, উপরত ও তিতিক্ষু হইয়া কেবল অভ্যন্তরে সমাহিত হন আর যাঁহার হৃদয় সম্যক্ কামনাশূন্য তাদৃশ পুরুষাপেক্ষা বৌদ্ধেরা কিছুই উত্তম আচরণ করেন না। হৃদয়ের সমস্ত কামনা ত্যাগ অপেক্ষা আর উচ্চ আচরণ কি হইতে পারে? (বৌদ্ধদেরও নির্ব্বাণ অর্থে বান বা তৃষ্ণার ত্যাগ)। বৌদ্ধশাস্ত্রে যে ৬২ প্রকার কুমত আছে ইহা তাহার অন্তর্গত নহে। সেই ৬২ প্রকার কুমত কেন হেয় তাহার কারণ বৌদ্ধেরা এইরূপ বলেন— 'সব্বে তে ছহি ফস্সায়তনেহি ফুস্স ফুস্স পটিঘং বেদন্তি। তেসং বেদনা পচ্চয়া তন্হা। তন্হা পচ্চয়া জাতি। জাতিপচ্চয়া জরামরণং সোক পরিদেব দুঃখং দোমনস্সুপায়াসা সম্ভবন্তি' (ব্রহ্মজালসূত্র)। অর্থাৎ সেই ৬২ প্রকার কুমতাবলম্বীদের সকলেরই ছয় স্পর্শায়তনের (রূপাদি

আয়তনের) সংস্পর্শে পটিঘ বা ইন্দ্রিয়জবোধ উৎপন্ন হয়। তাহা হইতে সুখদুঃখ বেদনামূলক তৃষ্ণা হয়। তৃষ্ণা হইতে উপাদান বা গ্রাহ্যভাব হয়। উপাদান হইতে ভব বা জন্মের বীজ হয়। ভব হইতে জন্ম হয়। জন্ম হইতে জরা, মরণ, শোক, পরিবেদন, দুঃখ, দৌর্ম্মনস্য, উপায়াসা বা নৈরাশ্য হয়।

কিন্তু উপনিষদুক্ত প্রথায় সর্ব্বকামনাশূন্য হইয়া বাক্য ও মনের অগোচর পরম পদার্থে সমাহিত হইলে বাহ্যসংস্পর্শও হয় না, এবং তৃষ্ণাও হইতে পারে না, আর অন্য কোন দোষও হয় না। তবে ঋষিগণ বলেন যে তখন ব্রহ্মে বা আত্মায় স্থিতি হয় আর বৌদ্ধগণ বলেন নির্ব্বাণে বা অসঙ্খত ধাতুতে বা শূন্যে স্থিতি হয়। ঐ দুই পদেও ভেদাভেদ 'বৌদ্ধদর্শন ও আত্মা' প্রবন্ধে উক্ত হইয়াছে।

বৃহদারণ্যকে অর্চ্চিরাদিমার্গে ব্রহ্মালোকে গমন পূর্ব্বক একপ্রকার সংসারমোক্ষ বা অ-পুনরাবৃত্তি স্বীকৃত আছে। আর—'ন তস্য প্রাণা উৎক্রামন্তি ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মাপ্যেতি'—এই প্রকার বিদেহ-কৈবল্যরূপ সর্ব্বোচ্চ পদও স্বীকৃত আছে। বৌদ্ধদের অনাগামিত্ব এবং (অর্হতের) পরিনির্ব্বাণ উহারই অনুবর্ত্তন।

পাশ্চাত্যদের দ্বিতীয় যুক্তিতে বক্তব্য এই যে প্রচলিত সাংখ্য গ্রন্থের মধ্যে ঈশ্বরকৃষ্ণের কারিকা, সাংখ্যসূত্র ও সভাষ্য যোগসূত্র এই তিন গ্রন্থ প্রধান। খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে (এবং পূর্ব্বেও) চীন ভাষায় সাংখ্যকারিকার (হিরণ্যসপ্ততি বা সুবর্ণসপ্ততি বা কনকসপ্ততি) অনুবাদ হয়, অতএব ঐ গ্রন্থ তাহার পূর্ব্বে কোনও সময়ে রচিত। কেহ কেহ বলেন খৃষ্টাব্দের কিছু পূর্ব্বে উহা রচিত। উহাতে উক্ত আছে যে কপিল হইতে আসুরি আদি শিষ্যপরম্পরাক্রমে ঈশ্বরকৃষ্ণ উহা শিক্ষা করিয়া গ্রথিত করিয়াছেন, আর উহা আখ্যায়িকা ও পরবাদ বর্জ্জিত। ইহাতে বোধ হয় বর্ত্তমান সাংখ্যসূত্রের ন্যায় সাংখ্য গ্রন্থসকল ঈশ্বরকৃষ্ণের পূর্ব্বে বিদ্যমান ছিল।

শঙ্করাচার্য্য উহা হইতে কোনও সূত্র উদ্ধৃত করেন নাই বলিয়া যে উহা শঙ্করাপেক্ষা অপ্রাচীন তাহা যথার্থ নহে। বস্তুত শঙ্কর দুই একস্থলে মাত্র সাংখ্য বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন, বহু বহু উদ্ধৃত করিলে বরং ঐ মত সম্ভবপর হইত। তবে ঐ সূত্রগ্রন্থে পরবর্ত্তী অনেক আচার্য্য যে স্বকালে প্রচলিত পরবাদের খণ্ডনার্থ স্বরচিত সূত্রসকল প্রক্ষিপ্ত করিয়াছেন তাহা নিশ্চয়। কিন্তু উহাতে প্রাচীন সাংখ্যমতের যে অধিকাংশ রক্ষিত হইয়াছে—তাহাতে সন্দেহ নাই। অনেক সূত্র কারিকার সহিত অবিকল মিলে

প্রচলিত সাংখ্যগ্রন্থের মধ্যে যোগভাষ্যই প্রধান। বিজ্ঞানভিক্ষু বলেন 'সাংখ্যাদি দর্শনান্যেব অস্যৈবাংশেষু কৃৎস্নশঃ' অর্থাৎ সাংখ্যাদি সমস্ত দর্শন এই ব্যাস ভাষ্যেরই অংশে সংস্থিত। বেদব্যাস-রচিত বলিয়া প্রসিদ্ধ এই গ্রন্থ অতি প্রাচীন, এমন কি প্রচলিত বহু বৌদ্ধশাস্ত্রাপেক্ষাও প্রাচীন, ইহার প্রাচীন ও অপ্রচলিত শব্দপূর্ণ সরল ভাষা, প্রাচীন ও অধুনালুপ্ত গ্রন্থ হইতে বচন উদ্ধার প্রভৃতি ইহার প্রাচীনতার সম্যক্ প্রমাণ। 'শ্রামণ্যফল সূত্র' একখানি অতি প্রাচীন বৌদ্ধ গ্রন্থ, তাহাতে এই যোগভাষ্যের বচন প্রায় অবিকল উদ্ধৃত দেখা যায়, যথা প্রাকাম্য ও প্রাপ্তিসিদ্ধি সম্বন্ধে যোগভাষ্য—'ভূমাবুন্মজ্জতি নিমজ্জতি যথোদকে অঙ্গুল্যগ্রেণ স্পৃশতি চন্দ্রমসম্,' ৩।৪৫। শ্রামণ্যফল সূত্র যথা,—'পথবিয়াপি উম্মুজ্জ নিমুজ্জং করোতি সেয্যথাপি উদকে। ইমেপি চন্দিম সূরিয়ে এবং...পাণিনা পরামসতি পরিমজ্জতি'।

বলিতে পার শ্রামণ্যফলসূত্র হইতে ঐ বাক্য যোগভাষ্যে উদ্ধৃত হইতে পারে। কিন্তু তাহা সম্ভবপর নহে আর্ষশাস্ত্রকারগণ যে বেদবাহ্য বৌদ্ধশাস্ত্র হইতে উহা উদ্ধৃত করিয়াছেন একথা সর্ব্বথা অসম্ভব। কিঞ্চ যোগভাষ্যে উহা উদ্ধৃত বচন বলিয়া বোধ হয় না। কিন্তু বৌদ্ধশাস্ত্রে উহা যে অবৌদ্ধদের পূর্ব্বপ্রচলিত শ্রামণ্যফল তাহার স্পষ্ট নিদর্শন আছে।

বৌদ্ধেরা অনেক প্রাচীন ও পূজ্য শব্দ সকলকে নিজেদের অভিমত অর্থ দিয়া নিজেদের শাস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইয়াছেন এরূপও দেখা যায়, যথা—'যো সীলব্বত সম্পন্নো পহিতত্তো সমাহিতো। চিত্তং যস্ত বসীভূতং একগ্গং সুসমাহিতং॥ পূব্বে নিবাসং যো বেদী সগ্গাপয়ঞ্চ পস্সতি। অথ জাতিক্খয়ং পত্তো অভিঞ্ঞা বোসিতে' মুনি॥ এতাহি তিহি বিজ্জাহি তেবিজ্জো হোতি ব্রাহ্মণঃ॥' (অঙ্গুত্তর নিকায়। তিক নিপাতে ব্রাহ্মণ বগ্গো)। অর্থাৎ তিন বেদের বিত্তায় ত্রয়ীবিত্যাবিৎ হয় না, কিন্তু যিনি শীলব্রত সমাপন্ন প্রহিতাত্মা (বীর্য্যবান্) ও যিনি প্রজ্ঞাভাবিত তিনি ঐ তিন প্রকার বিদ্যার দ্বারা ত্রয়ীবিৎব্রাহ্মণ হন। তাঁহাকেই আমি (বুদ্ধদেব) ত্রয়ীবিৎ বলি। অন্যেরা কেবল লপিতলাপক।

শ্রামণ্যের সর্বোচ্চ লোকুত্তর মার্গফল তাহাকেই বৌদ্ধেরা কেবল নিজেদের আবিষ্কার মনে করেন।

চতুর্দ্দশ ভুবন ও সেই সেই ভুবনের যাহারা অধিবাসী তাহাদের বিবরণ যোগভাষ্যে যেরূপ আছে বৌদ্ধশাস্ত্রেও তদনুরূপ দেখা যায়। ঐরূপ ভুবনের বিবরণ কেবলমাত্র যোগভাষ্যেই দেখা যায়। উহা যোগসম্প্রদায়ে প্রচলিত বিদ্যা। বুদ্ধবচন হইতেও দেখা যায় যে বুদ্ধের সময়ে ও পূর্ব্বে অনেকে সমাধিসিদ্ধ হইয়া ঐ সব লোকে যান বা তদ্বিবরণ অবগত হন। আর ত্রয়স্ত্রিংশদেব, ইন্দ্র, ব্রহ্মপুরোহিত,ব্রহ্মলোক প্রভৃতিও বৌদ্ধদের আবিষ্কৃত নহে। সুধর্ম্মা, দেবসভা, যম, বৈশ্রবণ প্রভৃতিও পূর্ব্বে প্রচলিত ছিল।

অতএব যেহেতু আর্যশাস্ত্রের মধ্যে যোগভাষ্যেই ঐরূপ চতুর্দ্দশভুবনের প্রাচীনতম বিবরণ আছে এবং বৌদ্ধশাস্ত্রেও যখন উহা গৃহীত দেখা যায় আর যখন উহা বৌদ্ধের নিজস্ব নহে, তখন উহা যোগভাষ্য হইতেই গৃহীত বলিয়া অনুমান করাই সঙ্গত। অবশ্য বৌদ্ধেরা উহার কিছু কিছু পরিবর্ত্তন করিয়াছেন এবং উহার কতকগুলিকে রূপাবচর, কতকগুলিকে অরূপাবচর ইত্যাদি নিজেদের উদ্ভাবিত সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত করিয়াছেন।

যাম্য বৌদ্ধেরা ব্রহ্মলোককেই সর্ব্বোচ্চ লোক রাখিয়াছেন, আর উদীচ্য বৌদ্ধেরা ব্রহ্মলোক হইতে ব্রহ্মাকে নীচে নামাইয়া, বোধিসত্ত্বলোক ও আদি বুদ্ধলোককে সর্ব্বোচ্চে বসাইয়াছেন, কিন্তু পরিনির্বৃত কোনও বুদ্ধকে বা অর্হৎকে লোক মধ্যে রাখা যাম্য বৌদ্ধশাস্ত্রের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ। পালি বৌদ্ধশাস্ত্রে বুদ্ধ বলিয়াছেন যে, যতদিন তাঁহার শরীর আছে ততদিনই সকলে তাঁহাকে দেখিতে পাইবে। পরিনির্ব্বাণের পর আর দেবমনুষ্য কেহ তাঁহাকে দেখিতে পাইবে না। এইমত যোগদর্শনের অনুরূপ।

পাশ্চাত্যগণ যে বলেন 'Buddhism' was a protest against the prevailing animism—ইহাও অসার কথা। চন্দ্রদেব, সূর্য্যদেব, দেবরাজ ইন্দ্র প্রভৃতি সম্বন্ধে বুদ্ধের পূর্ব্বে যেরূপ ধারণা প্রচলিত ছিল তাহা 'animism' হউক আর যাহাই হউক, বুদ্ধও সেইরূপ গ্রহণ করিয়াছেন। বায়ুদেবতা ইন্দ্র, দেবরাজরূপে বহুপূর্ব্ব হইতেই প্রখ্যাত হইয়াছিলেন। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে (প্রথম পঞ্চিকা। ১১) ইন্দ্রের বাবতা প্রভৃতি মহিষীর উল্লেখ তাহার প্রমাণ। বৌদ্ধগণও ঐরূপ ইন্দ্র গ্রহণ করিয়াছেন। বস্তুত 'animism' পদার্থের দ্বারা পাশ্চাত্যগণ যে ভারতীয় ধর্ম্মের ব্যাখ্যান করেন তাহা ভ্রান্ত ধারণার উপর স্থাপিত।

যোগভাষ্যকার স্থানে স্থানে ক্ষণিক বিজ্ঞানবাদের খণ্ডন (যদিও সূত্রের মধ্যে ঐ বাদের কুত্রাপি প্রসঙ্গ নাই) করিয়াছেন, ইহাতে অনেকে বলিবেন তবে তিনি ক্ষণিক বিজ্ঞানবাদী নাগর্জ্জুনের (খৃষ্টপূর্ব্ব প্রথম শতাব্দী অথবা তৎপরে) পরের লোক। একথাও সর্ব্বথা অসার। ক্ষণিক বিজ্ঞানবাদ বহুপূর্ব্বের। বিজ্ঞান পদার্থ বৌদ্ধেরা উপনিষৎ হইতে লইয়াছেন। বিজ্ঞান পরিণামী পদার্থ, প্রতিক্ষণে তাহার ভিন্ন ভিন্ন বা (একাগ্রতায়) একজাতীয় পরিণাম হয়। অতএব বিজ্ঞান সেই পরিণামের প্রবাহস্বরূপ। আর্যেরা বলেন বিজ্ঞানের মূলে এক অন্বিত সৎপদার্থ আছে—বিজ্ঞানবৃত্তি সকল যাহার পরিণাম বা যাহার উপর বিজ্ঞান-প্রবাহ

বিবর্ত্তিত। কিন্তু বৌদ্ধদর্শনে সেই মৌলিক সৎপদার্থ বা substance স্বীকৃত নাই। তাঁহাদের মতে পূর্ব্বাপর বিজ্ঞানের কোনও বাস্তব সম্বন্ধ নাই।

প্রাচীনতম বৌদ্ধ পিটকশাস্ত্রে এইরূপ ক্ষণিক বিজ্ঞানবাদের ('ক্ষণভঙ্গনবাদ' নামটি বোধ হয় পরে প্রদত্ত হইয়াছে। যোগভাষ্যে উহাকে 'বৈনাশিক' বলা হইয়াছে) ভূয়োভূয়ঃ প্রসঙ্গ আছে। দীর্ঘনিকায়ের 'পোট্‌ঠপাদ সুত্ত' দ্রষ্টব্য। বুদ্ধ এই মতের আবিষ্কর্ত্তা অথবা ইহা পূর্ব্ব হইতে ছিল কিনা (বৌদ্ধেরা বলেন যে বৌদ্ধশাস্ত্র পূর্ব্ব হইতে ছিল) তাহার স্থিরতা নাই। ফলতঃ পিটক রচনার পূর্ব্বে এবং বুদ্ধের পরে যে সময়ে ভারতে বৌদ্ধমতের খুব চর্চ্চা হইতেছিল সেই সময়ে যে যোগভাষ্য রচিত হইয়াছে (অর্থাৎ খৃষ্টপূর্ব্ব চতুর্থ বা পঞ্চম শতাব্দে) তাহা উক্ত যুক্তি হইতে অনুমিত হইতে পারে।

যোগসূত্রের প্রথম পাদের ৩২, ১৩ এবং চতুর্থ পাদের ২০, ২১ প্রভৃতি সূত্রের ভাষ্যস্থলে ভাষ্যকার ক্ষণিক বিজ্ঞানবাদের প্রসঙ্গ করিয়াছেন। কিন্তু সর্ব্বস্থানেই প্রসঙ্গক্রমে উহার উত্থাপন করিয়াছেন, কোনও সূত্রেই ঐ বিষয়ে স্বার্থ নাই। তবে সেই সেই সূত্রে সূচিত তত্ত্বানুসারে ক্ষণিক বিজ্ঞানবাদ যে অন্যায্য তাহা ভাষ্যকার দেখাইয়াছেন মাত্র।

যোগসূত্রে বৌদ্ধমত বা অন্যান্য কোনও দর্শনের মতের প্রসঙ্গ না থাকাতে, উহা সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন বলিয়া অনুমিত হইতে পারে। কিঞ্চ সাংখ্যযোগ যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন, ইহা ভারতের চিরন্তন ধারণা। বৃহদারণ্যক উপনিষদে আসুরি পতঞ্জলি প্রভৃতি প্রধান প্রধান কতকগুলি নাম পাওয়া যায়। সেই প্রাচীন কোনও পতঞ্জলি যোগসূত্রের প্রণেতা। এইরূপ প্রবাদ আছে যে ভগবান্ অনন্ত পুনঃপুনঃ অবতীর্ণ হইয়া যোগসূত্র, চরক ও মহাভাষ্য প্রণয়ন করেন। অতএব যোগসূত্রকার ও মহাভাষ্যকার এক ব্যক্তি না হওয়াই সম্ভব। বিশেষত যোগসূত্রের ও মহাভাষ্যের মতের ভিন্নতা দেখা যায়। যিনি যোগসূত্রে জগতে অতুলনীয় চিন্তার গাম্ভীর্য্য

দেখাইয়াছেন, যিনি পরমার্থ তত্ত্বকে বিশুদ্ধ ন্যায়ালঙ্কৃত নির্ম্মল যুক্তির দ্বারা স্বচ্ছ ও প্রোজ্জ্বল করিয়াছেন, তিনি যে ব্যাকরণ মহাভাষ্যে আবার অনর্থক অন্যরূপ মত প্রচার করিবেন তাহা মোটেই সম্ভবপর নহে। অতএব যোগসূত্রকার, চরক-রচয়িতা ও মহাভাষ্যকার যে পৃথক্ পৃথক্ ব্যক্তি তাহা নিঃসঙ্কোচে বলা যাইতে পারে।

পঞ্চশিখাচার্য্যকৃত সাংখ্যের যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন গ্রন্থ ছিল তাহা হইতে উদ্ধৃতবচন এই যোগভাষ্যে পাওয়া যায়। তদ্ব্যতীত বার্ষগণ্য আচার্য্যের বচন ও কোন কোন লুপ্তশ্রুতি হইতে উদ্ধৃত বচনও পাওয়া যায়। সেই এক পঞ্চশিখ বচন হইতে জানা যায় যে আদিবিদ্বান্ কপিল নির্ম্মাণ। চিত্তাধিষ্ঠান পূর্ব্বক আসুরি ঋষিকে সাংখ্যতন্ত্র উপদেশ করেন। আসুরি উহা ঋষিসমাজে প্রচার করেন। বুদ্ধের পরে যেমন ভারতে ধর্ম্মচর্চ্চার অভ্যুদয় হয় সেই সময়েও কপিলের মাহাত্ম্যে ঋষিসমাজে জ্ঞানযোগের চর্চ্চার অভ্যুদয় হয়, ('কাপিলং মণ্ডলং মহৎ' হয়) ইহা মহাভারতের প্রাচীন সংবাদ হইতে জানা যায়। ইহা ঋষিযুগের কথা, মহাভারতে ইহাকে ধর্ম্মযুগ বলা হইয়াছে। বুদ্ধের সময়ে কেহ ঋষি ছিলেন না তাহা দ্রষ্টব্য। অতি পুরাকালে যে ঋষিযুগ ছিল—তখনও লোকের এইরূপ ধারণা ছিল, তাহা বৌদ্ধশাস্ত্র হইতে জানা যায়। বুদ্ধের ভক্তেরা তাঁহাকে সম্মানসূচক 'মহেসি' বা মহর্ষি নাম দিয়াছেন।

আসুরির প্রধান শিষ্য পরিব্রাজক পঞ্চশিখ মিথিলাদি দেশে পরিভ্রমণ করেন, তিনিই প্রথম সাংখ্যশাস্ত্র প্রণয়ন ও সম্যক্ প্রচার করেন। তাহাতেই কোন কোনও উপনিষৎ, মনু ও মহাভারতাদি যাবতীয় আর্ষ-গ্রন্থ সাংখ্যমতে অনুপ্রাণিত দেখা যায়। "সাংখ্যাগতং তন্নিখিলং নরেন্দ্র", মহাভারত।

মহাভারত অতি প্রাচীন সংবাদসমূহের পেটকস্বরূপ। যদিও উহাতে অনেক অপ্রাচীন ইতিহাস আছে, কিন্তু আবার যে সময়ে আর্য্যসমাজে

বিবাহ প্রথা ছিল না, স্ত্রীগণ 'অনাবৃতা' ছিল তাহারও স্মৃতি আছে (আদি পর্ব্ব। ১২২ অঃ)। সেই মহাভারতের এক প্রাচীন সংবাদ হইতে জানা যায় যে পঞ্চশিখ বিদেহপতিজনদেবের ও ধর্ম্মধ্বজ জনক নরপতির শাস্তা ছিলেন।

কোশলের পূর্ব্ববর্ত্তী রাজ্যের নাম বিদেহ। বেদের 'বিদেঘ' নাম হইতেই সম্ভবতঃ এই নামের উৎপত্তি; এই বিদেহ রাজ্য অতি প্রাচীন। মহাভারতের মূল ঘটনা, যাহা ঐ গ্রন্থের অতি প্রাচীন অংশ, তাহাতে জানা যায় যে যুধিষ্ঠিরাদির সময়ে ঐ রাজ্য লুপ্তপ্রায় হইয়াছিল। বুদ্ধের সময়ে ঐ রাজ্য ছিল না। বৌদ্ধশাস্ত্রে কেবল 'বেদেহিপুত্ত অজাতসত্তু' এই বাক্যে বৈদেহী নাম পাওয়া যায়, কিন্তু বুদ্ধঘোষ বলেন তিনি ঐ নামের একজন কোশল রাজকুমারী।

বুদ্ধের সময়ে এই কয়টি প্রধান জনপদ ছিল ; যথা—'কাসিকোসলেসু বজ্জিমল্লেসু চেতিবংসেসু কুরুপঞ্চালেসু মচ্ছসুরসেনেসু'—(দীর্ঘনিকায়। জনবসভসুত্ত)। অর্থাৎ কাশী, কোশল, বজ্জি, মল্ল, চেদি, বৎস, কুরু, পঞ্চাল, মৎস্য ও সুরসেন। এই সকল দেশে এবং অঙ্গ মগধেই বুদ্ধের প্রসার ছিল। আর মহা সুদর্শনসুত্র হইতে জানা যায় সে সময়ে চম্পা, রাজগৃহ, শ্রাবস্তী, সাকেত, কৌশাম্বী ও বারাণসী প্রধান নগর ছিল। উহার মধ্যে বজ্জি ও মল্লদেশেই প্রাচীন বিদেহ রাজ্যের স্থান। মহাভারতে মল্লদেশের নাম আছে বজ্জির নাম নাই।

এদিকে শতপথ ব্রাহ্মণ, বৃহদারণ্যক উপনিষৎ প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থেও বিদেহপতি জনকের আখ্যান পাওয়া যায়। অতএব অন্যতম জনকরাজার শাস্তা পঞ্চশিখাচার্য্য যে বুদ্ধের বহু পূর্ব্বের লোক তদ্বিষয়ে সংশয় নাই। কত পূর্ব্বের তাহা স্থির করিবার উপায় নাই। তবে দেখা যায় ভারতবর্ষে ন্যূনাধিক প্রতি সহস্রবর্ষে এক একবার ধর্ম্মচর্চ্চার অভ্যুদয় হইয়াছে। বুদ্ধের প্রায় সহস্র বৎসর পরে বেদান্ত মায়াবাদ ও তাহার প্রায় সহস্রবর্ষ পরে বৈষ্ণব-ধর্ম্মের অভ্যুদয় হইয়াছে। অধুনা ভারতে বৈষ্ণব ধর্ম্মেরই

প্রাবল্য। বুদ্ধও বলিয়াছেন তাঁহার ধর্ম্ম সহস্রবর্ষ পরে হীনপ্রভ হইয়া যাইবে। কপিলর্ষিপ্রণোদিত হইয়া ঋষিসমাজে যে ধর্ম্মচর্চ্চা প্রাদুর্ভূত হয় তাহা গৌতমবুদ্ধের পূর্ব্বে ঐ সহস্রবার্ষিক কালচক্রের একাধিক চক্র পূর্ব্বে ঘটিয়াছিল এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে।

ইহা আরও দ্রষ্টব্য যে সাংখ্যের প্রচলিত গ্রন্থ সকল অপেক্ষাকৃত অপ্রাচীন হইলেও প্রাচীন সাংখ্যমত তাহাতে বিপর্য্যস্ত হয় নাই। সৌভাগ্যের বিষয় সাংখ্যীয় তত্ত্বসকল যুক্তিমূলক। অনুলোম ও বিলোম যুক্তির দ্বারা উহা সাধিত হয়, তজ্জন্য 'নির্গুণ পুরুষ' ও 'ত্রিগুণ' উক্ত হইলেই সাংখ্যের সমস্তই সূচিত হয়। যেমন জ্যামিতির কোনও প্রতিজ্ঞা ও তাহার প্রমাণের একাংশ পাইলে, অবশিষ্টাংশ অস্থূচিত থাকে না, ইহাও সেইরূপ। বস্তুত পঞ্চশিখাচার্য্যের প্রবচনের যাহা অবশিষ্ট আছে তাহা অধুনাও সমগ্র সাংখ্য যোগকে সম্যক্ সূচিত করিতেছে (কাপিল-মঠের 'সভাষ্যং পাঞ্চশিখং সাংখ্যসূত্রম্' দ্রষ্টব্য)।

অতএব প্রাচীন সাংখ্যযোগের উপর যে বৌদ্ধধর্ম্মের ভিত্তি স্থাপিত তদ্বিষয়ে সংশয় নাই। তবে নির্ব্বাণের সাধন সমূহ ও তল্লভ্য পরম পদ সমান হইলেও ঐ নির্ব্বাণ-সাধন বৌদ্ধেরা ভিন্নদিক্ হইতে বুঝাইয়া গিয়াছেন। সেই বুঝাইবার প্রণালীর বা অভিধর্ম্মের সহিত সাংখ্যপ্রণালীর মোটেই সাদৃশ্য নাই। সাংখ্যে অনুভূয়মান পদার্থের মৌলিক বিশ্লেষ ও সমবায় আছে, আর অভিধর্ম্মে কেবল অবিশ্লিষ্ট (complex) পদার্থের বিচার। বৌদ্ধশাস্ত্র সাধারণের মধ্যে প্রচারযোগ্য করার জন্য প্রথমে মাগধী ভাষায় ও ভাঙ্গা সংস্কৃত ভাষায় (গাথার ভাষায়) রচিত হয় এবং প্রধানত যোগাচরণের বিষয় (দার্শনিক বিচার বাদ দিয়া) তাহাতে প্রপঞ্চিত হয়। বলা বাহুল্য একই বিষয় ঐরূপে নূতন করিয়া প্রচার করিতে গেলে ক্রমশ ভিন্নাকার ধারণ করে। সেইরূপেই বৌদ্ধধর্ম্মের সাংখ্যযোগ হইতে বাহ্য ভেদ হইয়াছে।

উপসংহারে বক্তব্য এই যে মহর্ষি কপিল যে বুদ্ধের বহু পূর্ব্বের লোক তাহা হিন্দু বৌদ্ধ জৈন প্রভৃতি সমস্ত ভারতীয় সম্প্রদায়ে প্রচলিত আছে। বৌদ্ধেরা বলেন ইক্ষ্বাকু (পালি ওক্‌কাকু) রাজার সময় কপিলবাস্তুতে মহর্ষি কপিলের বাস ছিল। কপিলবাস্তুকে অশ্বঘোষ (খৃষ্টাব্দের প্রথমের লোক বলিয়াছেন "মহর্ষেঃ কপিলস্য বাস্তু" (বুদ্ধচরিত)। আধুনিক পাশ্চাত্যেরা কপিলকে বুদ্ধের পরবর্ত্তী বলিতে সাহস করেন না বটে কিন্তু কেহ কেহ সংশয় মাত্র করেন। চিরন্তন ঐ ভারতীয় ঐতিহ্যের বিরুদ্ধ মত স্থাপন করিতে হইলে তাহার প্রমাণ অপরপক্ষকেই দিতে হবে, শুদ্ধ সংশয় করা প্রমাণ নহে। অতএব মহর্ষি কপিল ও সাংখ্যযোগবিদ্যা বুদ্ধের বহু পূর্ব্ব হইতেই প্রচলিত ছিল। বুদ্ধ সেই বিদ্যা অরাড় কালাম ও রুদ্রকের নিকট শিক্ষা করিয়া তাহাতে সিদ্ধ হইয়াছিলেন। অরাড় কালাম যে সাংখ্য ছিলেন জনক, জৈগীষব্য, বৃদ্ধ পরাশর প্রভৃতি সাংখ্যযোগীরা যে বুদ্ধের বহু পূর্ব্বের লোক তাহা অশ্বঘোষের সময় প্রসিদ্ধ কথা ছিল। অরাড়ের নিকট সাংখ্য শিক্ষা করিয়া "বিশেষ" শিক্ষার জন্য সিদ্ধার্থ রুদ্রকের নিকট যাইয়া বহুকাল শিক্ষা করেন। শিক্ষা শেষ করিয়া আসন প্রাণায়াম প্রভৃতি সমাধিসাধন করেন। অতএব রুদ্রক যোগাচার্য্য ছিলেন। বুদ্ধ সিদ্ধ হইয়া কার্য্যকর সাংখ্যযোগের উপদেশ করিয়া গিয়াছেন, তাই সাংখ্যযোগের বিরুদ্ধে কথা বলেন নাই। অবশ্য সে সময়ে অরাড় ও রুদ্রকের সম্প্রদায় ছিল। কিন্তু বুদ্ধ যে অজিতকেশকম্বলী, পুরাণকাশ্যপ, নির্গ্রন্থ নাটপুত্র প্রভৃতি ছয় সমসাময়িক (আজীবক-জৈন-চার্ব্বাক-আদি) সম্প্রদায়কে নিন্দা করিয়া গিয়াছেন তন্মধ্যে অরাড় ও রুদ্রকের সম্প্রদায় নাই। অতএব ঐ দুই সম্প্রদায় বুদ্ধের অবলম্ব্য ও অনুকূল ছিল তাহা অবশ্য স্বীকার্য্য। (প্রাচীন বৌদ্ধেরা দর্শন বিষয়ে উন্নত ছিলেন না। কিন্তু দর্শন ব্যতীত আত্মরক্ষা হয় না। তাই খৃষ্টাব্দের প্রথম সহস্র বৎসর ব্যাপিয়া বৌদ্ধেরা ন্যায়াদি দর্শনের প্রভূত আলোচনা করিয়া যথাসাধ্য

আত্মরক্ষা করিতে সচেষ্ট হন। এ বিষয় দ্বিতীয় ভূমিকা যাহা সংস্কৃত বৌদ্ধ-শাস্ত্র হইতে সঙ্কলিত—তাহাতে দেখান হইয়াছে। প্রকাশক)।

২। ভূমিকা (নৈরাত্ম্যবাদ ও আত্মবাদ):

বৌদ্ধদের ত্রিপেটক যাহা পালি ও সংস্কৃতে লিখিত, তাহা দর্শন হিসাবে বিশেষ উপাদেয় নহে ও অত্যন্ত পুনরুক্তিদোষে দূষিত। সংস্কৃত অভিধর্ম্ম পালি অপেক্ষা কিছু ভাল হইলেও দার্শনিক বিশদতাহীন। উহা কতকটা আমাদের উপনিষদের ন্যায়, তবে অতিস্ফীততা-দোষে দূষিত। কিন্তু অশ্বঘোষ, দিঙ্‌নাগ, নাগার্জ্জুন, শান্তরক্ষিত, বুদ্ধপালিত, কমলশীল, চন্দ্রকীর্ত্তি, ধর্ম্মকীর্ত্তি, শান্তিদেব, প্রজ্ঞাকরমতি প্রভৃতি সংস্কৃত বৌদ্ধলেখকগণ, যাহাদের পুস্তক সৌভাগ্যবশতঃ বিলোপ হইতে রক্ষিত হইয়াছে—তাঁহারা রীতিমত দার্শনিক প্রণালীতে স্বপক্ষ স্থাপন ও পরপক্ষ খণ্ডন করিয়াছেন। এতদিন বৌদ্ধমতের বিষয় তাঁহাদের খণ্ডনকারীদের গ্রন্থ হইতে জানা যাইত; এখন বৌদ্ধদের নিজেদের লেখা হইতেই তাহা জানা যায়।

বুদ্ধের পর সহস্র বৎসরের মধ্যে বৌদ্ধদের প্রসিদ্ধ চারিটা সম্প্রদায় হইয়াছিল, যথা—সৌত্রান্তিক, বৈভাষিক, যোগাচার ও মাধ্যমিক। উহাদের মধ্যে আবার অনেক উপসম্প্রদায় ঘটিয়াছিল। কনিষ্কের সময়ে প্রধান ১৮টার নাম পাওয়া যায়। যথা—(১) আর্য্যসর্ব্বাস্তিবাদ (ইহার মধ্যে মূলসর্ব্বাস্তিবাদ প্রভৃতি ৭টা), (২) আর্য্যসম্মতীয় (কুরুকুল্লক, আবন্তিক প্রভৃতি তিন), (৩) আর্য্যমহাসাঙ্ঘিক (পাঁচটা) ও (৪) আর্য্যস্থবির (মহাবিহার আদি তিনটা)।

যোগাচারদের মত অতি অল্পই জানা যায়। সর্ব্বাপেক্ষা মাধ্যমিকদেরই প্রসার বেশী ছিল ও তাঁহাদের গ্রন্থই অধিক পাওয়া গিয়াছে। লঙ্কাবতার-সূত্র যোগাচারদের পক্ষীয় গ্রন্থ বলিয়া কথিত হয়। যোগাচারেরা বিজ্ঞান-মাত্রবাদী। সৌত্রান্তিক ও বৈভাষিকেরা সর্ব্বাস্তিবাদী বা অন্তর্বাহ্য পদার্থের অস্তিতাবাদী।

বৌদ্ধদের মধ্যেও আত্মবাদী ছিল। একজন বৌদ্ধ আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছেন যে "কেচিচ্চ সৌগতম্মন্যা অপ্যাত্মানং প্রচক্ষতে।" কিন্তু শূন্য বা নৈরাত্ম্যবাদই বৌদ্ধদের সাধারণ প্রবল মত এবং বোধ হয় বুদ্ধের পর হইতেই প্রচলিত। বুদ্ধ চরমতত্ত্বের বিষয়ে শূন্যশব্দ ব্যবহার করাতে বোধ হয় শূন্যবাদ প্রচলিত হইয়াছিল। সাধারণতঃ শূন্য অর্থে কিছু না। নির্ব্বাণ শূন্য বা কিছু না হইলে তজ্জন্য চেষ্টা করা বিজ্ঞ অজ্ঞ কাহারও পক্ষে সঙ্গতবোধ হইবে না। আর্ষ দার্শনিকেরা এইরূপ শূন্যবাদকে বেশ সুযুক্তিসহকারে নিরাকৃত করিয়াছেন। কিন্তু "আগ্রহী বত নিনীষতি যুক্তিং যত্র তত্র মতিরস্য নিবিষ্টা"। অতএব বৌদ্ধরাও সহস্রাধিক বৎসর ধরিয়া নানা ন্যায়ের ফাঁকি তুলিয়া শূন্যবাদ সমর্থন করার চেষ্টা করিয়াছেন। বুদ্ধের বচন বলিয়া উদ্ধৃত হয় যে "শূন্যমাধ্যাত্মিকং পশ্যেৎ পশ্যেৎ শূন্যং বহির্গতং। ন বিদ্যতে সোঽপি কশ্চিৎ যো ভাবয়তি শূন্যতাং॥" অতএব বৌদ্ধদের যে প্রকারেই হউক শূন্যবাদকে উপপন্ন করিতে হইয়াছে। শান্তি-দেব বলেন, "বিনা শূন্যতয়া চিত্তং বদ্ধমুৎপদ্যতে পুনঃ। যথাঽসংজ্ঞিসমাপত্তৌ ভাবয়েত্তেন শূন্যতাং॥" যেমন অসংজ্ঞিধ্যানের পরও (আত্মবাদীদের চরম সমাধিকে বৌদ্ধেরা ন সংজ্ঞি নাসংজ্ঞিসমাপত্তি বলেন) চিত্ত উঠে সেইরূপ শূন্যতা বিনা চিত্ত বদ্ধ থাকে ও পুনঃ উঠে, অতএব শূন্যতা ভাবনা করিবে। "তস্মাৎ শূন্যতৈব বোধিমার্গ ইতি স্থিতঃ"। আত্মগ্রাহ, সত্ত্বগ্রাহ, জীবগ্রাহ ও পুদ্গলগ্রাহ, ইহা বুদ্ধ নিষেধ করিয়াছেন। "অনিত্যং দুঃখং অনাত্মং" বৌদ্ধদের এই প্রসিদ্ধ জপমন্ত্রের দ্বারা শূন্যতা ভাবনা করিতে হয়।

কিন্তু সদ্‌বস্তুর মূল যে একবারে অসৎ এরূপ অযুক্ত কথা উপপাদন করা (হাজার ন্যায়ের ফাঁকি তুলিয়াও) সম্ভবপর নহে। তাই বুদ্ধের উক্তির দোহাই দিয়া নাগার্জ্জুন বলিয়াছেন "শূন্যতা চ ন চোচ্ছেদো সংসারশ্চ ন শাশ্বতঃ। কর্ম্মণোঽবিপ্রণাশশ্চ ধর্ম্মো বুদ্ধেন দেশিতঃ ॥ (মধ্যমিকসূত্র ১৭।২০) "আত্মেত্যপি প্রজ্ঞপিতম্ অনাত্মেত্যপি দেশিতং। বুদ্ধৈরাত্মা ন চানাত্মা কশ্চিদিত্যপি দেশিতং"। (১৮।৬) অর্থাৎ শূন্যতা অর্থে অত্যন্ত নাশ নহে। সংসৃতিও শাশ্বত নহে। কর্ম্মের অপ্রণাশ বা স্বভাবে না থাকারূপ শূন্যতা হইতেই বিপাক হয়, এইরূপ ধর্ম্মই বুদ্ধের দ্বারা কথিত হইয়াছে। বুদ্ধেরা কোথাও আত্মা, কোথাও অনাত্মা এবং কোথাও বা আত্মা বা অনাত্মা ইহার কোনটাই নয়, এরূপ উপদেশ করিয়াছেন; এই শেষেরটা মাধ্যমিক মত। মাধ্যমিকদের মতে কিছু আছেও বলিব না—নাইও বলিব না "অস্তি ও নাস্তি" এই দুই কোটা। আর অস্তি ও না নাস্তিও না' ইহাই ঐ দুইয়ের মধ্যম মত। তাদৃশ মধ্যম মত বলাই মাধ্যমিকত্ব। কিন্তু ইহা 'বলিব না' মাত্র। 'কি বলিব' তাহা না থাকাতে উহা প্রকৃত ন্যায়সঙ্গত দর্শন নহে। আছে কি নাই ইহার একটা না বলিলে দুই প্রকার ভাব বুঝায়, (১) সংশয় বা থাকিতেও পারে না থাকিতেও পারে; (২) আছে কিনা জানি না। ইহা ছাড়া ঐরূপ বলিলে প্রলাপ বলা হয়। মাধ্যমিকেরা প্রথম দুই অর্থে বলেন না, সুতরাং তাঁহাদের দৃষ্টি ভ্রমাত্মক। আর অনাত্মা আছে আত্মা নাই বলিলে ঘটাভাব আছে ঘট নাই বলা হয়।

শূন্য যদি উচ্ছেদ না হয় তবে উহাকে সত্তা বলিতে হইবে। প্রজ্ঞাপারমিতাতেও আছে "শূন্যরূপেণ কৌশিক তিষ্ঠতা"। উহা যদি সত্তা হয় তবে দৃষ্টধর্ম্মশূন্য সত্তা হইবে। ইহাই সাংখ্যের অব্যক্ত। অতএব সাংখ্যের কথাই অন্যায্য ভাষায় বৌদ্ধ বলেন। যে বৌদ্ধদের মতে শূন্য অভাবমাত্র, তাঁহাদের কথা নিতান্তই অদার্শনিক। চিত্তবৃত্তিনিরোধ সাংখ্য ও বৌদ্ধ উভয়েরই

পরাগতি। তৎকালে চিত্তের উপাদান অব্যক্তভাবে বা ব্যক্তধর্ম্মশূন্যভাবে থাকে, ইহা সাংখ্যমত। যে বৌদ্ধেরা বলেন,—তখন 'শূন্য'রূপে থাকে, তাহাতে তাঁহাদের সাংখ্যের কথাই অস্পষ্টভাবে ঘুরাইয়া বলা হয়। আর যাঁহারা বলেন, তখন অভাব হইয়া যায়, তাঁহাদের অন্যায্য অদার্শনিক ও অবোধ্য কথা বলা হয়। বৌদ্ধদের যুক্তি (অবশ্য ইহা স্বাধীন যুক্তি নহে কিন্তু তথাকথিত বুদ্ধের উক্তিকে মূল করিয়া যুক্তি) এইরূপ—বুদ্ধ শাশ্বতবাদ ও উচ্ছেদবাদ গ্রহণ করিতে নিষেধ করিয়াছেন, অতএব উহারা অগ্রাহ্য। যেমন কর্ম্ম সম্বন্ধে নাগার্জ্জুন বলেন, "তিষ্ঠেদাপাককালাচ্চেৎ কর্ম্ম তন্নিত্যতামিয়াৎ। নিরুদ্ধং চেন্নিরুদ্ধং তৎ কিং ফলং জনয়িষ্যতি॥" (মাধ্য ১৭।৬) অর্থাৎ বিপাকের সময় পর্য্যন্ত যদি কর্ম্ম থাকে বল, তবে কর্ম্ম নিত্য বা শাশ্বত হয়। আর নিরুদ্ধ হইলে বা কর্ম্মের পর যখন উহা দেখা না যায়, তখন উহার অত্যন্তনাশ হইয়া গিয়াছে বলিলে ভবিষ্যৎ কর্ম্মফল কিরূপে হইবে? অতএব উহার কোনটাই বক্তব্য নহে। উদাহরণস্বরূপ বলেন যে বীজ হইতে অঙ্কুর, অঙ্কুর হইতে বৃক্ষাদি ক্রমে ফল হয়। অতএব "বীজ হইতে যখন সন্তান (কার্য্যের ধারা) ও সন্তান হইতে ফলোদ্ভব দেখা যায়,তখন বলিতে হইবে 'বীজপূর্ব্বং ফলং' অতএব কিছু উচ্ছিন্ন হইল না ও কিছু শাশ্বত হইল না" (মাধ্য ১৭।৮) ইহা কেবল কথার মারপেঁচ মাত্র। সাংখ্যদিগের সহজপ্রজ্ঞার দৃষ্টিতে (common sense view) অদৃশ্য কৃত কর্ম্ম সংস্কাররূপে থাকে, পরে তাহা ব্যক্ত হইয়া ফলবৎ হয়। সাংখ্যেরাও ব্যক্ত দ্রব্যকে নিত্য বলেন না ("হেতুমদনিত্যমব্যাপি" ইত্যাদি সাংখ্যকারিকা দ্রষ্টব্য), কিন্তু তাহারা যাহা দ্বারা নির্ম্মিত সেই প্রকাশ, ক্রিয়া ও স্থিতিভাব দ্রব্যকে পরিণামিনিত্য বলেন; কারণ উহা বরাবর আছে ও থাকিবে। নাশ অর্থে সাংখ্যমতে অত্যন্ত উচ্ছেদ নহে, কিন্তু কারণে লয় অর্থাৎ মূলকারণ প্রকাশ, ক্রিয়া ও স্থিতির যে সমতা (যাহাতে পরস্পরে অভিভূত হয়) তদ্ভাবে থাকা। এইরূপেই অক্রোধরূপ কর্ম্মের

দ্বারা ক্রোধরূপ কর্ম্ম নাশ হয়। সুতরাং কর্ম্ম বা অন্য ব্যক্ত পদার্থ এক-স্বরূপে নিত্য নহে, কিন্তু সদাই পরিণামী। এইরূপে কেবল পারিভাষিক বাক্যভেদ করিয়া বৌদ্ধেরা (বুদ্ধ নহেন) সাংখ্যীয় সম্যগ্দর্শন হইতে নিজেদের ভিন্ন করিয়াছেন ও একই কথা ঘুরাইয়া অন্যরূপে বলিয়াছেন। অতঃপর বিস্তৃতভাবে বৌদ্ধমত পরীক্ষিত হইতেছে। বৌদ্ধেরা নির্গুণ আত্মবাদের বিরুদ্ধে যে যুক্তি দেন তাহা অশ্বঘোষ বুদ্ধচরিত মহাকাব্যে বেশ সংক্ষেপে ও সারভাবে উল্লেখ করিয়াছেন। সেই যুক্তিসকল ও তাহার উত্তর দেখান যাইতেছে। নাগার্জ্জুনাদির কথাও পরে বলা হইবে। (১ম) "বিকার প্রকৃতিভ্যো হি ক্ষেত্রজ্ঞং মুক্তমপ্যহং। মন্যে প্রসবধর্ম্মাণং বীজধর্ম্মাণ মেব চ ॥" অর্থাৎ প্রকৃতি ও বিকৃতি সকল হইতে ক্ষেত্রজ্ঞ মুক্ত হইলেও তাঁহাকে আমি প্রসবধর্ম্মা ও বীজধর্ম্মা মনে করি। সাংখ্যেরা বলেন প্রসবধর্ম্ম ও বীজধর্ম্মের মূলকারণ ত্রিগুণ, কারণ সমস্ত প্রকৃতি বিকৃতি প্রকাশ ক্রিয়া ও স্থিত্যাত্মক। দ্রষ্টা সুতরাং কিছুর বীজ ও কিছুর প্রসূ নহেন। তিনি কিসের বীজ ও প্রসূ তাহা কাহারও দেখাইবার সামর্থ্য নাই।

(২য়) "যদি আত্মা বিশুদ্ধ ও নির্ম্মুক্ত ইহা কল্পনা কর (তাহাও ঠিক নহে) কারণ আত্মা থাকিলে প্রকৃতি বিকৃতির অত্যন্ত পরিত্যাগ সম্ভব হয় না ; তাহাতে আত্মার স্থিতি থাকিলে প্রকৃতি বিকৃতি ও আত্মা এই তিনই সূক্ষ্মভাবে থাকিবে (তত্র সূক্ষ্মমিদং ত্রয়ং)।" সাংখ্যেরা ইহা দোষ বা অসঙ্গত মনে করেন না কারণ তন্মতে কিছুর অত্যন্তাভাব নাই। প্রলয়ে প্রকৃতি বিকৃতি সূক্ষ্মাবস্থায় থাকে। তাহাতে দ্রষ্টৃপুরুষের কৈবল্যের হানি হয় না। সূক্ষ্ম বা সাম্যাবস্থায় থাকিলে চিত্তবৃত্তি বা বিজ্ঞান নিরুদ্ধ হয় তাহাই দ্রষ্টার কৈবল্য।

(৩য়) "সূক্ষ্মত্বাচ্চৈব দোষাণামব্যাপারাচ্চ চেতসঃ। দীর্ঘত্বাদায়ুষশ্চৈব মোক্ষস্তু পরিকল্প্যতে ॥" অর্থাৎ দোষ সকলের সূক্ষ্মত্ব হেতু এবং চিত্তের

অব্যাপার হেতু অর্থাৎ দীর্ঘকাল নিরুদ্ধ চিত্ত কিন্তু দোষ বীজযুক্ত থাকাই ঐ (সদোষ) মোক্ষ পরিকল্পিত হয়। সাংখ্যেরা যেরূপ বৌদ্ধদের প্রকৃতি লীনত্ব পর্য্যন্ত গামী বলেন বৌদ্ধেরাও সেইরূপ এই পরিচ্ছিন্নকাল যাবৎ নির্জ্জরত্বকে সাংখ্যের মোক্ষ বলেন। প্রকৃত সাংখ্যযোগ না বুঝার ইহা ফল। দোষের প্রসুপ্তিকে সাংখ্য মোক্ষ বলেন না। প্রান্তভূমি বিবেকের দ্বারা যখন দোষবীজ বা ব্যুত্থান সম্যক্ ক্ষীণ দগ্ধবীজকল্প হইয়া চিত্তের প্রতিপ্রসব বা পুনরুত্থান হীন লয় সম্পাদন করে তখনই সাংখ্যের মোক্ষ। ইহা প্রতিজ্ঞামাত্র নহে কিন্তু সম্যক্ যুক্তিযুক্ত দৃষ্টি। প্রান্তভূমি বিবেকের পর কিরূপে বৃত্তি উঠিবে তাহা বৌদ্ধ বা কেহ দেখাইতে পারিলে তবেই তাঁহাদের কথা আস্থেয় হইবে।

(৪র্থ) "অহংকার পরিত্যাগো যশ্চৈষ পরিকল্প্যতে। সত্যাত্মনি পরিত্যাগো নাহংকারস্থ বিদ্যতে॥" অর্থাৎ আত্মা থাকিতে অহংকার পরিত্যাগ সম্ভব নহে। ইহা শব্দার্থের প্রভেদমূলক ভ্রান্ত যুক্তি। বৌদ্ধেরা যাহাকে আত্মা বলেন আর্ষ সম্প্রদায়েরা তাহাকে আত্মা বলেন না। বৌদ্ধদের আত্মা সাধারণ আত্মভাব আর আর্ষদের আত্মা—সাধারণ আত্মভাবও বটে এবং তাহার নির্ব্বিকার মূলও বটে। বৌদ্ধেরা বিজ্ঞানের মৌলিক বিশ্লেষ করেন নাই সাংখ্যেরা তাহা করিয়া দেখান যে নির্ব্বিকার দ্রষ্টা ও ত্রিগুণ তাহার কারণ, সুতরাং আর্ষেরা ঐ মূল আত্মভাবকেও আত্মা (বিশুদ্ধ আত্মা) বা পুরুষ বলেন। অহংকারও ত্যাগ করিলে ঐ বিশুদ্ধ আত্মভাবরূপ মূল হেতু না থাকার কোন হেতু নাই অথবা কৈবল্যে ঐ শুদ্ধ আত্মা থাকিলে অহংকারাদি কার্য্য লীন হওয়াতে কোন বাধা নাই। কুণ্ডল বলয় না থাকিলে স্বর্ণকার ও স্বর্ণ থাকিবে না এরূপ দৃষ্টি যুক্ত নহে। অহঙ্কার অনাত্মে আত্মত্ব খ্যাতিবিশেষ তাহা সম্যক্ ত্যাগ করিলে ত্যাগকর্ত্তা কেবল থাকিবেন। তিনি সাধারণ আমিত্বের মূল বলিয়া প্রকৃত আত্মা। বলিতে পার ত্যাগ শেষ হইলে "ত্যাগ কর্ত্তাও" থাকিবে না। ইহা সত্য

কথা কিন্তু বলিতে হইবে ত্যাগের 'অকর্ত্তা-হেতু' তখন থাকিবে। সাংখ্যেরা তাহাই বলেন।

(৫ম) "সংখ্যাদি গুণ হইতে পুরুষ মুক্ত নহেন বলিয়া তিনি নির্গুণ নহেন, আর নৈর্গুণ্য সিদ্ধ হয় না বলিয়া তাঁহার মোক্ষও সিদ্ধ হয় না।" সাংখ্যমতে পুরুষ নির্গুণ। নির্গুণ অর্থে তিন গুণের বিপরীত এবং গুণ বা ধর্ম্মধর্ম্মিভাবহীন। এখানে শেষোক্ত অর্থেই নির্গুণ শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। সাংখ্যসূত্রে আছে "নির্গুণত্বান্ন চিদ্ধর্ম্মা" অর্থাৎ পুরুষ বা দ্রষ্টাই চিৎ কিন্তু চৈতন্য তাঁহার ধর্ম্ম বা গুণ নহে। সাধারণ গুণ-গুণী বা ধর্ম্ম-ধর্ম্মী ভাব বিকারশীল অনিত্য দ্রব্যের স্বভাব। বহু গুণের সমাহারকে সাংখ্যেরা গুণী বলেন। লোক-ব্যবহারও সেইরূপ। অখণ্ড্য-একস্বরূপ দ্রষ্টা সেরূপ গুণসমাহার নহেন। কিন্তু সাধারণতঃ সমস্ত পদার্থকে আমরা গুণসমাহার রূপেই ব্যবহার করি। গুণ কিন্তু প্রকৃত ও বৈকল্পিক। সগুণ দ্রব্য প্রকৃত গুণের সমাহার ; নির্গুণ দ্রব্যকেও লক্ষিত করিতে হইলে ব্যবহারবশে গুণ সমাহার-রূপেই করিতে হয় কিন্তু সেস্থলে সেই গুণসকল অবাস্তব বৈকল্পিক। যেমন পুরুষের অনাদিত্ব, অনন্তত্ব, বহুত্ব প্রভৃতি যে সব গুণ দিয়া লক্ষণা বক্তব্য হয় তাহারা সব বৈকল্পিক। আদির অভাব, অন্তের অভাব দ্রষ্টার বাস্তব গুণ নহে বহুত্বও কোন এক দ্রষ্টার বাস্তব গুণ নহে। এইরূপ বৈকল্পিক জ্ঞানবাচী শব্দ ব্যবহার না করিলে ভাষা ব্যবহার সম্ভব হয় না। তাহা জানাইয়া তবেই সাংখ্য ঐরূপ বৈকল্পিক অবাস্তব গুণের দ্বারা দ্রষ্টাকে লক্ষিত করেন কিন্তু তাহার ফলিতার্থ নির্গুণত্ব। এখানে পূর্ব্বপক্ষ বহুত্বাদিকে বাস্তব গুণ ধরিয়া পুরুষকে সগুণ করিয়াছেন এবং তাহাতে "তাঁহার" মোক্ষ অসিদ্ধ মনে করিয়াছেন। বস্তুত সাংখ্যেরা "পুরুষের মোক্ষ" বলেন না বুদ্ধিরই মোক্ষ বলেন। পুরুষের কৈবল্য বলেন। সাংখ্যেরা দ্রষ্টাকে নিত্য মুক্তস্বভাব বলেন। মুক্ত অর্থে দুঃখমুক্ত। দ্রষ্টাতে যে দুঃখ (বা সুখ) নাই চিত্তেই যে তাহা আছে— তাহা খুব স্পষ্ট কথা এবং সাংখ্যশাস্ত্রে বিশদ করিয়া দেখান হয়।

(৬ষ্ঠ) "প্রাগ্দেহান্ন ভবেদ্দেহী প্রাগ্ গুণেভ্য স্তথা গুণী। কস্মাদাদৌ বিমুক্তঃ সন্ শরীরী বধ্যতে পুনঃ॥" অর্থাৎ দেহের পূর্ব্বে দেহী থাকিতে পারে না, গুণের পূর্ব্বেও গুণী থাকিবে না। দেহী প্রথমে বিমুক্ত থাকিলে কিরূপে পুনরায় বদ্ধ হন? অর্থাৎ শঙ্কা হইতেছে দেহ না থাকিলে দেহী থাকিবে না অতএব দেহের পূর্ব্বেকার আত্মা দেহী নহেন। আর দেহী বা আত্মা যখন বিমুক্ত তখন আবার বদ্ধ হন কিরূপে?

এইরূপ শঙ্কার মধ্যে অনেক ভ্রান্ত ধারণা আছে। দেহ কবে ছিল না? সাংখ্য বৌদ্ধ সকলেই ত বলেন দেহ-পরম্পরা অনাদি। সুতরাং "প্রাগ্-দেহাৎ" এই বাক্য অর্থহীন। ভূত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ এই ত্রিকালস্থ গুণ সকলের সমাহারকেই সাংখ্যেরা গুণী বলেন। অতীত ও অনাগত গুণ অসংখ্য সুতরাং অতীত গুণের আদি নাই। অতএব "প্রাগ্ গুণেভ্যঃ" বাক্য নিরর্থক।

শঙ্কার তৃতীয় অংশ "শরীরী" শব্দ লইয়া। শরীরী অর্থে যাহার শরীর। আত্মার উপর ষষ্ঠী ব্যপদেশ করিয়া তাঁহাকে কথায় শরীরী বলা হয়। আবার তাঁহাকে স্বরূপত অশরীরীও বলা হয়। "আত্মা বদ্ধ হন" ইহা উপচারিক কথা। প্রকৃত কথা "সংসরতি বধ্যতে মুচ্যতে চ নানাশ্রয়া প্রকৃতিঃ"। ইহাই সাংখ্যমত। রাজ্য না থাকিলে রাজা থাকিবে না একথা যেমন একদিকে সত্য উহাও তেমনি। ক রাজ্যের খ রাজা। রাজা হইবার পূর্ব্বেও খ ছিল, এবং ক রাজ্য নষ্ট হইয়া যাইলে খ রাজা থাকিবে না বটে কিন্তু রাজ্যহীন খ থাকিবে। শরীরের সহিত সম্বন্ধ থাকিলে বা না থাকিলে কথায় আত্মাকে বদ্ধ বা মুক্ত বলা যায় তাহাতে আত্মার কিছু আসিয়া যায় না। শরীর না থাকিলে দেহ হীন আত্মা থাকিবেন।

(৭ম) "ক্ষেত্রজ্ঞো বিশরীরশ্চ জ্ঞো বা স্যাদজ্ঞ এব বা। যদি জ্ঞো জ্ঞেয়মস্যাস্তি জ্ঞেয়ে সতি ন মুচ্যতে॥ অথাজ্ঞ ইতি সিদ্ধো বঃ কল্পিতেন

কিমাত্মনা।” অর্থাৎ বিশরীর ক্ষেত্রজ্ঞ জ্ঞ কি—অজ্ঞ? যদি জ্ঞ বা জ্ঞাতা বল তবে ইহার জ্ঞেয় থাকিবেই, আর তাহা থাকিলে মুক্ত কিরূপে হইবে? আর যদি অজ্ঞ বল তবে কাষ্ঠাদি জড় পদার্থের দ্বারাও জ্ঞান সিদ্ধ হইবে আত্মার কল্পনায় ফল কি?

এখানেও পূর্ব্বোক্ত ভ্রান্তি। রাজা ও রাজ্যের উদাহরণ এখানেও খাটিবে। জ্ঞ অর্থে জ্ঞাতা। জ্ঞাতা অর্থে যিনি জানেন। জানা দ্বিবিধ নিজেকে নিজে জানা—ও অন্যকে জানা। সাংখ্যেরা ঐ প্রথম জানাকে জ্ঞাতার স্বরূপ বলেন উহাই পুরুষের লক্ষণ। দ্বিতীয় প্রকার জানা ঐ স্বপ্রকাশরূপ নির্বিকার হেতু হইতে সিদ্ধ হয় বলিয়া (বুদ্ধি পুরুষের সংযোগে সিদ্ধ হয় বলিয়া) উহাকেও গ্রহীতা নামক জ্ঞাতা বলা হয়। কিন্তু এই জ্ঞাতা বা গ্রহীতা প্রকৃত স্বপ্রকাশ জ্ঞাতার মত বলিয়াই (আমি আমাকে জানছি এরূপ অনুভূতিই স্বপ্রকাশের মত জানা) জ্ঞাতা বা ব্যবহারিক জ্ঞাতা বলিয়া সংজ্ঞিত হয়। এই দ্বিতীয় প্রকার জ্ঞাতারই জ্ঞেয় থাকে এবং জ্ঞেয় থাকিলেই তাহা অকেবল হয়। জ্ঞেয় রুদ্ধ হইলে এই অকেবল জ্ঞাতৃত্বও রুদ্ধ হয় স্বপ্রকাশ জ্ঞাতাই কেবল থাকেন। যেমন ক রাজ্য গেলেও খ রাজার স্বরূপহানি হয় না তদ্রূপ। ইহাই সাংখ্যীয় যুক্তিযুক্ত দৃষ্টি।

(৮ম) “পরতঃ পরত স্ত্যাগো যস্মাত্তু গুণবান্ স্মৃতঃ। তস্মাৎ সর্ব্বপরিত্যাগান্মন্যে কৃৎস্নাং কৃতার্থতাম্॥” অর্থাৎ পর পর ক্রমে (বিষয়, ইন্দ্রিয়, অহঙ্কার আদি ক্রমে) ত্যাগ যখন উত্তরোত্তর গুণবান্ বা ভাল তখন সমস্ত ত্যাগকেই আমি সম্যক্ কৃতার্থতা মনে করি। এইরূপে সব শূন্য বা কিছু না থাকাই কৃতার্থতা। আত্মগ্রাহ কৃতার্থতা নহে।

এই সিদ্ধান্তে কিন্তু একটী মহতী শঙ্কা আসে। ত্যাগ করে কে এবং কি বা ত্যাজ্য? ত্যাগকর্ত্তা বা হাতা হেয় ভাবকে ত্যাগ করিতে করিতে হেয় ভাবের সম্যক্ ত্যাগ হইলে শেষে হাতা নিজেই থাকিবে, কারণ

নিজেকে নিজে কিরূপে ত্যাগ করিবে? অতএব হাতা তখন স্বরূপস্থ ও কেবল থাকিবেন ইহাই এবিষয়ে যুক্তিযুক্ত কথা। সাংখ্য তাহাই বলেন। 'শূন্য থাকিবে' বা 'কিছু না' থাকিবে এরূপ অসঙ্গত ভাষা যাহা শূন্যবাদী-দের প্রয়োগ করিতে হয় সাংখ্যদের তাহা করিতে হয় না।

নির্ব্বাণ যে শূন্য অসৎ তাহা বৌদ্ধেরা এইরূপে দেখান :—ধর্ম্মকীর্ত্তি বলেন (অন্য অনেকেও বলেন) "যৎ সৎ তদনিত্যং যথা ঘটাদিঃ"(ন্যায়বিন্দু) অর্থাৎ যাহা সৎ তাহা সব অনিত্য যেমন ঘটাদি। ইহা হইতে বৌদ্ধেরা যুক্তি করেন যে "নির্ব্বাণ নিত্য অতএব তাহা অসৎ" *। ইহার অন্যায্যতা স্পষ্টই প্রতীত হয়। বিপরীত প্রতিজ্ঞা বা converse সর্ব্বস্থলে সত্য হয় না। ইহা হইতে এইরূপ সিদ্ধান্ত হইবে, যথা :— যাহাঅসৎ বা নাই তাহা বাতুলেরাই চাহিতে পারে, নির্ব্বাণ অসৎ, অতএব তাহা বাতুলেরই প্রার্থনীয়। ফলে যাহা সৎ তাহা অনিত্য এই প্রতিজ্ঞা ন্যায়সঙ্গত নহে। সতের সহিত অনিত্যতারই যে সম্বন্ধ আছে তাহা যুক্তিহীন কথা। নিত্য দ্রব্যও সৎ। যাহা আছে তাহাই সৎ। অনিত্য দ্রব্যও আছে নিত্য দ্রব্যও আছে অতএব উভয়ই সৎ। যাহা প্রত্যয়োৎপন্ন তাহাই ভাব বা সৎ' এইরূপ পারিভাষিক সৎ শব্দ বৌদ্ধদের অভীষ্ট হইলে তাহাতে কিছু বক্তব্য নাই। পরিভাষা করিয়া যে কোন শব্দ যে কোন অর্থে ব্যবহৃত হইতে পারে।

সাংখ্যদের দ্রষ্টা পুরুষ স্বপ্রকাশ। দৃশ্য প্রকাশ্য। দৃশ্যবর্গে স্বপ্রকাশের উদাহরণ নাই। সূর্য্য, অগ্নি আদির উপমা দেওয়া হয় বটে কিন্তু উহারা স্বপ্রকাশ নহে, কিন্তু চক্ষুঃপ্রকাশ্য। দ্রষ্টা দৃশ্য হইতে সম্যক্ বিরুদ্ধ তাই দৃশ্যে স্বপ্রকাশত্ব পাওয়া সম্ভব নহে। ইহা না বুঝিয়া

* জনৈক বৌদ্ধ ভিক্ষু এইরূপ ন্যায় প্রয়োগ আমাদেরকে লিখিয়া-ছিলেন।

কোন কোন বাদী বলেন স্বপ্রকাশ দ্রব্য নাই। দার্শনিক বিষয় উত্তম-রূপে আয়ত্ত না হওয়াই এইরূপ ভ্রান্তির কারণ।

সকলেই অনাদি, অনন্ত, নির্ব্বিকার আদি শব্দ ব্যবহার করেন এবং উহার দ্বারা সত্য অবধারণ করেন (বৌদ্ধেরা বলেন লোকধাতু, বুদ্ধের জ্ঞান প্রভৃতি অনন্ত, সংসার অনাদি ইত্যাদি)। কিন্তু অনাদিত্ব অনন্তত্ব নির্ব্বিকারত্ব দৃশ্য বর্গে কোথায় আছে? যাহা দেখিতেছ বা জানিতেছ তাহা সদাই সাদি, সান্ত ও বিকারী। তথাপি ঐ কথা ব্যবহার কর কেন? করিতে হয় বলিয়া। "শেষ বা অন্ত" আমাদের অনুভূয়মান পদার্থ। কিন্তু এরূপ স্থল 'আছে' যথায় 'শেষ' কল্পনীয় নহে। তথায় অগত্যা 'অ-শেষ' পদ উচ্চ মানবকে ব্যবহার করিতে হয় এবং দর্শন বিজ্ঞানের অনেক উচ্চতম সত্য ঐরূপ বৈকল্পিক পদের যোগে আমাদের বুঝিতে হয়। সেইরূপ যত প্রকাশ বা জ্ঞান আছে তাহাতে সর্ব্বদাই প্রকাশ্য-প্রকাশক ভাব (subject and object) থাকে। ইহা অনুভূয়মান তথ্য। প্রকাশ্য-প্রকাশক ভাব ছাড়া কোন জ্ঞান ব্যবহার জগতে নাই। ব্যবহারিক বা empiric জগতের জ্ঞানে সর্ব্বস্থলেই মনে হয় 'আমি' জ্ঞাতা অমুকভাব জ্ঞেয়। প্রকাশ্য-প্রকাশক যোগে এই যে প্রকাশ তাহা সহেতুক বা conditioned প্রকাশ। সহেতুক ভাবের হেতু চাই। বলিতে পার প্রকাশ্য ও প্রকাশক এই দুইএর যোগই হেতু। যোগ হইতে গেলে অন্তত দুই দ্রব্য চাই। এ স্থলে ঐ দুই দ্রব্য কি হইবে? উত্তরে অবশ্যই বলিতে হইবে তাহারা অহেতুক প্রকাশক ও অহেতুক প্রকাশ্য। সহেতুক বিজ্ঞানকে বিশ্লেষ করিয়া এইরূপে যে অহেতুক দুই পদার্থ লাভ হয় তাহাই সাংখ্যের স্বপ্রকাশ দ্রষ্টা ও প্রকাশ্য মূল দৃশ্য ত্রিগুণ। বৌদ্ধেরা বলেন "নহি চিত্তং চিত্তং সমনুপশ্যতি। তদ্যথা ন তয়ৈবাসিধারয়া সৈবাসিধারা শক্যতে ছেত্তুং" (আর্য্যরত্নচূড় সূত্র) অর্থাৎ চিত্ত চিত্তকে জানিতে পারে না যেমন অসিধারার দ্বারা সেই অসিধারা ছেদ করা যায় না সেইরূপ।

সাংখ্যেরাও বলেন চিত্ত স্বাভাস নহে। বৌদ্ধেরা উহা হইতে সিদ্ধান্ত করেন স্বসংবেদন বা স্বপ্রকাশ নাই। সাংখ্যেরা ঐ যুক্তিতেই বলেন চিত্ত যখন স্বসংবেদনরূপ নহে তখন তাহা সংবেদ্য বা 'পরপ্রকাশ্য'। সেই 'পর' অগত্যা স্বপ্রকাশরূপ হইবে। ("স্বসংবেদ্য নহে" এরূপ বাক্যের একমাত্র অর্থ-"পরসংবেদ্য")। নচেৎ অনবস্থা বা regressus ad infinitum নামক দোষ আসিবে।

শান্তিদেব, শান্তরক্ষিত প্রভৃতি বৌদ্ধ দার্শনিকদের একটী প্রিয় যুক্তি এই যে আত্মা "জ্ঞানস্বরূপ"। নিরোধকালে জ্ঞেয় রোধ হয়। কিন্তু জ্ঞেয় ব্যতীত জ্ঞান থাকিতে পারে না (জ্ঞেয়ং বিনা তু কিং বেত্তি যেন জ্ঞানং নিরুচ্যতে। শান্তিদেব) অতএব নিরোধকালে জ্ঞানস্বরূপ আত্মাও থাকে না। ইহাও সাংখ্য সম্যক্ না বুঝার ফল। আত্মা জ্ঞানস্বরূপ ইহা ঢিলা কথায় লোকে (বিশেষত বেদান্তীরা) বলিয়া থাকে বটে, কিন্তু ঐ জ্ঞান জ্ঞাতৃজ্ঞানজ্ঞেয় এই ত্রিপুটীভাবযুক্ত জ্ঞান নহে কিন্তু উহাদের মূলীভূত স্বপ্রকাশ জ্ঞ নামক 'জ্ঞান'। স্বরূপ জ্ঞাতা বা চিৎ, সাধারণ জ্ঞাতা, জ্ঞান ও জ্ঞেয় এই চারিপ্রকার পদার্থ সাংখ্য বলেন, তাহাদের ভেদ না বুঝাতেই ঐরূপ দোষ কল্পিত হয়। সাংখ্য বলেন নিরোধে সাধারণ জ্ঞাতা বা গ্রহীতা, জ্ঞান এবং জ্ঞেয় এই তিনেরই রোধ হয় বটে কিন্তু স্বরূপ জ্ঞাতা, যাঁহার প্রতিচ্ছায়া সাধারণ জ্ঞাতা, তাঁহার রোধ হয় না। সাধারণ আমিত্ব হেতুজন্য ভাব। ভাবের অভাব অচিন্তনীয় অদার্শনিক কল্পনা। সুতরাং আমিত্বের সৎ হেতু তখন বর্ত্তমান থাকে এবং উপাদান ত্রিগুণও থাকে। শান্তরক্ষিতের (তত্ত্বসংগ্রহ, আত্ম পরীক্ষা) এক যুক্তি (স্বচৈতন্যের বিরুদ্ধে) এই "তত্রাপি রূপ শব্দাদি-চেতসাং বেদ্যতে কথম্। সুব্যক্তং ভেদবদ্রূপমেকা চেচ্চেতনেষ্যতে ॥" অর্থাৎ চৈতন্য যদি একস্বরূপ হয় তবে রূপশব্দাদি জ্ঞান, যাহারা প্রত্যক্ষত বহুরূপ, তাহাদের বহুত্ব হয় কিরূপে? এই যুক্তির সারবত্তা অতি

অল্প। সাংখ্যেরা বলেন চিত্তেতেই ভেদ; পুরুষে বা তচ্ছায়াভূত জ্ঞাতৃত্বে ভেদ নাই। উদাহরণ যথাঃ—একই আমি বহু জ্ঞানের জ্ঞাতা। সুখ দুঃখ ভিন্ন ভিন্ন, কিন্তু তাহার জ্ঞাতা একই আমি, ইহা প্রত্যক্ষত অনুভূত হয়। উপমা যথাঃ—একই আলোকের দ্বারা যেমন বহুবর্ণের বহুদ্রব্য প্রকাশিত হয় তদ্রূপ। সেইরূপে "নানাবিধার্থভোক্তৃত্ব ও" সিদ্ধ হয়।

ভোক্তৃত্ব অর্থে সাংখ্যে সুখদুঃখের সাক্ষিত্ব বা জ্ঞাতৃত্ব। এক আমি যে বহুর জ্ঞাতা ইহা প্রত্যক্ষানুভূতি। সাংখ্যের প্রকৃত দৃষ্টি না বুঝিয়া শান্তরক্ষিত আরও কতকগুলি ব্যর্থ যুক্তি দিয়াছেন। যথা পুরুষের দিদৃক্ষা হইতে যদি ভোগ হয় বল তবে পুরুষ চৈতন্যস্বরূপ হন না দিদৃক্ষাযুক্তও হন; আর দিদৃক্ষা, উদয়-ব্যয়-যুক্ত সুতরাং পুরুষ ও তাদৃশ হন। দিদৃক্ষা মনের বৃত্তি, পুরুষের স্বভাব নহে ইহা সাংখ্য মত; অতএব এই দোষ স্বকল্পিত; সাংখ্যের সহিত উহার সম্বন্ধ নাই। সেইরূপ "অভিলাষানুসারেণ প্রকৃতিশ্চেৎ প্রবচ্ছতি" এ শঙ্কাও কল্পিত। অভিলাষও সাংখ্যমতে মনের ধর্ম্ম, পুরুষের নহে। বৌদ্ধেরা পঙ্গু ও অন্ধের উপমারও সর্ব্বাংশগ্রহণরূপ দোষ করিয়া থাকেন। টীকাকার কমলশীল বলেন "তৌ চ সদা সন্নিহিতাবিতি। অতো নিত্যমেব ফলং ভবেৎ।" স্পষ্টই ইনি পুংপ্রকৃতির সন্নিধান অর্থে দৈশিক সন্নিধান বুঝিয়াছেন। দেশকালাতীত পদার্থের ওরূপ সন্নিধান যে অসম্ভব তাহা বলা বাহুল্য। অবিবিক্ত জ্ঞান বা একপ্রত্যয়ান্তর্গততাই ঐ সন্নিধান। সুতরাং তাহার বিরুদ্ধ বিবেক হইতেই সেই সন্নিধান দূর হয় ও সুখ-দুঃখভোগ নষ্ট হয় ইহাই সাংখ্য সিদ্ধান্ত। শঙ্কেরা ইহার কিছুই বুঝেন নাই।

পুরুষের ভোক্তৃত্ব সম্বন্ধেও সেই কথা। শঙ্কেরা মনে করেন "ভোক্তৃত্ব" অর্থে বিক্রিয়া বিশেষ সুতরাং পুরুষ বিকারী অতএব "নিত্য" নহে। "বিক্রিয়ায়াশ্চ সম্ভাবে নিত্যত্বাদবহীয়তে"। (তত্ত্ব সং ২৯৫)। সাংখ্য

মতে ভোক্তৃত্ব অর্থে সাক্ষিত্ব বা বিজ্ঞাতৃত্ব (যোগভাষ্য দ্রষ্টব্য)। "ন হি বিজ্ঞাতু র্বিজ্ঞাতে র্বিপরিলোপো বিদ্যতে" তজ্জন্য মূল বিজ্ঞাতা নির্ব্বিকার। তিনিই বিজ্ঞানের নির্ব্বিকারমূল। আর "অর্থোপভোগকালে চ যদি নৈবাস্য বিক্রিয়া। নৈব ভোক্তৃত্বমস্য স্যাৎ প্রকৃতিশ্চোপকারিণী ॥" (তত্ত্ব সং২৯৪) অর্থাৎ অর্থোপভোগকালে যদি পুরুষের বিক্রিয়া না হয় তবে উহার ভোক্তৃত্বই সিদ্ধ হয় না আর প্রকৃতিও উহার উপকারিণী হইতে পারে না।

ভোক্তৃত্ব অর্থে সুখ দুঃখ বুদ্ধির প্রতিসংবেদিত্ব (কারণ সাংখ্য মতে "বুদ্ধেঃ প্রতিসংবেদী পুরুষঃ")। নির্বিকার পুরুষ তাহার হেতু বলিয়া ভোক্তা। এরূপ ভোক্তৃত্ব কেন সিদ্ধ হইবে না তাহার কিছু যুক্তি নাই। নিবিকার দ্রব্য দৃশ্যবর্গে নাই সুতরাং এবিষয়ের উদাহরণ হইতে পারে না। উপমা এইরূপ—একটা কৃষ্ণবর্ণ ও একটা শ্বেতবর্ণ দ্রব্য অন্ধকার হইতে সূর্য্যালোকে স্বকীয় গতিশক্তির দ্বারা যাইয়া প্রকাশিত হইল। এ স্থলে সূর্য্য প্রকাশক হইলেও যেমন তাহাতে সূর্য্যের বিক্রিয়া হয় না ঐ দ্রব্যদ্বয়ই প্রকাশিত অপ্রকাশিত হয় এবং সূর্য্যের প্রকাশকত্বকে খ্যাপিত করে সেইরূপ সুখ ও দুঃখরূপ জড়াবুদ্ধি ক্রিয়াশীল স্বভাবে উত্থিত হইয়া নির্বিকার পুরুষের দ্বারা "আমি সুখী" "আমি দুঃখী" এইরূপে প্রকাশিত হয়। মনে রাখিতে হইবে আমাদের ভাষা সহেতুক (বৌদ্ধ ভাষায় 'কৃতক') পদার্থ লইয়া হয়। অহেতুক বা unconditioned পদার্থ উহার দ্বারাই আমাদের ভাষিত করিতে হয় (সহেতুকত্ব নিষেধ করিয়া)। তাহা বিস্মৃত হইয়া শঙ্ককদের দ্বারা এই সব ন্যায়াভাস কল্পিত হইয়াছে।

প্রথমে সাধ্য—নির্ব্বিকার জ্ঞ পদার্থ। তাহা সিদ্ধ হইলে তাহাকে বিবক্ষানুসারে যে সব ভাষা প্রয়োগ করিয়া লক্ষিত করা হয় তাহাদেরকে অহেতুকত্ব নির্বিকারত্ব আদি অর্থে বুঝিতে হইবে। 'ভোক্তৃত্ব' শব্দও সেইরূপ নির্বিকারজ্ঞাতৃত্ব অর্থেই সাংখ্যেরা ব্যবহার করেন "আমি সুখী"

"আমি দুঃখী" এরূপ বিকারী ভাবের উহা সংজ্ঞা নহে। তাদৃশ আমিত্বের সংজ্ঞা 'গ্রহীতা'। কোন পদার্থকে 'অনন্ত' বলিলে কেহ দোষ ধরিতে পারে অন্তই ত দেখিতেছি অনন্ত দেখি না অতএব উহা নাই। নির্বি-কার ভোক্তা আদি পদার্থ সম্বন্ধেও ঐরূপ দোষ যে কল্পিত হইয়াছে তাহা বিজ্ঞ ব্যক্তিরা অনুধাবন করিলেই বুঝিবেন। অন্তের অভাব না দেখিলেও যেমন আমাদেরকে স্থলবিশেষে অনন্ত পদ ব্যবহার করিতে হয় (দর্শন বিজ্ঞানে), সেইরূপ ব্যবহারিক জ্ঞানকে বিকারি দেখিলেও উহার অহেতুক বিকারী উপাদান ও নির্বিকার নিমিত্ত কারণরূপ জ্ঞ বা চৈতন্য স্বীকার করিতে হয়।

সমস্ত আত্মবাদীদের একটি প্রধান যুক্তি 'প্রত্যভিজ্ঞা' 'সেই আমি এই' বা 'যে আমি দেখিয়াছিলাম সেই আমি শুনিতেছি' ইত্যাদ্যাকার একত্ব-অনুভূতিই প্রত্যভিজ্ঞা। কুমারিল ভট্ট শ্লোকবার্ত্তিকে বলিয়াছেন "তেনাস্মাৎ প্রত্যভিজ্ঞানাৎ সর্ব্বলোকাবধারিতাৎ। নৈরাত্ম্যবাদবাধঃস্যাৎ"। আমি ছিলাম, আমি থাকিব এই সব অনুভূতিতে (যাহা প্রত্যক্ষ প্রমাণ) আমি এক বলিয়াই অনুভূত বা প্রত্যভিজ্ঞাত হয়। অতএব আমিত্বের মধ্যে এমন কিছু আছে যাহা সর্ব্বাবস্থাতেই এক থাকে এবং তাহাই চিদ্রূপ আত্মা। আত্মবাদের প্রত্যভিজ্ঞামূলক সংক্ষেপ যুক্তি এইরূপ।

বৌদ্ধদের মতে সমস্ত ক্ষণিক। আত্মভাব ক্ষণে ক্ষণে উঠিতেছে ও লয় পাইতেছে। পূর্ব্বক্ষণিক ও পরক্ষণিক আত্মভাব অসম্বদ্ধ পৃথক্ দ্রব্য। ইহাতে আত্মবাদীরা যে দোষ দেখান তাহা এস্থলে উল্লেখ না করিলেও চলিবে। বৌদ্ধেরা প্রত্যভিজ্ঞাবাদ কিরূপে খণ্ডন করেন তাহাই দ্রষ্টব্য।

বৌদ্ধেরা নিম্নস্থ থিওরী বা উপপত্তিবাদের দ্বারা উহা খণ্ডন করিতে প্রয়াস পান। তাঁহারা বলেন ঐ যে একত্বজ্ঞান—যাহার স্বরূপ 'সেই আমি এই' এরূপ প্রত্যভিজ্ঞা—তাহা ভ্রান্তিমাত্র। আরও বলেন (কমলশীল) প্রত্যভিজ্ঞা প্রমাণ নহে। প্রত্যভিজ্ঞা যে প্রমাণ নহে তাহা সত্য। আত্ম-

বাদীরাও উহা বলেন না। উহা অনুমান প্রমাণের অঙ্গ মাত্র। 'এই সেই' এরূপ একত্ববোধ হয় দেখা যায়। তাদৃশ অনুভূতি হইতে অনুমান হয় যে ঐ দুই বস্তু এক। ইহাই আত্মবাদীরা বলেন। পূর্ব্বে একজনকে দেখিয়াছিলাম পুনরায় তাহাকে দেখিয়া যে প্রমাণে বলি বা নিশ্চয় করি যে 'এই সেই ব্যক্তি' আত্মক্ষেত্রেও সেই ন্যায়।

আত্মার একত্ব যাহা সাক্ষাৎ অনুভূত হয় তাহা যে ভ্রান্তিমাত্র তাহার প্রমাণ বৌদ্ধেরা দিতে পারেন না। সংশয় উত্থাপন করিতে পারেন মাত্র। তাহা কিন্তু প্রমাণ নহে। ভ্রান্তি হইলে দুইটী সৎ পদার্থ চাই অর্থাৎ আত্মবিষয়ক ভ্রান্তিতে একটী পরিবর্ত্তনশীল আত্মভাব চাই ও একটী অপরিবর্ত্তনশীল আত্মভাব চাই তবেই ভ্রান্তি হইতে পারে। এইরূপ দুই আত্মভাব থাকিলে তবেই পরিবর্ত্তনশীলকে অপরিবর্ত্তনশীল ও অপরিবর্ত্তনশীলকে পরিবর্ত্তনশীল বলিয়া ভ্রান্তি হইতে পারে। বৌদ্ধেরা বলেন তাহা না হইতেও পারে। শান্তরক্ষিত বলেন 'খ পুষ্প'-জ্ঞানে কিছু সৎপদার্থ না থাকিলেও যেমন জ্ঞান হয় বা 'হস্ত্যাদি শূন্যায়াং ভূমৌ' যেমন হস্ত্যাদির আরোপ জ্ঞান হয়, সেইরূপ দুই সৎপদার্থ না থাকিলেও ভ্রান্তি বা আরোপ হইতে পারে। এই দৃষ্টান্ত সদোষ। হস্তী আদি পূর্ব্বদৃষ্ট সৎপদার্থ, ভূমিও সৎপদার্থ। হস্তীর স্মৃতি (যাহা সৎপদার্থ) উঠিয়া ভূমিতে কল্পনার দ্বারা আরোপিত হয় মাত্র। হস্তীর অত্যন্তাভাব থাকিলে বা পূর্ব্বদৃষ্ট না হইলে কখন হস্তীর স্মৃতি হইতে পারে না। অতএব ঐরূপ ভ্রান্তিদর্শনের (hallucinationএর) জন্যও দুই ভাব পদার্থ চাই। আত্মসম্বন্ধীয় ভ্রান্তিতেও তাহা চাই। শান্তরক্ষিত যে বলেন "জ্ঞাতরি প্রত্যভিজ্ঞানং বাসনা কর্ত্তুমর্হতি" তাহা সত্য কথা। আত্মবাদীরাও তাহা বলেন। কিন্তু বাসনা বা সংস্কার হইতে হইলে অনুভাব্য সৎপদার্থ চাই। আত্মভাবের একত্ব প্রত্যয় কেন হয় তাহা বৌদ্ধেরা এইরূপে বুঝাইতে চান:—বিজ্ঞান সন্তান একজাতীয় বলিয়া অর্থাৎ পূর্ব্বক্ষণিক ও পরক্ষণিক বিজ্ঞান একজাতীয় বলিয়া 'আমি এক'

এরূপ একত্ব ভ্রান্তি হয়। আত্মভাবের জ্ঞাতৃত্বাংশ কিন্তু একজাতীয় বলিয়া অনুভূতি হয় না তাহা এক বলিয়াই অনুভূতি হয়। তবে আত্মভাবের জ্ঞেয়াংশ একজাতীয় বলিয়া অনুভূতি হয়। আত্মবাদীরা জ্ঞাতাকেই এক অবিকারী বলেন জ্ঞেয়কে একজাতীয় সন্তান বলেন (বৌদ্ধদের ন্যায়)। বৌদ্ধেরা এইস্থলে ঐ উভয়ের বিবেক করিতে না পারিয়া ভ্রান্তি করেন।

সাংখ্যেরা উপমা দেন "প্রতিবিম্বোদয়ো যথা স্বচ্ছে চন্দ্রমসোঽম্ভসি" অর্থাৎ স্বচ্ছ জলে যেমন চন্দ্রের প্রতিবিম্ব হয় সেইরূপ পুরুষে ভোগ উপ-চরিত হয় (বুদ্ধির চেতনতাও সেইরূপ)। প্রতিবিম্ব যেরূপ দর্পণের মধ্যে প্রবেশ করে না, কিন্তু দর্পণমধ্যস্থ বলিয়া বোধ হয় পুরুষের ভোগ ও যে সেইরূপ ইহাই এই উপমার দ্বারা কথঞ্চিৎ বুঝান হয়। বৌদ্ধেরা তাহা না বুঝিয়া উহার সর্ব্বাংশ গ্রহণ করিয়া দোষ ধরেন। "উচ্যতে প্রতিবিম্বস্য তাদাত্ম্যেন সমুদ্ভবে। তদেবোদয়-যোগিত্বং বিভেদে তু ন ভোক্তৃতা॥" (তত্ত্ব সং ২৯৮) অর্থাৎ এই প্রতিবিম্ব যদি তাদাত্ম্যরূপে বা পুরুষগতরূপে উদয় হয় তবে পুরুষ উদয়-ব্যয়ধর্ম্মযুক্ত হন, আর উহা বিভিন্ন হইলে পুরুষের ভোক্তৃত্ব সিদ্ধ হয় না। সাংখ্য বলেন "ভোগাপবর্গৌ বুদ্ধিকৃতৌ বুদ্ধাবেব বর্ত্তমানৌ পুরুষে ব্যপদিশ্যেতে।" উহা বিকারকৃৎ ভোগ নহে বলিয়া—উহা উপচরিত বলিয়া, পুরুষে উহার উপচার হয়—ইহা বলিতে বিন্দুমাত্র দোষ নাই। উপমা (উদাহরণ নহে) লইয়াই এই সব গোল। উপমা (যাহা প্রমাণ নহে) না দিলে অন্যপক্ষ এসব কিছুই বলিতে পারি-তেন না। যাহাতে বিকার হয় না এরূপ সাক্ষিত্বকেই সাংখ্যেরা ভোগ বলেন।

উদাহরণ (example, simile নহে) হইতে সামান্য নিয়ম (induced law) সিদ্ধ হয়। তাহা লইয়া সামান্যতোদৃষ্ট অনুমানের (inductionএর) দ্বারা অপ্রত্যক্ষ অতীন্দ্রিয় বিষয়ের সত্তা নিশ্চিত হয়। সাংখ্যের 'সংঘাত পরার্থত্ব' যুক্তি (পুরুষসিদ্ধিবিষয়ে) ঐরূপ। যাহারা একযোগে মিলিয়া

কার্য্য করে বা ফল দেয় তাহারা উপরিস্থিত এক শক্তির বশেই ওরূপ করে
এক প্রযোক্তা না থাকিলে কিরূপে সকলে একযোগে কার্য্য করিবে ?

এই সংহত্যকারিত্বকে 'উপকার' অর্থ করিয়া শান্তরক্ষিত প্রভৃতি বৌদ্ধেরা সাংখ্যপক্ষ খণ্ডন করার প্রয়াস পাইয়াছেন। উপকরণের কার্য্য মাত্র যে এস্থলে উপকার তাহা না বুঝিয়া কিন্তু প্রকৃতির উপচিকীর্ষুতা ও পুরুষের উপকারাপেক্ষা বুঝিয়া তাঁহারা গোল করেন। চক্ষুরাদি বাহ্য করণসকল সংহত্যকারী ; তাহারা উপরিস্থ চিত্তের বা বিজ্ঞানের উপকরণ রূপে সংহত্যকারী। ইহা উভয়পক্ষই স্বীকার করেন। বৌদ্ধেরা বলেন "অবিকার্য্যুপকারিত্বসাধনে সাধ্যশূন্যতা। দৃষ্টান্তস্য চলস্যৈব যুক্তাস্তেপ্যুপকারিণঃ॥" (তত্ত্ব সং ৩০১) অর্থাৎ অবিকারীর (বৌদ্ধমতে নিত্যের ; সাংখ্যমতে বিকারী নিত্যও আছে) উপকার হয় যদি বল (সংহত্যকারিত্বের দ্বারা) তাহা হইলে সাধ্য যে অবিকারিত্ব তাহা থাকে না ; কারণ শয্যাসনাদি চল বা অনিত্য দৃষ্টান্তের দ্বারা তাহারা যে অনিত্যের উপকারী তাহাই সিদ্ধ হইবে—তদতিরিক্ত নিত্য কোন আধেয় পদার্থ সিদ্ধ হইবে না।

এই যুক্তির দোষ এইরূপ—অনিত্য পদার্থের দৃষ্টান্তের দ্বারা এখানে নিত্য পদার্থ সিদ্ধ করা হইতেছে না, (যদিচ অনিত্যের তুলনায় আমরা নিত্যের অভিকল্পনা করি) কিন্তু এরূপ ক্ষেত্রে যে এক উপরিস্থ পর থাকিবে তাহাই এস্থলে সাধ্য। সেই পর ওপারস্থ এবং বিজ্ঞান অবারস্থ বা এপারস্থ। অতএব সেই পর অনিত্য-বিজ্ঞানের লক্ষণক হইবে না, নিত্যলক্ষণক হইবে। তাহা নিষ্কারণ বলিয়া নিত্য। তাহার নির্বিকারত্ব অন্যরূপে সাধ্য। কার্য্য অপেক্ষা কারণ আপেক্ষিক নিত্য। মূল কারণ তজ্জন্য পূর্ণ নিত্য। যাহা বরাবর আছে তাহা নিত্য। অনিত্যতা বা ক্রিয়াশীলতা (অবস্থান্তরতা) বরাবর আছে অতএব তাহাকে সাংখ্য পরিণামনিত্যতা বলেন। সংহত্যকারী ও পরিণামী বিজ্ঞানের 'পর' যে 'শুদ্ধ'

বিজ্ঞাতা তাহা পরিণামি-বিজ্ঞানের বিরুদ্ধত্বহেতু অপরিণামী। বিজ্ঞানের সংহত্যকারিত্ব বিষয়ে কমলশীল যে যুক্তি দেন তাহা এই—"চিত্তস্য চানেক-কারণ কৃতোপকারোপগ্রহেণোৎপত্তেঃ সংঘাতত্বং কল্পিতমস্ত্বেবেতি হেতোঃ"। চিত্ত অনেক কারণকৃত উপকার উপগ্রহণ করিয়া উৎপন্ন হয় বলিয়া উহার সংঘাতত্ব সিদ্ধ হয়। সাংখ্য বলেন সেই অনেক কারণ একযোগে সমঞ্জস-ভাবে কার্য্য করিয়া যখন এক চিত্ত (জ্ঞান ইচ্ছাদি) উৎপাদন করে তখন ঐ সংস্কারাদি কারণ সকলের উপরে এক শক্তি থাকিবে। তাহাই দৃশ্যের পরপারস্থ পুরুষ। সেই একস্বরূপ স্বচৈতন্য পদার্থের পৃষ্ঠস্থতাতেই 'আমি অবিভাজ্য এক', 'আমি আমাকে জানি', 'সেই আমি এই' ইত্যাদি অখণ্ড্য একত্বের, স্বপ্রকাশের, নির্ব্বিকারত্বের লিঙ্গ আমিত্ববোধে পাওয়া যায়। আবার বহুসমষ্টিতা, জ্ঞেয়তা ও পরিবর্ত্তনশীলতাও পাওয়া যায়। তাই সাংখ্য বলেন নিত্য, নির্ব্বিকার, স্বপ্রকাশ পদার্থ এবং নিত্যবিকারী প্রকাশ্য পদার্থ এই দ্বিবিধ পদার্থের দ্বারা আমিত্ব নির্ম্মিত। বৌদ্ধ এই প্রকৃত যুক্তির বিরুদ্ধে কিছু বলিতে পারেন নাই। অতএব বৌদ্ধ যে বলেন ইন্দ্রিয় হইতেই জ্ঞান সিদ্ধ হয় চৈতন্য কল্পনা ব্যর্থ তাহা সম্পূর্ণ ভ্রান্তি। বৌদ্ধ বলেন "চৈতন্যে চাত্মশব্দস্য নিবেশেঽপি ন নঃ ক্ষতিঃ। নিত্যত্বং তস্য দুঃসাধ্যম্ অক্ষ্যাদেঃ সফলত্বতঃ॥ অক্ষ্যার্থাত্মফলং তু স্যাচ্চৈতন্যং শাশ্বতং যদি। ন ভবেদিন্ধনেনার্থো যদি স্যাৎ শাশ্বতোঽনলঃ॥" (তত্ত্ব সং ৩০৫-৬) অর্থাৎ চৈতন্যে আত্মশব্দের নিবেশে আমাদের ক্ষতি নাই। তবে (আমরা বলি) তাহার নিত্যত্ব দুঃসাধ্য ; কারণ তাহা নিত্য হইলে অক্ষি আদি সফল (জ্ঞান জননে) হয় না। চক্ষুরাদির অর্থ অফল হয় যদি চৈতন্য শাশ্বত হয়। যদি অনল শাশ্বত হয় তবে আর কাঠে প্রয়োজন কি ? ইহা অতীব অযুক্ত কথা। অনল ও ইন্ধনে যে সম্বন্ধ ইন্দ্রিয়ে ও চৈতন্যে সে সম্বন্ধ নহে। ইন্দ্রিয়-জ্ঞান চৈতন্য নহে। বৃষ্টি হইতেই জল পাওয়া যায় অতএব জলের জন্য সমুদ্রে ও সূর্য্যে প্রয়োজন কি ? মৃত্তিকা যদি শাশ্বত

হয় তবে ঘটে প্রয়োজন কি ? এই সব যেমন অযুক্ত কথা ঐ দৃষ্টান্তও তদ্রূপ। চৈতন্য ও ত্রিগুণ ইন্দ্রিয়ের হেতু ও উপাদান তাই শাশ্বত চৈতন্যের ও শাশ্বত প্রকাশ-ক্রিয়া-স্থিতির প্রয়োজন।

মাধ্যমিকেরা কিছুকে অস্তিও বলিতে চান না নাস্তিও বলিতে চান না। সেইরূপ না বলাই তাঁহারা মধ্যম পথ মনে করেন ও তাহাই যুক্ত মনে করেন (অন্য সর্ব্বাস্তিবাদী বৌদ্ধেরা সেরূপ নহেন)। কিন্তু যখন অস্তি ও নাস্তি ব্যতীত কথা বলা চলে না তখন কথা না বলাই তাঁহাদের সম্যক্ দর্শন হওয়া উচিত। মধ্যমককারিকায় নাগার্জ্জুন বলিয়াছেন "কাত্যায়নাববাদে চাস্তীতি নাস্তীতি চোভয়ং। প্রতিষিদ্ধং ভগবতা ভাবা-ভাব বিভাবিনা।" (১৫।৭) অর্থাৎ ভগবান্ অস্তি ও নাস্তি উভয়ই প্রতিষেধ করিয়াছেন। •অবশ্য ইহা আগমের কথা সুতরাং দর্শনে অগ্রাহ্য। তাই নাগার্জ্জুন যুক্তি দেন "যদ্যস্তিত্বং প্রকৃত্যা স্যান্ন ভবেদস্য নাস্তিতা। প্রকৃতেরন্যথাভাবো ন হি জাতূপপদ্যতে॥" (১৫।৮) যদি স্বভাবত অস্তিতা হয় তবে তাহার নাস্তিতা কখনও হইতে পারে না। ইহা সাংখ্যের সম্যক্ অনুমত। কিন্তু পরে যে বলিয়াছেন "প্রকৃতির অন্যথাভাব কখনও উপপন্ন হয় না" তাহা সদোষ কথা কারণ অন্যথাভাব নাস্তিতা নহে উহার অর্থ অন্যরূপ ভাব বা অস্তিতা। সাংখ্যেরা বলেন এই অন্যথাভাবই অন্যতম মূল স্বভাব তাহার কখনও নাস্তিতা হয় না। বৌদ্ধেরা যে 'অনিত্যং' চিন্তা করেন এবং উহাকে সত্যচিন্তা বলেন তাহা এই ক্রিয়াশীলতা বা অন্যথাভাবরূপ স্বভাব।

অতঃপর নাগার্জ্জুন ও তাঁহার অন্যতম বৃত্তিকার চন্দ্রকীর্ত্তির আত্মা-সম্বন্ধে আপত্তি পরীক্ষিত হইতেছে।

"আত্মা স্কন্ধা যদি ভবেদুদয়ব্যয়ভাগ্ ভবেৎ। স্কন্ধেভ্যোঽন্যো যদি ভবেদ্ ভবেদস্কন্ধলক্ষণঃ॥ (মধ্যমকসূত্র ১৮।১) অর্থাৎ আত্মা যদি বিজ্ঞানাদি স্কন্ধের অন্তর্গত হয় তবে তাঁহা উদয়ব্যয়-ধর্ম্মক হইবে আর স্কন্ধ হইতে অন্য কিছু হইলে অস্কন্ধলক্ষণ হইবে। অস্কন্ধ অবিদ্যমান (বৌদ্ধেরা বলেন যাহারা

পঞ্চস্কন্ধের অতিরিক্ত বস্তু স্বীকার করে তারা বৌদ্ধই নহে) অতএব আত্মা "খপুষ্পবন্ নির্ব্বাণবদ্ বা নৈবাত্মব্যপদেশং প্রতিলভতে" অর্থাৎ তাহা আকাশকুসুমের মত বা নির্ব্বাণের মত এবং তাহা আত্মব্যপদেশ লাভ করিবে না বা আত্মপদের অর্থের দ্বারা বিশেষিত হইতে পারিবে না।

এই যুক্তির দোষ এইরূপ—যদি পঞ্চ স্কন্ধ ছাড়া আর কিছু না থাকিত তবে এই কথার মূল্য থাকিত কিন্তু আত্মা বিজ্ঞানাদি স্কন্ধের অতিরিক্ত ও বিজ্ঞানের কারণভূত সৎপদার্থ। নিজেদের সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আত্মা পড়ে না বলিয়া তাহা নাই এরূপ কথা সঙ্গত নহে। বিজ্ঞানকে বিশ্লেষ করিয়া ত্রিগুণরূপ বিকারি কারণ ও পুরুষরূপ অবিকারী হেতু যে সাংখ্য দেখান তাহার দোষ দেখাইতে পারিলে তবেই এ বিষয়ে ন্যায় সঙ্গত কথা বলা হইবে। পুরুষে আত্মব্যপদেশ হওয়া বিধেয় নহে ইহা কতক সত্য কথা। সাংখ্যেরাও বুদ্ধি ও অহংকাররূপ সাধারণ আত্মার ব্যপদেশ পুরুষে করেন না, কিন্তু তাঁহাতে সাধারণ আত্মভাবহীনত্বের ব্যপদেশ করিয়া তাঁহাকে প্রকৃত আত্মা বলেন।

চন্দ্রকীর্ত্তি বলেন "সত্যং ব্রুবন্তি তীর্থিকাঃ স্কন্ধব্যতিরিক্তস্য লক্ষণং ন পুনস্তে স্বরূপত আত্মানমুপলভ্য তস্য লক্ষণমাচক্ষতে" অর্থাৎ তীর্থিকেরা (অন্যশাস্ত্রকারেরা) আত্মা স্কন্ধব্যতিরিক্ত এরূপ যে লক্ষণ (নিত্যরূপ, অকর্ত্তা, ভোক্তা, নির্গুণ, নিষ্ক্রিয়—"আত্মা তীর্থ্যৈঃ কল্প্যতে নিত্যরূপোঽকর্ত্তা ভোক্তা নির্গুণো নিষ্ক্রিয়শ্চ") করেন তাহা সত্য; কিন্তু তাঁহারা আত্মাকে স্বরূপত উপলব্ধি করিয়া তাঁহার লক্ষণ বলেন না (অতএব তাঁহাদের কথা সংবৃতি সত্যও নহে অর্থাৎ ব্যবহার সত্যও নহে)।

আত্মা অবশ্য স্বরূপত উপলব্ধি করার পদার্থ নহে কারণ তিনি অবাঙ্মনসগোচর। কিন্তু তাদৃশ পদার্থ যে আছে ইহা সত্য ও চিন্ত্য বিষয়। সাংখ্যেরা তাহাই বলেন। বৌদ্ধদের নির্ব্বাণও স্বরূপত অনুপলভ্য তথাপি যেমন তাঁহারা নির্ব্বাণের লক্ষণ করেন, আত্মবাদীরাও

সেইরূপ করেন। সমস্ত শাস্ত্রই সংবৃতি সত্য। সৎকারণবাদ সংবৃতি সত্যের চরম সত্য। অসৎকারণবাদ সংবৃতি মিথ্যা। সদসদ্ভ্যামনির্ব্বাচ্য-বাদ (যাহা মধ্যমক বৌদ্ধ ও আর্যমায়াবাদীদের মত) অদার্শনিক প্রলাপ-মাত্র তাহা পূর্ব্বে দেখান হইয়াছে।

বৌদ্ধেরা বলেন "অহঙ্কারোদ্ভবাঃ স্কন্ধাঃসোঽহংকারো হ্যনৃতোঽর্থতঃ। বীজং যস্যানৃতং তস্য প্ররোহঃ সত্যতঃ কুতঃ॥" (রত্নাবলী) অর্থাৎ স্কন্ধ সকল অহংকারজনিত; আর সেই অহংকার পরমার্থত অনৃত। যাহার বীজ অনৃত তাহার প্ররোহ কিরূপে সত্য হইবে? বিজ্ঞানাদি যে অহং-কারোদ্ভব তাহা সাংখ্যসম্মত (অহংকারাৎ পঞ্চতন্মাত্রাণ্যুভয়মিন্দ্রিয়ং। সাংখ্যসূত্র)। অহংকার বা অস্মিতা যে মিথ্যাজ্ঞান-বিশেষ তাহাও সাংখ্য-সম্মত। তবে মিথ্যা অর্থে অসৎ নহে কিন্তু এককে অন্যরূপ জ্ঞান। অহংকাররূপ মিথ্যাজ্ঞান কাহাকে কি জ্ঞান? বলিতে হইবে 'স্কন্ধকে আত্মজ্ঞান' অতএব সত্য স্কন্ধও আছে আর সত্য আত্মাও আছে। নাগার্জ্জুন বলেন যে (মধ্য ১৮।২) সর্ব্ববাদীরা "নির্ম্মমো নিরহংকার অবস্থাকে নির্ব্বাণ বলেন। তাহাতে সিদ্ধ হয়—নির্ম্মমো নিরহংকারঃ শমাদাত্মাত্মনীনয়োঃ" অর্থাৎ আত্মত্ব বা অহংকার এবং আত্মনীনত্ব বা মমকার নিরুদ্ধ হইলে নির্ব্বাণ সিদ্ধ হয়। প্রশ্ন হইবে তাহা হইলে অবশ্য কিছু নির্ম্মম নিরহংকার পদার্থ থাকিবে (যাহা সাংখ্যদের আত্মা)। বৌদ্ধেরা ইহার উত্তর দিতে পারেন না কেবল স্বশাস্ত্রের দোহাই দিয়া বলেন "ন বিদ্যতে সোঽপি কশ্চিদ্ যো ভাবয়তি শূন্যতাং"। "নির্ম্মমো নিরহংকারো যশ্চ সোঽপি ন বিদ্যতে"। গাথায় আছে "স্কন্ধ সভাবতু শূন্য বিবিক্ত বোধি সভাবতু শূন্য বিবিক্ত। যো পি চরেৎ স পি শূন্যসভাবো জ্ঞানবতো ন তু বাল-জনস্য"। অর্থাৎ স্কন্ধসকল স্বভাবত শূন্য ও বিবিক্ত, বোধিজ্ঞান স্বভাবত শূন্য বিবিক্ত, যিনি নির্ব্বাণ সাধন করিতেছেন তিনিও শূন্যস্বভাব ও বিবিক্ত ইহা জ্ঞানবান্‌দের দৃষ্টি বালজনের নহে। বলা বাহুল্য ইহা সব প্রমাণহীন

প্রতিজ্ঞামাত্র। আমি অভিমান ছাড়িতে থাকিলে শেষে অভিমানশূন্য 'আমি' থাকিব ইহাই সাংখ্যীয় ন্যায্য দর্শন। আমিত্বের কিছুই থাকিবে না ইহা অকল্পনীয় অন্যায্য দৃষ্টি। অভিমানহীন পদার্থকে আত্মা বলিব না বৌদ্ধদের ইহা অভিপ্রায়। তাহাকে তাঁহারা শূন্য বলিতে চান। তাহাতে শূন্য অভিমানশূন্য আমিত্ব হয়। বৌদ্ধেরা বলিবেন অভিমানশূন্য আমিত্ব অর্থে আমিত্বশূন্য আমিত্ব, তাহার অর্থে শূন্য। যদি আমিত্ব অমূল হইত তবে ইহা সত্য হইত। কিন্তু আমিত্ব সকারণভাব। তন্মধ্যে দ্রষ্টৃত্ব ও দৃশ্যত্ব দেখিয়া জানা যায় যে তাহার দুই কারণ—এক দ্রষ্টা বা চেতন আর এক দৃশ্য অচেতন ত্রিগুণ। অভিমান যাইলে মূল-কারণদ্বয়ের কার্য্যই যাইবে কিন্তু সেই কারণদ্বয় থাকিবে। ঐ চেতন বা চৈতন্যরূপ কারণকে আর্ষেরা আত্মা বলেন। সাধারণ ভ্রান্ত আমিত্বকে অস্মিতা বা অতথ জ্ঞানবিশেষ বলেন।

বৌদ্ধেরা বলেন বিজ্ঞাতা কেহ নাই বিজ্ঞানই আছে। অহংবোধ আলয় বিজ্ঞান "তৎস্যাদালয়বিজ্ঞানং যদ্ভবেদহমাস্পদং"। তাহাই বিজ্ঞাতা আর তদতিরিক্ত বিজ্ঞাতা নাই। কিন্তু ইহা সদোষ কথা। আমাদের স্বত অনুভব হয় "আমি জ্ঞাতা এবং অন্য সব জ্ঞেয়"। এই 'অন্য সব' বিশ্লেষ করিলে আন্তর ও বাহ্য পদার্থ অনাত্মভাব হয়। অনাত্মবিজ্ঞেয়ভাব বিজ্ঞাতার সহিত একবৎ প্রতীত হয় ইহাও অনুভব হয়। এই প্রতিভাসের বা মিথ্যাজ্ঞানের হেতু কি? মিথ্যাজ্ঞান একে অন্য জ্ঞান। অতএব বিজ্ঞাতাকে বিজ্ঞেয় জ্ঞান ও বিজ্ঞেয়কে বিজ্ঞাতাজ্ঞান এইরূপ মিথ্যা জ্ঞানে পৃথক্ বিজ্ঞাতা ও পৃথক্ বিজ্ঞেয় থাকিবে যাহাদের প্রতিভাস হয়। জ্ঞাতা ও বিজ্ঞেয় বিরুদ্ধধর্ম্মযুক্ত বলিয়া প্রত্যক্ষত অনুভূত হয়। অতএব বিজ্ঞেয়-ধর্ম্মশূন্য বা দৃশ্যধর্ম্মশূন্য বিজ্ঞাতা আছেন এই সত্য চরম সত্য অর্থাৎ যতদিন মানসচিন্তা থাকিবে ততদিন ইহা সত্য বলিয়া চিন্তিত ও ভাবিত হইবে।

অতঃপর প্রকৃতি সম্বন্ধে বৌদ্ধদের আপত্তি পরীক্ষিত হইতেছে সত্ত্ব, রজ

ও তম এই তিন গুণের বা দ্রব্যের স্বরূপ বৌদ্ধাদি অনেক ভিন্নবাদীরা মোটেই বুঝেন না। এমন কি অনেক সাংখ্যের ব্যাখ্যাকারেরাও বুঝেন নাই। তাঁহারা গুণত্রয়ের প্রকৃত স্বভাব না বুঝিয়া গুণবৃত্তির লক্ষণ লইয়া গোল করেন। সুখ, দুঃখ ও মোহ ইহাদের নাম গুণবৃত্তি বা গুণপ্রধানবৃত্তি। সত্ত্বপ্রধান চিত্তবৃত্তি সুখ, রজঃপ্রধানবৃত্তি দুঃখ ও তমঃপ্রধানবৃত্তি মোহ। কিন্তু সত্ত্বের স্বভাব প্রকাশ বা জ্ঞাত হওয়া, রজর স্বভাব ক্রিয়া বা অবস্থান্তরতা, তমর স্বভাব স্থিতি বা প্রকাশ ও ক্রিয়ার আবরণ, এই তিন স্বভাব বাহ্যান্তর সমস্ত দ্রব্যে পাওয়া যায় বলিয়া সমস্তই ত্রিগুণাত্মক ইহাই সাংখ্যমত। ইহা ছাড়া অন্য মৌলিক স্বভাব নাই। যদি কেহ তাহা দেখাতে পারেন তবেই সাংখ্যমত নিরস্ত হইবে। কিন্তু বৌদ্ধ বা কেহ তাহা দেখাতে পারেন নাই, পারার উপায়ও নাই।

আত্মা-শরীর-আদিকে শূন্য প্রমাণ করার জন্য বৌদ্ধদের একটী সাধারণ যুক্তিপ্রণালী এই :—হস্তপদাদি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও মাংস অস্থি আদি যে ধাতুসকল ইহাদের প্রত্যেকে শরীর নহে। যদি বল উহাদের সমষ্টি শরীর তবে উহা নাম মাত্র হইল। যদি বল শরীর কিছু না হউক কিন্তু অস্থি আদি ত কিছু। তাহাতে বক্তব্য অস্থি আদিও কিছু নহে, কারণ তাহারা পরমাণুর সমষ্টি। আর পরমাণু নিরংশ সুতরাং শরীর শূন্য। এই যুক্তির এই পর্য্যন্ত সত্য যে পরমাণুর সংস্থান বিশেষই শরীর। কিন্তু পরমাণু নিরংশ বলিয়া কিছু নহে ইহা সত্য নহে। পরমাণু নিরংশ কিছু। সাংখ্য তাহাই বলেন। নিরংশ বা দিগ্ব্যাপ্তিহীন যে অন্তঃকরণ তাহাই মূলত পরমাণু। "অহংকারাৎ পঞ্চতন্মাত্রাণি" এই সাংখ্যীয় দৃষ্টিই এ বিষয়ে সার কথা। শরীর পরমাণু সমষ্টি, পরমাণু অভিমান-মূলক, অভিমান মহান্ আত্মা বা আমি মাত্র বোধমূলক, তাহারও উপাদান দৃশ্য ত্রিগুণ ও হেতু দ্রষ্টৃচৈতন্য—এইরূপে শেষ পর্য্যন্ত সৎপদার্থ স্বীকার দার্শনিক দৃষ্টিতে ন্যায়সঙ্গত হয়।

বৌদ্ধাদিরা প্রকাশাদি স্বভাব ছাড়িয়া 'প্রসাদ তাপ দৈন্য' বা 'প্রসাদ উদ্বেগ আবরণ' প্রভৃতি সুখদুঃখমোহ বাচক কথা বুঝিয়া তাহার দ্বারা বাহ্যান্তর পদার্থ নির্ম্মিত—এরূপই সাখ্যমত মনে করিয়া বিচার করেন। সুতরাং তাহা সব অলক্ষ্যগামী বিচার। তাদৃশ বাজে কথা পরীক্ষা করা নিষ্ফল। সুখ দুঃখ ও মোহের দ্বারা বাহ্যান্তর পদার্থ নির্ম্মিত নহে কিন্তু প্রকাশ, ক্রিয়া ও স্থিতির দ্বারা নির্ম্মিত।

শান্তরক্ষিত বলেন "সিদ্ধেঽপি ত্রিগুণে ব্যক্তে ন প্রধানং প্রসিধ্যতি। একং তৎকারণং নিত্যং নৈকজাত্যন্বিত্যং হি তৎ॥" (তত্ত্বসং ৪১) ব্যক্তভাব সকল ত্রিগুণাত্মক ইহা সিদ্ধ হইলেও প্রধান সিদ্ধ হয় না, কারণ ব্যক্তভাবের কারণ প্রধান এক ও নিত্য, আর ব্যক্তভাব সকল বহু ও অনিত্য অতএব তাহারা এক জাতীয় নহে (অর্থাৎ এক জাতীয় নহে বলিয়া ব্যক্তের ও অব্যক্তের কার্য্য-কারণ ভাব নাই যেহেতু কার্য্যে ও কারণে এক জাতীয় হওয়া আবশ্যক)। সাংখ্য বলেন কার্য্যে ও কারণে সম্যক্ অভেদ থাকে না কিন্তু মূল স্বভাবে অভেদ থাকে আর নিমিত্তের দ্বারা কারণ হইতে কিছু ভেদ হইয়া কার্য্য হয়। যেমন মৃৎপিণ্ড কারণ ও ঘট কার্য্য। মৃত্তিকাত্ব স্বভাবে উহারা একজাতীয় কিন্তু আকারে ভিন্ন জাতীয়। ইহা প্রত্যক্ষদৃষ্ট বিষয়। ব্যক্ত ও অব্যক্তে সেইরূপ প্রকাশক্রিয়াস্থিতি স্বভাবে ঐক্য; আর নিত্যত্ব,ব্যাপিত্ব, একত্ব-আদি এবং অনিত্যত্ব, অব্যাপিত্ব, বহুত্ব আদি স্বভাবে অনৈক্য। অতএব বৌদ্ধের আপত্তি নিঃসার। "অয়ঃশলাকাকল্পা হি ক্রমসঙ্গতমূর্ত্তয়ঃ। দৃশ্যন্তে ব্যক্তয়ঃ সর্ব্বাঃ কল্পনা মিশ্রিতাত্মিকাঃ॥" (তত্ত্ব সং ৪২) পূর্ব্বে যে ব্যক্তভাবের বহুত্ব ও অনিত্যত্ব বলিয়াছেন তাহা শান্তরক্ষিত দেখাইতেছেন—ব্যক্তভাব সকল লৌহশলাকার মত পরস্পর বিভিন্ন বা বহু, কালক্রমে উঠিতেছে ও যাইতেছে বলিয়া অনিত্য (ক্রম-সঙ্গত-মূর্ত্তি) আর তাহারা কল্পনার দ্বারা এক বলিয়া বোধ হয়। এইরূপে বহুত্ব ও অনিত্যত্ব-হেতু ব্যক্ত দ্রব্য সকল এক নিত্য প্রধান হইতে ভিন্ন-

জাতীয় সুতরাং ব্যক্ত সকল প্রধানের কার্য্য হইতে পারে না। ইহার উত্তর উপরে দেওয়া হইয়াছে। তবে এখানে ক্ষণভঙ্গরূপ যে প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ মত উল্লিখিত হইয়াছে তাহা পরীক্ষণীয়।

তন্মতে "যৎ সৎ তৎ ক্ষণিকং যথা ঘটঃ" (ক্ষণভঙ্গসিদ্ধিতে রত্নকীর্ত্তি)। সংক্ষেপত এইমত এইরূপ, যেমন প্রদীপে প্রতিমুহূর্ত্তে নূতন তৈল আসিয়া নূতন আলোক করে প্রতিক্ষণের তৈল ও আলোক যেমন বিভিন্ন হইলেও এক বলিয়া প্রতিভাত হয় সেইরূপ এই বাহ্য ও আধ্যাত্মিক জগৎ ক্ষণমাত্র-স্থায়ি,প্রতিক্ষণে নূতন জগৎ বা ধর্ম্মস্কন্ধ উদয় হইতেছে ও বিনাশ হইতেছে। পূর্ব্বক্ষণের ধর্ম্ম ও উত্তর ক্ষণের ধর্ম্ম এই দুইয়ে কোন মৌলিক ভাব পদার্থ অন্বিত থাকে না ; উভয়ই পৃথক্। তবে এইমাত্র বক্তব্য যে পূর্ব্বটী প্রত্যয় বা কারণ ও পরটী প্রতীত্য বা কার্য্য। প্রত্যয় না থাকিলে প্রতীত্য থাকে না এতাবন্মাত্রই বক্তব্য। কারণ কার্য্যরূপে পরিণত হয় বা কার্য্যে যায় ইহা বক্তব্য নহে। কারণ এবং কার্য্য নিরন্বয় অর্থাৎ ঐ দুইয়ের মধ্যে কিছু সাধারণ অন্বিত ভাব নাই। ইহা অনেক বৌদ্ধের মত। ইহার নাম ক্ষণ-ভঙ্গবাদ। শান্তরক্ষিত, রত্নকীর্ত্তি প্রভৃতিরা ক্ষণভঙ্গসিদ্ধি প্রকরণে এই মত প্রপঞ্চিত করিয়াছেন। তন্মতে স্থিরভাব কিছু নাই। সাংখ্যীয় দর্শনেও জগৎ ক্রিয়াশীল বা পরিণামশীল সুতরাং ক্ষণে ক্ষণে ভঙ্গ হইতেছে ও ব্যক্ত ভাব সকল অস্থির। কিন্তু পূর্ব্ব ধর্ম্মে ও পরধর্ম্মে বা কারণে ও কার্য্যে সমন্বয় (সমন্বয়াৎ—সাংখ্যকারিকা) আছে অর্থাৎ কিছু ভাব পদার্থ কারণ হইতে কার্য্যে আসে। সমন্বয় ও নিরন্বয় এই দুই দৃষ্টিতেই সাংখ্যে ও বৌদ্ধে (সব বৌদ্ধে নহে) এস্থলে ভেদ। যদি বৌদ্ধকে বলা যায় যে পিণ্ডে ও ঘটে এক মৃদ্ধর্ম্ম অন্বিত থাকে দেখা যায়,তবে এই সহজ প্রজ্ঞার দৃষ্টিকে বৌদ্ধ এইরূপে খণ্ডিত করার চেষ্টা করেন, যথা—"মৃদ্বিকারাদয়ো ভেদা নৈকজাত্যান্বিতা স্তথা। সিদ্ধা নৈকনিমিত্তাশ্চ মৃৎপিণ্ডাদেবি্ভেদতঃ" (তত্ত্ব সং ৪৩) অর্থাৎ মৃৎসুবর্ণ আদির বিকারে সেই বিকৃতভাব সকল একজাত্যন্বিত নহে আর

তাহারা এক নিমিত্তকও (নিমিত্ত অর্থে কারণ মাত্র) নহে। কারণ, মৃত্তিকা সুবর্ণাদি অবয়বী দ্রব্য, তাহাদের এক এক অবয়ব হইতে বা এক এক মৃৎপিণ্ড সুবর্ণ পিণ্ড আদি হইতে এক এক ঘট কুণ্ডল আদি উৎপন্ন হয়। ভাবার্থ এই যে "মাটীই ঘট হয়" এই কথা ঠিক নহে কারণ সব মাটী সব ঘটে থাকে না। বলা বাহুল্য ইহা অতি স্থূলগোছের ন্যায়ের ফক্কিকা মাত্র। কারণের কতক ধর্ম্ম যে কার্য্যে একরূপ থাকে বা অন্বিত থাকে এই সাংখ্যীয় দৃষ্টি ইহার দ্বারা খণ্ডিত হয় না *। সুবর্ণপিণ্ডে ও সুবর্ণ বলয়ে যে ভারবত্তা সৌবর্ণ্য প্রভৃতি এক থাকে কেবল আকারধর্ম্মের ভেদ হয় এই সহজ প্রজ্ঞার সাংখ্যীয় (বৈজ্ঞানিক আদিরও) দৃষ্টি বৌদ্ধেরা ঐরূপ ন্যায়ের ফাঁকির দ্বারা খণ্ডিত করার চেষ্টা করিয়াছেন। সাংখ্যেরা (আধুনিক বৈজ্ঞানিক আদিরাও সকলে) বলেন জগৎ ক্রিয়াশীল সুতরাং ক্ষণে ক্ষণে ভঙ্গ হইতেছে। অতএব এবিষয়ে মাধ্যমিকাদি বৌদ্ধেরা প্রাচীন সাংখ্যের কথাই বলেন। সাংখ্য আরও বলেন কারণ রূপ কতকগুলি ধর্ম্ম কার্য্যে এক থাকে। কতক ধর্ম্ম যে নূতন উৎপন্ন বা ব্যক্ত হয় তাহাই কার্য্যত্ব। মৌলিক ধর্ম্ম যাহারা এক থাকে তাহারা প্রকাশ, ক্রিয়া ও স্থিতি। বৌদ্ধেরা বলেন তাহা শূন্য। সাংখ্যেরা বলেন তাহা প্রকাশ, ক্রিয়া ও স্থিতির সাম্য বা অব্যক্ত অবস্থা। কিঞ্চ সাংখ্যেরা বলেন ভাব হইতে ভাব হয় এবং ভাব ভাবেই লীন হয়। বৌদ্ধ বলেন "শূন্যেভ্য এব শূন্যা ধর্ম্মাঃ প্রভবন্তি ধর্ম্মেভ্যঃ" "নহি উৎপদ্যমানঃ সৎস্বরূপেণ কুতশ্চিদাগচ্ছতি, নিরুধ্যমানো বা কুতশ্চিৎ সন্নিচয়ং গচ্ছতি" (প্রজ্ঞাকরমতি) অর্থাৎ শূন্য ধর্ম্মসকল হইতে শূন্যধর্ম্ম সকলই উৎপন্ন হয়। সদ্রূপে উৎপদ্যমান

* বৌদ্ধদের ভদন্ত ধর্ম্মত্রাতের মতে—"যথা সুবর্ণ দ্রব্যস্য কটককেয়ূর কুণ্ডলাদ্যভিধান নিমিত্তস্য গুণস্যান্যথাত্বং ন সুবর্ণস্য।" ইহা ঠিক সাংখ্যীয় ও সহজ প্রজ্ঞার দৃষ্টি। মধ্যমকেরা ইহা উক্তপ্রকারে উড়াইয়া দিতে চাহেন।

কোন বস্তু কোথা হইতে আসে না। এবং নিরুধ্যমান বা নাশ হইলে কোথাও সন্নিচিত হইয়া থাকে না *। এই সব কথার অর্থ যে কিরূপ অসঙ্গত তাহা অধিক না বলিলেও বুঝা যাইবে। কারণের কিছু পরিবর্ত্তন

* মধ্যমকদের এইরূপ অসঙ্গত মত হইলেও প্রাচীন সর্ব্বাস্তিবাদী বৌদ্ধদের এরূপ মত ছিল না। ভদন্ত ধর্ম্মত্রাত (ইনি সংস্কৃত ধর্ম্মপদের সংগৃহীতা) ও ভদন্ত বসুমিত্র (ইঁহারা কনিষ্কের সমসাময়িক) ঠিক সাংখ্যমত গ্রহণ করিয়াছিলেন। সাংখ্যমতে ধর্ম্মসকল ত্রিকালস্থায়ী। অধ্বভেদ বা কল্পিত কালভেদ করিয়া আমরা মনে করি ও বলি যে উহা অতীত ও উহা বর্ত্তমান ও উহা অনাগত। যোগভাষ্যকার বলেন "তত্র ধর্ম্মস্য ধর্ম্মিণি বর্ত্তমানস্য এব অধ্বসু অতীতানাগতবর্ত্তমানেষু ভাবান্যথাত্বং ভবতি ন দ্রব্যান্যথাত্বং।" "যথা পুরুষ একস্যাং স্ত্রিয়াং রক্তো ন শেষাসু বিরক্তো ভবতীতি।" ভদন্ত ধর্ম্মত্রাতের মতে "ধর্ম্মস্যাধ্বসু বর্ত্তমানস্য ভাবান্যথাত্বমেব কেবলং ন দ্রব্যান্যথাত্বং"। ভদন্তঘোষক দৃষ্টান্ত দেন "যথা পুরুষ একস্যাং স্ত্রিয়াং রক্তো ন শেষাসু বিরক্তঃ' ইত্যাদি। যোগ-ভাষ্যকার দৃষ্টান্ত দেন "যথৈকা রেখা শতস্থানে শতং দশস্থানে দশ একা চৈকাস্থানে"। ভদন্ত বসুমিত্র এ বিষয়ে বলেন "যথা মৃদ্‌গুড়িকা একাঙ্কে প্রক্ষিপ্তা একমুচ্যতে শতাঙ্কে শতং সহস্রাঙ্কে সহস্রং"। যোগভাষ্যকারের ন্যায় বুদ্ধদেব নামক বৌদ্ধ গ্রন্থকার বলেন "যথৈকা স্ত্রী মাতা চোচ্যতে দুহিতা চেতি"। এই প্রাচীন বৌদ্ধ লেখকেরা সাংখ্যেরই মত লইয়াছিলেন। পরবর্ত্তী মধ্যমকেরা উহা খণ্ডন করিয়াছেন এবং স্বীকার করিয়াছেন যে উহা সাংখ্যমত। সাংখ্যের ন্যায় উক্ত ভদন্ত সকলের মতে ধর্ম্ম সকল ত্র্যধ্বা; ত্রিকালই তিন অধ্বা। ধর্ম্মসকল বর্ত্তমান হইলেও যখন অর্থক্রিয়াকারী বা অনুভূয়মান (বৌদ্ধভাষায় কারিত্রযুক্ত) হয় তখন বর্ত্তমান বলি, অনুভূতকে অতীত বলি আর অনুভবিষ্যমাণকে অনাগত বলি।

হইয়া কার্য্য হয় এবং "নাশঃ কারণলয়ঃ" এই তথ্য প্রসিদ্ধ এবং নিতান্ত বিকৃত দৃষ্টি না হইলে কেহ ইহার প্রতিষেধে সাহসী হয় না। কার্য্য হইতে কারণে যাইতে যাইতে সাংখ্য মূল কারণ ত্রিগুণে যান। মূল কারণের আর কারণ না পাওয়াতে তাহাকে নিত্য বলেন; যেমন ক্রিয়াস্বভাব রজঃ; ইহার কারণ কি তাহা কেহ কল্পনাও করিতে পারে না। বলিতে হইবে "ক্রিয়া হইতে ক্রিয়া হয়" বা ক্রিয়া বা পরিবর্ত্তন হওয়া বরাবরই আছে। প্রকাশ বা জ্ঞেয়ের জ্ঞাত হওয়া স্বভাবও বরাবর আছে স্থিতিও সেইরূপ। স্বভাব মানে কি তাহাও জানা কর্ত্তব্য। বৌদ্ধ বলেন "যো হি যস্য স্বভাবঃ সকথং কদাচিদপি নিবর্ত্তেত" (প্রজ্ঞাকরমতি) অর্থাৎ যাহা কখন নষ্ট হয় না এরূপ ধর্ম্মই স্বভাব। সাংখ্যমতে "অনুৎপন্নঃ সহোৎপন্নো বা সহভাবী বা ধর্ম্মরূপো ভাব এব স্বভাবঃ" অর্থাৎ যে গুণ কোন ভাবের উৎপাদের সহিত উৎপন্ন এবং নাশে নাশ হয় অথবা যে ধর্ম্ম অনুৎপন্ন বা বরাবর আছে ও থাকিবে তাহাই স্বভাব নামক ধর্ম্ম বা জাতগুণ। এ বিষয়ে উভয় দৃষ্টি প্রায় একরূপ। যেমন শরীরের যাহা স্বভাব বলিবে তাহা শরীরের সহিত উৎপন্ন ও যাবৎ শরীর স্থায়ী ধর্ম্ম। শুদ্ধ ক্রিয়াস্বভাব (রজ) অনুৎপন্ন স্বভাব। অনুৎপন্ন সুতরাং নাশ হয় না বলিয়া নিত্য। (বৌদ্ধমতে "নিত্যং তমাহু র্বিদ্বাংসো যঃ স্বভাবো ন নশ্যতি" সুতরাং তন্মতে আগমাপায়ী ভাব নিঃস্বভাব) ? এইজন্য ত্রিগুণ নিত্য। প্রকাশ, ক্রিয়া ও স্থিতি কবে ছিল না ও থাকিবে না তাহা কেহ দেখাইতে পারিলে তবেই নিত্য ত্রিগুণ দৃষ্টি খণ্ডিত হইবে, নচেৎ নহে।

বৌদ্ধদের যুক্তি—ঘট 'আছে' কিন্তু ভাঙ্গিয়া গেলে তাহা 'নাই' হয়। 'আছে' ও 'নাই' বিরুদ্ধ স্বভাব। বিরুদ্ধ স্বভাব এক বস্তুতে থাকিতে পারে না অতএব ঘট শূন্য। এই ন্যায় এত অসার যে তদ্বিষয়ে অধিক বলা বাহুল্য। 'আছে' ও 'নাই' ইহা কথা মাত্র। ইহারা স্বভাব বা প্রকৃত ধর্ম্ম নহে। প্রধান সম্বন্ধে বৌদ্ধ এক বিরুদ্ধ যুক্তি দেন যে এক বস্তুর তিন

স্বভাব হইতে পারে না, প্রধানের তিন স্বভাব অতএব প্রধান নাই। এক বস্তুর তিন (একাধিক) স্বভাব কেন হইতে পারে না তাহা বৌদ্ধ বলেন না। দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও স্থৌল্য এই তিন স্বভাব ত সকল বাহ্য বস্তুর আছে। তাঁহাদের আর এক যুক্তি—যখন গুণ তিন তখন প্রধান এক হইবে কেন? আপনারা প্রধানকে এক বলেন অতএব প্রধান নাই। অবিনাভাবী তিন গুণকে সাংখ্য প্রধান (শ্রেষ্ঠ কারণ), প্রকৃতি (উপাদান কারণ) বলেন আবার ত্রৈগুণ্যও বলেন সুতরাং ইহা নাম লইয়া ঝগড়া। ত্র্যঙ্গ দ্রব্যকে প্রধান বলা হয় আর সেই অঙ্গ সকল অবিনাভাবী ও কদাপি বিযোজ্য নহে তাই এক বলার বিশেষ হেতু আছে। প্রকাশ স্থিতি ছাড়া ক্রিয়া, ক্রিয়া ছাড়া প্রকাশ স্থিতি, স্থিতি ছাড়া প্রকাশ ক্রিয়া যদি দেখাইতে পার তবেই তিন বলার সার্থকতা হইতে পারে। ফলে ত্রিগুণই প্রকৃতি ইহা সাংখ্যমত, তাহার তিন অঙ্গ দেখিয়া তিন বল বা যা বল তাহাতে সাংখ্যের কিছু ক্ষতি বৃদ্ধি নাই। একজন বলিল "ওখানে মনুষ্য আছে" আর একজন তাহাতে বলিল "মনুষ্য এক এক জন হয়, ওখানে তিনজন আছে : অতএব ওখানে মনুষ্য নাই"। বৌদ্ধদের ন্যায়াভাসও এইরূপ। অথবা একজন বলিল "এই দ্রব্যের পরিমাণ আছে" তাহাতে অন্যে দোষ ধরিল যে লম্বা, চওড়া ও মোটা আছে, পরিমাণ নাই। অবিনাভাবী লম্বা, চওড়া ও মোটার নাম যেমন পরিমাণ সেইরূপ অবিনাভাবী প্রকাশ, ক্রিয়া ও স্থিতির নাম প্রকৃতি বা উপাদান কারণ। এইসব বিষয় অগ্রে বোধিচর্য্যাবতারের বঙ্গানুবাদে সবিশেষ দেখান হইয়াছে বলিয়া এখানে অধিক বলা হইল না।

শূন্যতা প্রমাণের (বৌদ্ধদের) আর এক যুক্তি এইরূপ :—নাগার্জ্জুন বলেন (মাধ্যমিকার ৫ম প্রকরণে) "নাকাশং বিদ্যতে কিঞ্চিৎ পূর্ব্বমাকাশ লক্ষণাৎ। অলক্ষণং প্রসজ্যেত স্যাৎ পূর্ব্বং যদি লক্ষণাৎ॥ অলক্ষণো ন কশ্চিচ্চ ভাবঃ সংবিদ্যতে কচিৎ। অসত্যলক্ষণে ভাবে ক্রমতাং কুহলক্ষণম্॥ না লক্ষণে লক্ষণস্য প্রবৃত্তি ন সলক্ষণে। সলক্ষণালক্ষণাভ্যাং নাপ ন্যত্র

প্রবর্ত্ততে। লক্ষণাসম্প্রবৃত্তৌচ ন লক্ষ্যমুপপদ্যতে। লক্ষ্যস্যানুপপত্তৌচ লক্ষণস্যাপ্যসম্ভবঃ। তস্মান্ন বিদ্যতে লক্ষ্যং লক্ষণং নৈব বিদ্যতে। লক্ষ্যলক্ষণনির্ম্মুক্তো নৈব ভাবোঽপি বিদ্যতে॥ অবিদ্যমানে ভাবে তু কস্যাভাবো ভবিষ্যতি। ভাবাভাববিধর্ম্মাচ ভাবাভাবমবৈতি কঃ॥" অর্থাৎ আকাশধাতু কিছু নাই। কারণ আকাশের লক্ষণ যে অনাবরণ তাহা আকাশের পূর্ব্বে থাকে না। অতএব পূর্ব্বে আকাশ অলক্ষণ থাকে। কিন্তু লক্ষণশূন্য কিছু বা ভাব পদার্থ কোথাও নাই। তাহা না থাকিলে লক্ষণ কিসে আক্রান্ত হইবে বা লক্ষিত করিবে? কিঞ্চ অলক্ষণে লক্ষণের প্রবৃত্তি হয় না সলক্ষণেও (নিষ্প্রয়োজনত্ব হেতু) তাহা হয় না। আর সলক্ষণ অলক্ষণ এই দুই ছাড়া অন্যত্রও লক্ষণের প্রবৃত্তি হওয়া সম্ভব নহে। লক্ষণ প্রবর্ত্তিত না হইলে লক্ষ্যও উপপন্ন হয় না। লক্ষ্য সিদ্ধ না হইলে লক্ষণও সিদ্ধ হইবে না। অতএব লক্ষ্য ও লক্ষণ দুইই নাই। সুতরাং লক্ষ্য-লক্ষণ না থাকাতে ভাবও নাই। আর ভাব নাই বলিয়া অভাবও নাই; পরঞ্চ ভাবও নাই অভাবও নাই বলিয়া ভাবাভাবের পরীক্ষকও নাই।

এই শেষ বিনিগমনায় সিদ্ধ হইবে যে ভাবাভাবের পরীক্ষক নাগার্জ্জুনও নাই বা ছিলেন না (যুক্তিটী এইরূপ—শুধু ডান পায়ে চলা যায় না ও শুধু বাম পায়েও চলা যায় না, অতএব চলাই যায় না—চলা বলিয়া কিছু নাই। এই জাতীয় আর এক ন্যায়াভাস আছে যথা—যদি কোন দ্রব্য হইতে অবকাশ বা space বাহির করিয়া লওয়া যায় তবে সেই দ্রব্য থাকে না; অতএব দ্রব্য = অবকাশ। সেইরূপ কোন দ্রব্য হইতে যদি সত্তা বাহির করিয়া লওয়া যায় তবে দ্রব্যের সত্তা বা দ্রব্য থাকে না; অতএব দ্রব্য = সত্তামাত্র।

প্রথমে যে major premise করা হইয়াছে—'আকাশের পূর্ব্বে আকাশ লক্ষণ থাকে না' তাহা ভ্রান্তি। 'শব্দগুণক অনাবরণ লক্ষণক আকাশ' এইরূপ মাত্র আকাশের লক্ষণ নহে। সাংখ্যেরা বলেন আকাশ দৃশ্যত্ব-

লক্ষণক বা ত্রিগুণলক্ষণক। তাহা আকাশের পূর্ব্বেও থাকে। তাহারই অবস্থান্তরতামাত্র শব্দলক্ষণক আকাশভূত। ত্রিগুণের পূর্ব্ব নাই সুতরাং তাহারা সদাই সলক্ষণ কখনও অলক্ষণ নহে।

ঐরূপে পঞ্চভূত ও বিজ্ঞান এই ছয় ধাতুকে বৌদ্ধেরা শূন্য (মধ্যমকদের ভাষায় "ভাবও নহে অভাবও নহে") প্রমাণ করিতে প্রয়াস পান।

সমস্ত আর্যসম্প্রদায়েরা জগতের স্রষ্টা, পাতা ঈশ্বর স্বীকার করেন। বৌদ্ধেরা পাতা মহাপুরুষ স্বীকার করিলেও স্রষ্টা স্বীকার করেন না। এ বিষয়ে তাঁহাদের মত সংক্ষেপে পরীক্ষিত হইতেছে। বৌদ্ধেরা ইন্দ্র, বৈশ্রবণ, ব্রহ্মা, মহাব্রহ্মা, ঈশ্বর বা শিব, কুমার (কার্ত্তিকেয়) প্রভৃতি স্বীকার করেন। ললিত বিস্তরে আছে বুদ্ধ স্বয়ং নারায়ণ। তদ্ব্যতীত মহা-যানেরা আদিবুদ্ধ, অবলোকিতেশ্বর আদি এবং সকলেই সম্বর্ত্ত বা জগতের উদ্ভব এবং বিবর্ত্ত বা লয় স্বীকার করেন। ইন্দ্রাদি দেবতারা গোঁড়া বৌদ্ধ (সেইরূপ জৈনদের ইন্দ্রাদি গোঁড়া জৈন, হিন্দুদের ইন্দ্রাদি হিন্দু) এবং তাঁহারা বৌদ্ধদের সহায়তা করেন। যম, যমদূত,নরক, স্বর্গ সব তন্মতে প্রায় হিন্দুদের ন্যায়। জগতের কর্ত্তা বা স্রষ্টা তন্মতে স্বীকৃত নহে। ঈশ্বরবাদের বিরুদ্ধে বৌদ্ধেরা যে সব যুক্তি দেন তাঁহাতে সাধারণ ঈশ্বরবাদ খণ্ডিত হইলেও সর্ব্ববিৎ সর্ব্বকর্ত্তা অথবা অনাদিমুক্ত সাংখ্যযোগের ঈশ্বর খণ্ডিত হয় না। মহাযানদের আদিবুদ্ধ যোগের অনাদিমুক্ত ঈশ্বরের তুল্য। জগৎ কিরূপে হইয়াছে তদ্বিষয়ে বৌদ্ধেরা বলেন "কর্ম্ম হইতে"। কাহার কর্ম্ম হইতে হইয়াছে ? এতদ্বিষয়ে দুই মত আছে। হীনযানেরা বলেন মনুষ্যের কর্ম্ম হইতেই চন্দ্রসূর্য্যাদি সৃষ্ট হয়। বিশুদ্ধিমার্গে আছে প্রাথমিক পার্থিব সত্ত্বগণ অন্ধকারে অসুবিধা ভোগ করাতে আলোকের 'ছন্দ' (ইচ্ছা) করাতে 'চন্দ' (বা চাঁদ) উৎপন্ন হইল। সূর্য্যও সেইরূপে উৎপন্ন হইল। তাহাতে 'সুরিয়' বা শৌর্য্য হওয়ায় উহার নাম সুরিয় রাখা হইল। বলা বাহুল্য যে ইহা বালকোচিত মত। মহাযানদের একমত—দেবতাদের

কর্ম্ম হইতে লোক উৎপন্ন হইয়াছে। সাংখ্যাদি আর্ষ শাস্ত্রের প্রকৃত মত হিরণ্যগর্ভ বা ব্রহ্মা বা অক্ষর ব্রহ্ম পূর্ব্বসিদ্ধ মহাপুরুষ তাঁহার ঐশসংস্কার-মূলক সঙ্কল্প (প্রকৃতি-বশিত্ব নামক সিদ্ধি) হইতে সৃষ্ট জগতের মূল সত্তা ব্যক্ত হয়, পরে দেব মনুষ্যাদিরা স্বসংস্কারানুসারে সেই মূল সত্তাকে আশ্রয় করিয়া ব্যক্ততা লাভ করে। ফলে ঐশ সৃষ্টি ও জৈবসৃষ্টি সমস্তই কর্ম্মজ। স্রষ্টা একজন ব্রহ্মা নিত্য নহেন কিন্তু ব্রহ্মারা নির্ব্বাণমুক্ত হইয়া যান। পরে পরে অন্য ঐরূপ সিদ্ধ স্রষ্টা হন।

বৌদ্ধদেরকেও কার্য্যত উহাই স্বীকার করিতে হয়। শান্তরক্ষিত বলেন "বুদ্ধিমৎ পূর্ব্বকত্বং হি সামান্যেন যদীষ্যতে। তত্র নৈব বিবাদো নো বৈশ্ব-রূপ্যং হি কর্ম্মজম্। নিত্যৈক বুদ্ধিপূর্ব্বত্বসাধনে সাধ্যশূন্যতা।" (তত্ত্ব সং ৮০।৮১)। অর্থাৎ যদি আপনারা বলেন যে বুদ্ধিপূর্ব্বক (দেব মনুষ্যের বুদ্ধি পূর্ব্বক) সৃষ্টি হয় তবে এই সামান্যবাদে আমাদের বিবাদ নাই, কারণ আমাদের মতেও এইযে বৈশ্বরূপ্য তাহা কর্ম্মজ (সুতরাং বুদ্ধিমৎ পূর্ব্ব)। নিত্য একবুদ্ধিপূর্ব্বক জগৎ সৃষ্ট হয় ইহা ন্যায়সাধ্য নহে। আর্ষ সম্প্রদায়ের অনেকেরই এই মত। একজন নিত্য স্রষ্টা অনেকেরই সম্মত নহে।

ইহা প্রকৃত প্রস্তাবে সাংখ্যীয় বা আর্ষমত। দেবতাদের মধ্যে যিনি মহাদেব তাঁহার কর্ম্মে (কর্ম্ম ইচ্ছামূলক) লোক উদ্ভূত হইলে সাংখ্যমতেই বৌদ্ধকে আসিতে হয়। সাংখ্যমতে পূর্ব্বসিদ্ধ হিরণ্যগর্ভ বা ব্রহ্মা সর্ব্ববিৎ সর্ব্বকর্ত্তা। বৌদ্ধেরা এবিষয়ে আপত্তি করেন যে তিনি সর্ব্ববিদ্ হইলে প্রচলিত বৌদ্ধভাষায় (মধ্যমক ভাষায়, বোধ হয়) মোক্ষবিদ্যার উপদেশ করিতেন তাহা না করাতে তিনি সর্ব্ববিৎ নহেন। বলা বাহুল্য ইহা দার্শ-নিক হিসাবে অহংমুখতা। কারণ, সর্ব্ব সম্প্রদায়েই নিজেদের মতকে সত্য বলেন এবং ঈশ্বরকে তাহার অনুমোদক বলেন সুতরাং এরূপ যুক্তির বিশেষত্ব নাই। সমন্তভদ্র, অজিত বা মৈত্রেয় নাথ, মঞ্জুঘোষ, অবলোকি-

তেশ্বর এমনকি গৌতমবুদ্ধও, * যাঁহারা উপরে থাকিয়া বৌদ্ধদের পালন করিতেছেন, তাঁহাদের কেহ যদি বৌদ্ধদের অগণ্যমতের সামঞ্জস্য করিয়া সর্ব্বগ্রাহ্য এক সত্যমত স্থির করিয়া দিতেন তবে উক্তমত সার্থক হইত।

ফলতঃ অস্মদাদি সর্ব্বমনের উপর কার্য্যকারি এক মহামন আছে (যাঁহার এই মহামন তিনিই স্রষ্টা পাতা) এই যে উপনিষদ্‌-সাংখ্যাদিশাস্ত্র-স্থিত মত তাহা লোক সৃষ্টি বিষয়ে সর্ব্বাপেক্ষা যুক্তিসঙ্গত বাদ। আর সেই

* হীনযানদের মতে গৌতম বুদ্ধের কিছুই নাই (এক বৌদ্ধ বলিয়াছিলেন কেবল তাঁহার অস্থিমাত্র আছে)। মহাযানদের অনেকের মতে বুদ্ধ এখন স্বর্গলোক বিশেষে (সুখাবতীতে) আছেন এবং যতদিন না সর্ব্বপ্রাণী নির্ব্বাণপ্রাপ্ত হয় ততদিন থাকিবেন। কারণ মহাযানমতে অপরকে ফেলিয়া নিজে নির্ব্বাণ লওয়া স্বার্থপরতা। ইহা অবশ্য পরার্থপরতাবাদের বা altruism এর অপব্যবহার। কারণ, নির্ব্বাণে সুখ-দুঃখ, স্বার্থপরার্থ আদি নাই। স্কন্ধ সকলে মহাবৈরাগ্য করিয়া নিরোধ করিলে যে আদর্শ দেখান হয়, তাহা অপেক্ষা স্কন্ধসকল লইয়া থাকা যে হীন আদর্শ তাহা হীনযানেরা বলিতে পারেন। বিশেষতঃ এই বাদে কোন বুদ্ধই নির্ব্বাণপ্রাপ্ত হন নাই ও হবেন না এইরূপ আসিয়া পড়িবে। কারণ অনাদিকাল হইতে অনন্তকাল পর্য্যন্ত সংসৃতি আছে ও থাকিবে সুতরাং বুদ্ধেরা কখনও নির্ব্বাণ পান নাই ও পাইবেন না। এইরূপে এই বাদ অসম্ভব altrusim মাত্র বা অসম্ভব পরার্থপরতামাত্র ও কেবল প্রচ্ছন্ন স্কন্ধানুরাগ মাত্র। কথায়ও বলে "সর্ব্বমত্যন্তগর্হিতম্"। সুখাবতীতে (নরকে নারকীরা থাকিলেও) স্বর্গ সুখভোগ করা অপেক্ষা স্কন্ধসকলে মহানির্ব্বেদ করিয়া ত্যাগ করা যে উন্নততর আদর্শ তাহা মহাযানদের ধারণায় আসে নাই। •অনেক রোগী আছে বলিয়া দয়ালু ব্যক্তির রুগ্ন হওয়া উচিত কি ?

ঈশ্বরের বা ব্রহ্মের প্রণিধান করিলে যে ব্রহ্মবৎ সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান্ হওয়া যায় এই ঋষিমত (ব্রহ্মৈব মন্ ব্রহ্মাপ্যেতি) অনবদ্য দার্শনিক মত। বুদ্ধও 'এই ব্রহ্মাণ্ড আমি বা আমার' বলিয়া গিয়াছেন, তাহা 'অহং ব্রহ্মাস্মি' ছাড়া আর কিছু নহে (বৌদ্ধেরা অন্য অর্থ করিলেও)।

অতঃপর 'ভাব' 'শূন্য' 'ধর্ম্ম' প্রভৃতি কয়েকটি শব্দের অর্থ বৌদ্ধ ও আর্য দৃষ্টিতে বিচার্য্য, কারণ তাহার উপর উভয় মতের ঐক্য ও অনৈক্য অনেকটা নির্ভর করে।

ভাব শব্দের অর্থ সৎ বা যাহা আছে। বৌদ্ধেরা উহার অন্য অর্থ করেন যথা, "হেতু প্রত্যয়ং প্রতীত্য ভবন্তি স্বরূপং লভন্ত ইতি ভাবাঃ। ন পুনঃ পারমার্থিকং রূপং নিজমেষামস্তি। ইতি ভাবশব্দেন নিঃ স্বভাবতাভিধানং প্রতীয়তে"। যাহা কারণ হইতে হয় তাহাই ভাব। এইরূপ লক্ষণে নির্ব্বাণ বা আত্মা অভাব হইবে। অতএব শব্দার্থ লইয়াই গোল। শূন্যও ঐরূপ।

কোনও দ্রব্যকে 'অস্তিও বলিব না' 'নাস্তিও বলিব না' মাধ্যমিকদের এই মতের মূল বুদ্ধের তথাকথিত উক্তি যে—আত্মা শাশ্বত ইহা বক্তব্য নহে ও তাহার উচ্ছেদ হয় এরূপও বক্তব্য নহে। ইহা নাগার্জ্জুনের মত। এই শাশ্বত ও উচ্ছেদবাদের মূলে ব্রহ্মজালসূত্র আছে। তথায় আছে যে কোন কোনও বাদীরা শীলবান্ হইয়া সমাধিসিদ্ধ হওত পূর্ব্বজন্মের জ্ঞানলাভ করিয়া শত শত সহস্র সহস্র পূর্ব্বজন্ম দেখিয়া মনে করেন যে এই আত্মভাব শাশ্বত। আবার কেহ বলেন মৃত্যুর পর আত্মভাব উচ্ছিন্ন হইয়া যায়। এই দুই বাদই ভ্রান্তি, সাংখ্যেরও অবিকল ইহা সম্মত। ইহা স্পষ্টই সাধারণ আত্মভাবের কথা। কিন্তু বৌদ্ধেরা সাধারণ আত্মভাবের যাহা মূল সেই সাংখ্যের প্রকৃত আত্মাকেও এরূপ বলিতে চান, যদি চ ব্রহ্মজালের কথায় উহা আসে না। আর মধ্যমকেরা সর্ব্ব পদার্থ সম্বন্ধেই ঐরূপ বলিতে চান (ব্রহ্মজালের কথাকে মূল করিয়া)। শাশ্বত শব্দের

অর্থ করেন 'অস্তি', এবং 'উচ্ছেদ' অর্থে করেন 'নাস্তি' তাহা করিয়া কোন দ্রব্যকে 'অস্তি' বা 'নাস্তি' না বলাই "তত্ত্বং মাধ্যমিকা বিদুঃ"।

বৌদ্ধদের ধর্ম্মশব্দের অর্থও বুঝা উচিত। ধর্ম্ম অর্থে যাহা ধারণ করে। তাহাতে যাহা স্বভাব ও লক্ষণ ধারণ করে তাহা ধর্ম্ম। আর যাহা দুর্গতি হইতে প্রাণীকে ধারণ করে সেই পুণ্য কর্ম্মও ধর্ম্ম (স্যংখ্যেরাও ইহা বলেন, যথা, 'দুর্গতিপ্রপতৎ প্রাণিধারণাৎ ধর্ম্ম উচ্যতে"—মাঠর বৃত্তি)। প্রথম ধর্ম্মশব্দের অর্থ গুণ। যেমন, জলের ধর্ম্ম, অগ্নির ধর্ম্ম ইত্যাদি। বৌদ্ধেরা স্বকীয় দৃষ্টি অনুসারে বলেন 'ধর্ম্মধাতু নিঃসত্ব নির্জ্জীব'। অর্থাৎ ধর্ম্ম phenomenon মাত্র উহাদের পশ্চাতে কিছু noumenon নাই। বৌদ্ধমতে ক্ষণে ক্ষণে ধর্ম্মসকল উদিত হইয়া নিরুদ্ধ বা লীন হইতেছে।

সাংখ্যপ্রমুখ আর্ষ সম্প্রদায় সকলের মতে—"যোগ্যতাবচ্ছিন্ন শক্তির নাম ধর্ম্ম"। ফলত উভয় লক্ষণ একই। অর্থাৎ যাহার দ্বারা দ্রব্যকে জানি সেই জ্ঞাতগুণই ধর্ম্ম। কিন্তু সাংখ্যীয় দৃষ্টিতে জ্ঞায়মান ধর্ম্মের পশ্চাতে কতকগুলি (অসংখ্য) এরূপ ধর্ম্ম থাকে যাহারা সাক্ষাৎ বা জ্ঞায়মান নহে কিন্তু পূর্ব্বে জ্ঞায়মান ছিল ও পরে হইবে। তাহাকে সাংখ্য ধর্ম্মী বলেন। বৌদ্ধের ধর্ম্মী নাই সবই ধর্ম্ম। বৌদ্ধেরা বলিতে পারেন ধর্ম্মীও অতীতানাগত ধর্ম্মমাত্র সুতরাং সবই ধর্ম্ম। সাংখ্যেরও তাহা সম্মত। যোগভাষ্যকার বলিয়াছেন ধর্ম্মও ধর্ম্মী হয়, যদি উপাদানরূপে কার্য্যের কারণ হয়। যেমন পরমাণুধর্ম্ম সকল ভূতধর্ম্মের ধর্ম্মী বা কারণ। ঐরূপে মূল কারণে যাইলে ধর্ম্মধর্ম্মি ভেদ থাকে না। ত্রিগুণ এইজন্য ধর্ম্মও নহে এবং তাহাদের কারণভূত ধর্ম্মীও নাই। বৌদ্ধেরা ঐরূপ কারণদৃষ্টি গ্রহণ না করিয়া সমস্তকেই ধর্ম্ম বলেন আর ধর্ম্মের পৃষ্ঠকে শূন্য বলেন। সাংখ্যেরা উহাকে অব্যক্ত ত্রিগুণ বলেন। শূন্য বলিলেও বৌদ্ধদেরকে ঐ শূন্য যে 'নাস্তি' নহে তাহা বলিতে হয় (নাগার্জ্জুনের পূর্ব্বোদ্ধৃত বচন দ্রষ্টব্য)। শূন্যের সাধারণ অর্থ ও বৌদ্ধদের পারিভাষিক অর্থ লইয়াই সুতরাং গোল।

পরিশেষে সাধন সম্বন্ধে বক্তব্য। সাংখ্য ও বৌদ্ধ উভয় পক্ষের সাধনেই চিত্তবৃত্তির নিরোধস্বরূপ যোগই মোক্ষের উপায়। উভয় মতেই ধ্যানের পরিপক্কাবস্থা সমাধি এবং সমাধিজাত প্রজ্ঞাই মোক্ষের কারণ। বৌদ্ধ-বিশেষ বলেন সমস্ত শূন্য জানাই সেই প্রজ্ঞা, আর সাংখ্য বলেন পুরুষ ও প্রকৃতির বিবেকই সেই প্রজ্ঞা। উভয় দৃষ্টিতে ভেদ প্রতীত হইলেও ফলত বৌদ্ধ সাংখ্যের কথাই বলেন। কারণ সাংখ্যের সাধন—নমে নাহং নাস্মি অর্থাৎ বিষয়, অহঙ্কার ও অস্মিমাত্র মহান্ (উপনিষদের—অর্থ, জ্ঞানাত্মা ও মহান্ আত্মা) এই তিনই পুরুষ নহে, সুতরাং ত্যাজ্য ; এবং ইহাদের ত্যাগ সিদ্ধিই সাংখ্যযোগের নির্ব্বাণ মোক্ষ। বৌদ্ধেরা বলেন "শূন্যমাধ্যাত্মিকং পশ্যেৎ পশ্যেৎ শূন্যং বহির্গতং।" একথার কি অর্থ হইতে পারে ? এক হইতে পারে শূন্য নামক দ্রষ্টব্য দ্রব্যকে ভিতরে বাহিরে দেখিবে। শূন্য যদি দ্রষ্টব্য না হয় তবে উহার অর্থ হইবে ভিতরে বাহিরে কিছু দেখিও না। উহাও কার্য্যত "নমে নাহং নাস্মি" সাধন। বৌদ্ধেরা বলেন নির্ব্বাণে শূন্য থাকে বা শূন্যরূপে থাকে। ইহাতে দুই অর্থ হইতে পারে। প্রথম কিছু থাকে না, কারণ শূন্য থাকে উহার সাধারণ অর্থ ঐরূপ। আর দ্বিতীয় অর্থ নাগার্জ্জুনের মতে যে "শূন্যতা চ ন চোচ্ছেদঃ" আছে এবং যাহাকে 'অস্তি বা নাস্তি বলা যায় না তাহাই শূন্য' এরূপ আছে, তাহাতে ফলতঃ কি অর্থ হয় ? নির্ব্বাণের সময় কিছু থাকে বলিব না, কিছু থাকে না তাহাও বলিব না একথার বোধ্য অর্থ কি হইতে পারে ? কিছু ত বলিতে হইবে নচেৎ না বলাই দর্শন হয়। বলিলে বলিতে হইবে 'দৃশ্য ধর্ম্মশূন্য' দ্রব্য থাকে। তাহাই সাংখ্যযোগের ত্রিগুণাতীত পুরুষ। সুতরাং বৌদ্ধকে কিছু বলিলে উহাই বলিতে হইবে। তাহাতে বৌদ্ধের যে ক্ষতি নাই তাহা তাঁহারাই বলেন 'চৈতন্যে চাত্মশব্দস্য নিবেশেঽপি ন নঃ ক্ষতিঃ' (শান্তরক্ষিত)।

সংসৃতির কারণকার্য্য-পরম্পরা বৌদ্ধেরা প্রসিদ্ধ প্রতীত্য-সমুৎপাদ প্রণালীর দ্বারা দেখান। তাহা যথা (আর্য্যশালিস্তম্বসূত্রে)—'অবিদ্যা-

প্রত্যয়া সংস্কারাঃ' অর্থাৎ অবিদ্যা হইলে বা অবিদ্যারূপহেতুতে সংস্কার, সংস্কার হইলে বিজ্ঞান,বিজ্ঞান হইলে নাম (সংজ্ঞাদি অরূপ স্কন্ধ) ও রূপ বা শব্দাদিরূপস্কন্ধ, নামরূপ হইলে ছয় আয়তন বা মন ও পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, ষড়ায়তন হইলে স্পর্শ বা ইন্দ্রিয়জ্ঞান, স্পর্শ হইলে বেদনা বা সুখদুঃখ, বেদনা হইলে তৃষ্ণা, তৃষ্ণা হইলে উপাদান বা তৃষ্ণার বিপুলতা, উপাদান হইলে ভব বা জন্মহেতু কর্ম্ম, ভব হইলে জাতি বা জন্ম বা দেহধারণ,জাতি হইলে জরা, মরণ, শোক, পরিদেবন, দুঃখ, দৌর্ম্মনস্য ও উপায়াসা (অন্যান্য দুঃখ)। এইরূপে সংসার ও তজ্জনিত দুঃখ চলিতেছে। অবিদ্যা নিরুদ্ধ হইলে সংস্কার নিরুদ্ধ হয়। সংস্কার নিরুদ্ধ হইলে বিজ্ঞান নিরুদ্ধ হয় ইত্যাদি ক্রমে দুঃখনিবৃত্তিই নির্ব্বাণ। প্রজ্ঞাকরমতি অনেকস্থলে বলিয়াছেন "প্রতীত্যসমুৎপাদস্য চাচিন্ত্যত্বাৎ"। ইহার উদ্দেশ্যও আছে। প্রথমত ঐ পরম্পরা অস্পষ্ট। অবিদ্যা কোন্ স্কন্ধের অন্তর্গত? বলিতে হইবে বিজ্ঞান স্কন্ধের। তাহাতে বিজ্ঞান হইতে সংস্কার ও সংস্কার হইতে বিজ্ঞান এরূপ কথা বলা হয়। সাংখ্যেরা অবিদ্যাকে বিপর্য্যয়জ্ঞানবাসনা বলেন। নাগার্জ্জুনের বৃত্তিকার চন্দ্রকীর্ত্তিও ঠিক ঐরূপ লক্ষণ করেন। তাহাতে স্পষ্ট কথা হয় যে অজ্ঞান হইতে অজ্ঞান সংস্কার, তাহা হইতে পুনঃ অজ্ঞান বৃত্তি হয়। সাংখ্যেরা ইহাই বলেন। প্রত্যয় অর্থে বৌদ্ধেরা কারণ বুঝেন (হেতু অর্থে বৌদ্ধেরা অনেকস্থলে উপাদান কারণ বলেন ও সাংখ্যেরা নিমিত্ত কারণ অর্থে উহা ব্যবহার করেন)। প্রতীত্যসমুৎপাদের কারণ-কার্য্যতাও ঐরূপ অস্পষ্ট। বেদনা হইলে তৃষ্ণাদিক্রমে দুঃখ হয়। দুঃখও কিন্তু বেদনা। বেদনা হইতে রাগ দ্বেষ ও তন্মূলক কর্ম্ম হয় তাহা হইতে পুনঃ কর্ম্মজ দুঃখ হয়। ইহাই ঐ বিষয়ে স্পষ্ট কথা। উপাদান হইতে ভব ও ভব হইতে জাতি কিরূপে হয় তাহাও বুঝার বিষয়। এইসব কারণেই বোধ হয় উহা 'অচিন্ত্য' বলিয়া কথিত হয়। তদপেক্ষা সাংখ্যদের ষড়র সংসারচক্র সুস্পষ্ট ও অতিব্যাপ্তি দোষ হীন। সাংখ্যমতে রাগদ্বেষ হইতে

ধর্ম্মাধর্ম্ম কর্ম্ম (ও তজ্জনিত সংস্কার) হয়, ধর্ম্মাধর্ম্ম হইতে সুখদুঃখ হয়, সুখদুঃখ হইতে পুনঃ রাগদ্বেষ হয়। এইরূপে ষড়র সংসারচক্র আবর্ত্তিত হইতেছে। অবিদ্যা বা মিথ্যাজ্ঞান উহার নেত্রী। বিবেকরূপ বিদ্যার দ্বারা অবিদ্যা নাশ হইলে রাগদ্বেষ, ধর্ম্মাধর্ম্ম ও সুখদুঃখ নিবৃত্ত হইয়া শাশ্বতী শান্তি হয়।

সেই অবস্থায় আর্ষ সম্প্রদায়দের মতে শান্ত (শান্তোপাধিক) আত্মা থাকেন আর বৌদ্ধদের মতে 'শূন্য' বা 'অনাত্মা' থাকে। আর্ষদের লক্ষণে সেই পদ অদৃষ্ট, অব্যবহার্য্য, অচিন্ত্য (চিন্তার নিরোধে তৎপদে স্থিতি হয় বলিয়া), অগ্রাহ্য, অলক্ষণ (দৃশ্যলক্ষণহীন ; নচেৎ ইহাও তাহার লক্ষণ), অব্যপদেশ্য, একাত্মপ্রত্যয়সার, প্রপঞ্চোপশম, শান্ত, শিব, অদ্বৈত, আত্মা (মাণ্ডুক্য)। নাগার্জ্জুনও মধ্যমক কারিকায় সেই পদকে বলিয়াছেন "প্রপঞ্চোপশমং শিবং"। অদৃষ্টাদি বিশেষণও বৌদ্ধদের অনভীষ্ট হইবে না। কেবল "স আত্মা স বিজ্ঞেয়ঃ" এই উপনিষদ্বাক্য তাঁহাদের অনভিমত হইবে। তৎপরিবর্ত্তে তাঁহারা "স অনাত্মা স বিজ্ঞেয়ঃ" এইরূপ বলিবেন। কার্য্যত কিন্তু ঐ ঋষিবাক্যই যে বলা হইবে তাহা পূর্ব্বে দেখান হইয়াছে। সমাধিজ প্রজ্ঞার ও পরবৈরাগ্যের দ্বারাই ঐ পদ লভ্য, তাহাতে এবং অহিংসাদি শীল ও আসনাদি সমাধ্যঙ্গ সাধন-বিষয়ে বৌদ্ধ সম্যক্ সাংখ্যের অনুবর্ত্তী। তাঁহারা নিজেরাই উহা স্বীকার করেন। সাধন-বিষয় অনেক প্রপঞ্চিত করিলেও তদ্বিষয়ে বৌদ্ধেরা যোগশাস্ত্রের বহির্ভূত নূতন কিছু বলেন নাই, বলারও কিছু নাই।

৩। ভূমিকা (শূন্যবাদ এবং বৌদ্ধদর্শন ও আত্মা)।

(১৩১৩ সালের হিন্দু পত্রিকায় প্রকাশিত)

বৌদ্ধ দর্শনের 'শূন্য' শব্দের অর্থ অভাবমাত্র বুঝিলে নিতান্তই ভুল বুঝা হয়। মাধ্যমিকায় উদ্ধৃত আছে "তথা অস্তীতি কাশ্যপ অয়মেকোঽন্তঃ নাস্তীতি কাশ্যপ অয়মেকোঽন্তঃ যদেতদ্দ্বয়োরন্তয়োর্মধ্যং তদবাচ্যমনিদর্শনম্ অপ্রতিষ্ঠমনাভাসমনিকেতম্ অবিজ্ঞপ্তিকমিদমুচ্যতে কাশ্যপ" অর্থাৎ 'অস্তি' এক অন্ত এবং 'নাস্তি' এক অন্ত,—এই দুই অন্তের মধ্যে যাহা তাহাকে অবাচ্য, অনিদর্শন, অপ্রতিষ্ঠ, অনাভাস, অনিকেত, অবিজ্ঞপ্তিক বলা যায়। ('অস্তি'ও 'নাস্তি'র মধ্যম পদার্থ নামক শূন্য ধরায় এই বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের নাম মাধ্যমিক হইয়াছে)।

অন্যত্র যথা 'ন চাভাবোঽপি নির্ব্বাণম্ কুত এবাস্য ভাবতা। ভাবাভাব-পরামর্শক্ষয়ঃ নির্ব্বাণমুচ্যতে" "(মাধ্যমিকা ২৫ অঃ)। অতএব নির্ব্বাণ বা শূন্যতায় স্থিতি ভাবও নহে অভাবও নহে, বলা হইল। যদিও এতাদৃশ লক্ষণ ন্যায়সঙ্গত ও বোধ্য নহে, তথাপি 'শূন্য' যে অত্যন্তাভাবমাত্র নহে, তাহা উহা হইতে জানা গেল। 'শূন্যতায়াং কৌশিক তিষ্ঠতা বোধিসত্ত্বেন' এই প্রজ্ঞাপারমিতার বাক্যেও যখন শূন্যতায় স্থিতি বলা হইল তখন শূন্য-তাকে স্থিত বা সৎ পদার্থই বলা হইল।

আর্য দার্শনিকেরাও প্রকৃতিকে ঐরূপ বিশেষণে বিশেষিত করেন। যথা 'যত্তন্নিঃসত্তাসত্তং নিঃসদসৎ নিরসৎ অব্যক্তম্' (যোগভাষ্য) ইহাতে সত্তা (অর্থক্রিয়াকারিত্ব) ও অসত্তা, সৎ (ব্যক্ত) ও অসৎ একত্র উক্ত হইলেও উহা অর্থবিশেষে উক্ত হওয়াতে সম্পূর্ণ বোধ্য হইয়াছে।

এ বিষয় আরও বিস্তার করিয়া দেখা যাউক। কোন বিষয় আমরা বলিতে গেলে পদ বা বাক্যের দ্বারা বলি, অতএব সমস্ত বক্তব্য বিষয়ই পদার্থ। 'অস্তি' ও 'নাস্তি' ক্রিয়ার যোগে পদার্থ দ্বিবিধ—ভাব পদার্থ ও অভাব পদার্থ। যাহা আছে তাহা ভাব, যাহা নাই তাহা অভাব, ইহা

ছাড়া আর তৃতীয় প্রকার পদার্থ হইতে পারে না, কারণ তাদৃশ পদার্থ আছে বলিলেই তাহাকে 'ভাব' বলা হইবে। কোন পদার্থের লক্ষণ করিতে কি কি নিয়ম অনুসরণীয় তাহা নিম্নে প্রদর্শিত হইতেছে—

(১) অভাব পদার্থের লক্ষণ করিতে হইলে যাহার অভাব তাহার অর্থাৎ প্রতিযোগী ভাবার্থ-পদের সহিত নিষেধার্থপদের যোগ করিতে হয়, যথা—অন্তের অভাব—অনন্ত, আত্মার অভাব—অনাত্মা।

(২) ভাবপদার্থের লক্ষণ করিতে হইলে কেবল নিষেধার্থপদের দ্বারা হয় না, ভাবার্থপদেরও যোগ থাকা চাই, যথা—বায়ুশূন্য, আলোকশূন্য স্থান। শুদ্ধ 'বায়ুশূন্য' 'আলোকশূন্য' ইত্যাদি অসংখ্য নিষেধার্থ পদ বলিলেও কখনও কোন ভাবপদার্থ লক্ষিত হয় না।

(৩) লক্ষণ করিতে যাইয়া 'অবাচ্য' 'অনভিলপ্য' প্রভৃতি পদ উল্লেখ করা কেবল বালকতা মাত্র। 'অবাচ্য' সম্বন্ধে চুপ করিয়া থাকাই উচিত। নচেৎ কোন কোন বৌদ্ধ গ্রন্থকারের ন্যায় সহস্র সহস্র বাক্যের দ্বারা লক্ষণ ও বিবরণ করিতে করিতে মাঝে মাঝে 'অবাচ্য' 'অনভিলপ্য' প্রভৃতি পদ প্রয়োগ করা ন্যায়প্রবণ মেধার পরিচায়ক নহে।

(৪) শক্তিরূপে স্থিতিকে (potential state) 'অব্যক্ত' পদের দ্বারা লক্ষিত করা ন্যায়সঙ্গত। অনুমানের দ্বারা শক্তির অস্তিত্বনিশ্চয় হইলেও তাহা কিরূপে আছে তাহা সাক্ষাৎকারযোগ্য নহে বলিয়া তাহা অব্যক্ত অর্থাৎ স্ফুট ধারণাবাচক পদের দ্বারা বচনীয় নহে। তাহার অবস্থিতির প্রকার ধারণাযোগ্য না হইলেও তাহার সত্তা অনির্ব্বাচ্য নহে। তাহা অনুমান প্রমাণের বিষয় বলিয়া 'অস্তি'-পদের দ্বারা বাচ্য হয়।

('যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ' ইত্যাদি শ্রুতির অর্থে কোন কোন অজ্ঞলোক মনে করেন যে 'পরব্রহ্ম সম্বন্ধে কিছু বলাও যায় না, কিছু জানাও যায় না'। বস্তুত উহার অর্থ বাক্য ও মন নিবৃত্ত হইলে তবে পরব্রহ্মে স্থিতি হয়। সমগ্র সাধনের তাহাই উদ্দেশ্য)।

(৫) শুদ্ধ 'অস্তি' বা 'নাস্তি' বলিলে কোনও পদার্থের লক্ষণ করা হয় না। তাহাতে কেবল লক্ষিত পদার্থের সত্তা আছে কি না তাহাই বলা হয়। 'ঘটঃ অস্তি' বলিলে ঘট লক্ষিত হয় না। লক্ষিত ঘটের (অলক্ষিত হইলে কোনও অনির্দ্দিষ্ট পদার্থের) বিদ্যমানতা আছে বলা হয়।

কতকগুলি ভাবের অস্তিতা বা নাস্তিতা, অথবা কতকগুলির অস্তিতা ও কতকগুলির নাস্তিতা না বলিলে কোনও পদার্থ লক্ষিত হয় না। অতএব 'শূন্য ভাবও নহে অভাবও নহে' অর্থাৎ অস্তি-নাস্তির সমন্বয় ইত্যাদি লক্ষণ করিতে যাইলে, নিরর্থক প্রলাপবাক্য বলা হয়। যাহা 'অস্তির' সহিত অসমন্বিত তাহাই যখন, 'নাস্তি', তখন উহাদের সমন্বয় করা নিজের উক্তির বিরুদ্ধবাক্য কথনমাত্র। নির্ব্বাণাদি উচ্চবিষয়ক বিচারে বুদ্ধি গুলাইয়া গেলেই লোকে ঐরূপ নিরর্থক অবোধ্য বাক্যের দ্বারা বিচারশান্তির চেষ্টা পায়।

সমস্ত বৌদ্ধেরাই যে ঐরূপে শূন্যের লক্ষণ করেন তাহা নহে। উহার ন্যায়ানুযায়ী লক্ষণও আছে। 'অষ্টসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতায়' শূন্যের এইরূপ লক্ষণ আছে—'ভগবানাহ, শূন্যমিতি দেবপুত্রা অত্র লক্ষণানি স্থাপ্যন্তে। অনিমিত্তমিত্য-প্রণিহিতমিতি দেবপুত্রা অত্র লক্ষণানি স্থাপ্যন্তে। অনভিসংস্কার ইত্যনুৎপাদ ইত্যনিরোধ ইত্যসংক্লেশ ইত্যব্যবদানম্ ইত্যভাব ইতি নির্ব্বাণমিতি ধর্ম্মধাতুরিতি তথতেতি দেবপুত্রা অত্র লক্ষণানি স্থাপ্যন্তে' (দ্বাদশ পরিবর্ত্ত)। অর্থাৎ শূন্য অনিমিত্ত, অপ্রণিহিত, অনভিসংস্কৃত, অনুৎপাদ, অনিরোধ, অসংক্লেশ, অব্যবদান, অভাব, ধর্ম্মধাতু, নির্ব্বাণ ও তথতা। তদ্ব্যতীত অন্যত্র শূন্যকে গম্ভীর অক্ষয় ও অপ্রমেয় বলা হইয়াছে।

উক্ত লক্ষণের মধ্যে 'অভাব' পদটি নিষ্প্রয়োজন বা নিরর্থক। ভাব মাত্রেরই নিষেধ যখন অভাব, তখন অনিমিত্তাদি অভাবার্থ পদসকল বলা বাহুল্যমাত্র; এবং ধর্ম্মধাতু প্রভৃতি ভাবার্থপদ বলাও স্বোক্তিবিরোধ। যাহা হউক উক্তলক্ষণে যদি বুদ্ধদেবের নিজোক্তি অনুসারে নির্ব্বাণের স্থানে

'পরম সুখ' বা শান্তি বসানো যায় ('নির্ব্বাণম্ পরমং সুখম্', ধর্ম্মপদ) তাহা হইলে ঐ 'শূন্য', উপনিষদের আত্মা হইতে বিশেষ বিভিন্ন পদার্থ হয় না। যথা মাণ্ডূক্যে—'নান্তঃপ্রজ্ঞং ন বহিঃপ্রজ্ঞং নোভয়তঃ প্রজ্ঞং ন প্রজ্ঞানঘনং ন প্রজ্ঞং নাপ্রজ্ঞম্ অদৃষ্টম্, অব্যবহার্য্যমগ্রাহ্যম্, অলক্ষণমচিন্ত্যম্ অব্যপদেশ্যম্ একাত্মপ্রত্যয়সারং প্রপঞ্চোপশমং শান্তং শিবমদ্বৈতং।"

বৌদ্ধদের নিষেধবাচক পদসমূহ এবং উপনিষদের নিষেধার্থক পদসমূহ কার্য্যত একই। অর্থাৎ চিত্তবৃত্তির সম্যক্ নিরোধাবস্থা, শান্ত ও নির্ব্বাণ একই পদার্থ; শিব ও পরম সুখ একই বস্তু। বৌদ্ধভাষায় চিত্তের অবিকার বা পরিণামশূন্য অবস্থাই নিরোধাবস্থা, যথা 'অবিকারায়ুষ্মন্ সারিপুত্রাবিকল্পা অচিত্ততা' (অষ্টসা-প্রজ্ঞাপা, ১ বিবর্ত্ত)। বৌদ্ধভাষায় চিত্ত তখন 'নির্ব্বাণ ধাতুতে' স্থিত হয়। সাংখ্যের ভাষায় তাহা অব্যক্তে লীন হয়, বস্তুত উভয়ই এক কথা।

একাত্ম প্রত্যয়সারের অর্থ—কেবল আত্মপ্রত্যয় বা দ্রষ্টৃভাব অবলম্বন করিয়াই আত্মা বোধগম্য। বৌদ্ধদেরও প্রকারান্তরে ইহাই স্বীকার করিতে হয়, তাহাদের চরম সমাধিতে এইরূপ হয় যথা 'নৈবসংজ্ঞা নাসংজ্ঞানন্ত্যায়তনং পশ্যতি শূন্যম্॥ সংজ্ঞাবেদয়িতৃ নিরোধঃ পশ্যতি শূন্যম্॥" (নাগার্জ্জুনীয় ধর্ম্ম-সংগ্রহঃ)। 'পশ্যতি' ক্রিয়ার অবশ্য কর্ত্তা থাকিবে, দ্রষ্টাব্যতীত দর্শনকর্ত্তা আর কে হইতে পারে; (তবে কোন কোন বৌদ্ধমতে দেখা যায় 'ন বিদ্যতে সোঽপি কশ্চিৎ যো ভাবয়তি শূন্যতাম্' অর্থাৎ যে শূন্যতা ভাবনা করে সে কেহ নহে বা অসৎ। ঐরূপ বাক্যের অর্থ সাধারণ মানবের বুঝিবার সামর্থ্য নাই, কেবল মাধ্যমিকেরাই অর্থাৎ buddhist faithful রাই উহার অর্থ বুঝিতে পারেন)। অতএব 'যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ' 'তদা দ্রষ্টুঃ স্বরূপেঽবস্থানম্' এই যোগসূত্রদ্বয়ের অর্থকে বৌদ্ধশাস্ত্র অতিক্রমও করেনা, বিপর্য্যস্তও করে না।

ধর্ম্মধাতু ও তথতা বা ভূত তথতা অর্থে সাধারণ বৌদ্ধেরা যাহা বুঝেন

আর্ষশাস্ত্রের দিক্ হইতে তাহা ঠিক সম্যক্ বিবেক নহে। আর্ষ দার্শনিকেরা উহাকে বিশ্লেষ করিয়া চিৎ ও প্রধান নামে দুই মূল পদার্থ নিশ্চয় করেন। ধর্ম্মধাতু অর্থে ধর্ম্ম বা যাবতীয় প্রতীত্য পদার্থের ধাতু বা চরম অবস্থা। তথতা বা ভূততথতা অর্থেও তাহাই বুঝায়, এই বিক্রিয়মাণ চিত্তের মূলে যে বৃত্তিশূন্য, অবিকার, সৎস্বরূপ, শুদ্ধ, সদাই একরূপ মূলভাব আছে তাহাই ভূততথতা।* কিন্তু সদাই একরূপ, শুদ্ধ, নির্বিকার (unchanging) পদার্থ কোনও কারণান্তর ব্যতিরেকে পরিণামবৃত্তি (phenomena) উৎপাদন করিতে সমর্থ বলিয়া কল্পিতও হইতে পারে না; সাংখ্যের নির্বিকার চিৎ ও বিকারী প্রধানের দ্বারাই উহা সুসঙ্গত হইতে পারে।

ঔপনিষদ.পুরুষ অর্থে আত্মশব্দ বৌদ্ধশাস্ত্রে ব্যবহৃত হয় না বটে কিন্তু আত্মার যাহা অর্থ আমাদের মোক্ষশাস্ত্রকারগণ করেন তাহা বৌদ্ধদের যে অসম্মত নহে তাহা পূর্ব্বেই দেখান হইয়াছে। বৌদ্ধেরা যাহাকে 'সক্কায়দিট্‌ঠি নামক সংযোজন বা বন্ধন বলেন তাহা দেখিয়া অনেকে মনে করেন পুরুষতত্ত্ব বৌদ্ধশাস্ত্রের বিরুদ্ধ বা আত্মার অভাব তাহাদের সম্মত। কিন্তু বস্তুতপক্ষে ইহা ভ্রান্তিমাত্র। আত্মা বা পুরুষ শব্দ বৌদ্ধশাস্ত্রে ব্যবহৃত

* Underlying the phenomena of mind there is an unchanging principle which we call the essence of mind. The fire caused by fagots dies when the fagots are gone but the essence of fire is never destroyed. The essence of mind is the entity without ideas and without phenomena and it is always the same. It pervades all things and is pure and unchanging. It is not untrue nor changeable, so it is also called Bhutatathata. (Outlines of the doctrine of the Mahayana Buddhists of Japan). শিকাগো ধর্ম্ম সভায় পঠিত।

না হইলেও পুরুষের যাহা লক্ষণ প্রায় তাদৃশ (অসংখত ধাতু) বৌদ্ধদেরও চরমগতি। কিন্তু যে 'আত্মাকে' তাঁহারা মিথ্যাদৃষ্টি বলেন তাহার সহিত ঔপনিষদ পুরুষের কোনও সম্পর্ক নাই।

মিলিন্দ পঞ্‌হ্‌ গ্রন্থে রাজা মিলিন্দ নাগসেন ভিক্ষুকে প্রশ্ন করিতেছেন— "নাগসেন কে ? শরীরের ধাতু এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও চিত্তাদিই কি নাগসেন ?" তাহাতে নাগসেন উত্তর করিলেন যে ইহার কোনটাই নাগসেন নহে। তখন রাজা বলিলেন তবে ধর্ম্মিষ্ঠ নাগসেন মিথ্যাবাদী, কারণ তিনি ঐ সমস্তকে নাগসেন বলিয়া পরিচয় দেন। এতদুত্তরে নাগসেন বলিলেন "মহারাজ ! আপনি কিসে করিয়া এখানে আসিয়াছেন ?" রাজা বলিলেন "রথে।" নাগসেন বলিলেন "কৈ রথ ত দেখিতেছি না কেবল চক্র, যুগ, দণ্ড, নেমি ইত্যাদি দেখিতেছি, অতএব আপনি এতবড় রাজা হইয়া মিথ্যা কথা বলিলেন !" তখন মিলিন্দ রাজা অপ্রস্তুত হইয়া বলিলেন যে দণ্ডচক্রাদি রথ নহে, কিন্তু উহার সমষ্টিই রথ। তাহাতে নাগসেন বলিলেন যে সেইরূপ শরীরচিত্তাদি-সমষ্টিই নাগসেন অন্য কিছু নহে।*

*পঞ্চস্কন্ধময় আত্মভাব ক্ষণিক ও প্রবাহমাত্র, পূর্ব্বক্ষণের আত্মভাব প্রত্যয় ও পরক্ষণের আত্মভাব প্রতীত্য। এক ক্ষণিক আত্মভাব হইতে অন্য ক্ষণিক আত্মভাব বা এক দেহ ছাড়িয়া অন্য দেহ ধারণে অর্থাৎ প্রত্যয় হইতে প্রতীত্যে কিছু যায় না। ইহা বুঝাইবার জন্য মিলিন্দ প্রশ্নে দৃষ্টান্ত আছে, তাহা যথা—যেমন একটা প্রদীপ হইতে আর একটা দীপ জ্বালিলে পূর্ব্ব দীপ পরের দীপে যায় না সেইরূপ বর্ত্তমান ক্ষণের আত্মভাবরূপ প্রত্যয় হইতে পরক্ষণের আত্মভাবরূপ প্রতীত্য উৎপন্ন হইলেও তাহা হইতে কিছু আসে না। ইহা সদোষ দৃষ্টান্ত, কারণ তৈলবর্ত্তিযুক্ত অন্য প্রদীপ থাকিলে এবং তাহাতে পূর্ব্ব দীপ হইতে তাপ যাইলে তবেই অন্য প্রদীপ জ্বলে, আত্মভাব সম্বন্ধে তাহার সঙ্গতি নাই।

এইরূপ দেখিয়া অনেকে মনে করেন যে শরীরচিত্তাদি পঞ্চস্কন্ধের অতিরিক্ত 'আত্মা' বৌদ্ধশাস্ত্রে নাই। বস্তুত কিরূপ আত্মা বৌদ্ধশাস্ত্রে অস্বীকৃত তাহা নিম্নোদ্ধৃত সক্কায়দিট্‌ঠির বিবরণ হইতে সম্যক্ বুঝা যাইবে। ধম্মসঙ্গনি নামক অভিধর্ম্ম গ্রন্থে আছে—তত্থ কতমা সক্কায়দিট্‌ঠি। ইধ অস্সুত বা পুথুজ্জনো বা অরিয়ানং অদস্‌স নাবী অরিয়ধম্মস্‌স অকোবিদো অরিয়ধম্মে অবিনীতো ..রূপং অত্ততো সমনুপস্‌সতি রূপবন্তং বা অত্তানং অত্তনি বা রূপং রূপস্মিং বা অত্তানং। অত্তনি বা রূপং রূপস্মিং বা অত্তানং। বেদনং অত্ততো সমনুপস্‌সতি বেদনা-বন্তং বা অত্তানং অত্তনি বা বেদনা বেদনায় বা অত্তানং। সঞ্‌ঞং অত্ততো সমনুপস্‌সতি সঞ্‌ঞাবন্তং বা অত্তানং অত্তনি বা সঞ্‌ঞং সঞ্‌ঞায় বা অত্তানং। সঙ্‌খারা অত্ততো সমনুপস্‌সতি সঙ্‌খারবন্তং বা অত্তানং অত্তনি বা সঙ্‌খারে সঙ্‌খারেসু বা অত্তানং। বিঞ্‌ঞাণং অত্ততো...যা এব রূপা দিট্‌ঠি দিট্‌ঠিগতং দিট্‌ঠিগহনং দিট্‌ঠিকন্তারো, দিট্‌ঠি বিসূকয়িকং দিট্‌ঠিবিপ্‌ফন্দিতং, দিট্‌ঠিসঞ্‌ঞোজনং, গাহো, পটিগ্‌গাহো, অভিনিবেসো পরামাসো, কুমগ্‌গো, মিচ্ছাপথো, মিচ্ছত্তং তীত্থায়তনং বিপরিয়েসগাহো। অয়ং বুচ্চতি সক্কায়দিট্‌ঠি" (নিক্‌খেপ কণ্ডং। হংসাবতী পিটক, ১৫৭ পৃঃ)।

অর্থ—তন্মধ্যে সৎকায়দৃষ্টি বা স্বকায়দৃষ্টি (বুদ্ধঘোষ এই দ্বিবিধ অর্থ করেন) কি ? এই লোকে যে অশ্রুত পৃথগ্‌জনেরা আর্য্যদের বুঝিতে পারে না, বা তাহাদের ধর্ম্ম জানে না, ও সেই ধর্ম্মে বিনীত নহে, তাহারা রূপকে বা ভৌতিক শরীরকে আত্মা-রূপে দেখে ও মনে জানে আত্মারই ইহা রূপ ও আত্মাতেই এই রূপ আছে ও রূপেতেই এই আত্মা আছে। এবং বেদনাকে (সুখ-দুঃখ-উপেক্ষা বোধকে) আত্মা-রূপে দেখে ও মনে করে আত্মারই এই বেদনা ও আত্মাতেই এই বেদনা আছে ও বেদনাতেই আত্মা আছে। এবঞ্চ সংজ্ঞা (শব্দাদি পঞ্চ ইন্দ্রিয়জ প্রাথমিক জ্ঞান বা আলোচন নামক জ্ঞান (বা perception), সংস্কার সকল ও বিজ্ঞান (চিন্তিত বিশেষ

জ্ঞান (বা conception) এই স্কন্ধত্রয়কে আত্মা-রূপে দেখে ও মনে জানে আত্মারই তাহারা ও আত্মাতেই তাহারা এবং সেই সকলেই আত্মা আছে। এইরূপ যে দৃষ্টি (মত), দৃষ্টিতে বিচরণ, দৃষ্টিগহন, দৃষ্টিকান্তার, দৃষ্টির ইন্দ্র-জাল, দৃষ্টির বিস্পন্দন বা সংঘর্ষ, দৃষ্টিসংযোজন বা বন্ধন আর সেই আত্ম-ভাবকে যে ধরা ও নাছাড়া, যে অভিনিবেশ ও সংস্পৃষ্ট ভাব, যে কুমার্গ, মিথ্যা পথ, মিথ্যাত্ব, তীর্থায়তন (শাস্ত্রবিস্তার) ও বিপর্য্যাসগ্রাহ—তাহাই সৎকায় দৃষ্টি বা স্বকায় দৃষ্টি বলিয়া উক্ত হয়।

এই স্বকায়দৃষ্টি বৌদ্ধমতে প্রধান বন্ধন। উপনিষদমতেও ঠিক তাহাই। মনোবুদ্ধিশরীরাদিতে আত্মবুদ্ধিরূপ অবিদ্যাই প্রধান বন্ধন। ফলতঃ বৌদ্ধেরা পঞ্চস্কন্ধের সমষ্টিবিশেষকে 'আত্মা' শব্দের দ্বারা অভিহিত করেন, উপনিষদেরা তাহা করেন না। বৌদ্ধেরা বলেন পঞ্চস্কন্ধ তৃষ্ণাক্ষয়ের দ্বারা নিরুদ্ধ হইলে নির্ব্বাণ হয় (বান বা তৃষ্ণার অভাবই নির্ব্বাণ)। উপনিষ-দেরা বলেন বৈরাগ্যের দ্বারা চিত্তবৃত্তি নিরুদ্ধ হইলে শিবস্বরূপ আত্মায় স্থিতি হয়। নির্ব্বাণেও দুঃখের নিবৃত্তি আত্মসংস্থাতেও দুঃখের নিবৃত্তি। অতএব স্পষ্টই বুঝা গেল, বৌদ্ধেরা যাহাকে নির্ব্বাণ বা 'অসঙ্খতধাতু' নাম দেন, উপনিষদেরা তাদৃশ পদার্থকেই 'আত্মা' নাম দেন। বৌদ্ধেরা বলেন পঞ্চস্কন্ধের চরম অবস্থা 'শূন্য' উপনিষদেরা বলেন চিত্তাদির চরম অবস্থা অব্যক্ত।

বৌদ্ধেরা বলেন 'নির্ব্বাণম্ পরমং সুখং' কিন্তু এই সুখের অনুভাবয়িতা কে? তাহাতে উত্তর দেন অর্হতেরা। আরও বলেন বেদনা স্কন্ধের সুখ পরিচ্ছিন্ন এবং পরম সুখ সম্পূর্ণ পৃথক্ লক্ষণ; কারণ নির্ব্বাণ 'অসঙ্খত ধাতু।' কিন্তু পঞ্চস্কন্ধের শূন্যতাই যখন নির্ব্বাণ তখন পঞ্চস্কন্ধশূন্য পৃথক্ অর্হৎ কি বা কে হইবেন—যিনি নির্ব্বাণসুখের অনুভাবয়িতা? অতএব নির্ব্বাণ সুখকে স্বয়ংবোধরূপ বলা ব্যতীত গত্যন্তর নাই। উপনিষদেরা আত্মাকে তাহাই অর্থাৎ শান্ত বলেন।

মিলিন্দ পঞ্হ গ্রন্থে নির্ব্বাণকে 'একন্ত সুখং' বলা হইয়াছে, আর তাহাকে বিমুক্তিসুখও বলা হয় যথা, 'বিমুত্তিসুখং পটীসম্বেদি' (পটীচ্চ সমুপ্পাদ)। ফলকথা নির্ব্বাণ অর্থে বান বা তৃষ্ণাশূন্যতা, সর্ব্বশূন্যতা নহে।

অভিধম্মথ সঙ্গহে আছে 'পদমচ্চুত মচ্চন্তমসঙ্খতমনুত্তরং। নিব্বাণ-মিতি ভাসন্তি বানমুত্তা মহেসয়ো ॥' অর্থাৎ অচ্যুত, অত্যন্ত, অসঙ্খত, অনুত্তর পদকে বাণমুক্ত মহর্ষিরা নির্ব্বাণ বলেন। এই লক্ষণে অচ্যুতাদি চারিটি প্রতিষেধার্থক পদ আছে বটে কিন্তু পদশব্দ ভাবার্থক। নির্ব্বাণকে যে শূন্য, অনিমিত্ত ও অপ্রণিহিত বলা হইয়াছে সেই সকলের অর্থ উক্ত হইতেছে। রাগ দ্বেষ ও মোহের 'আরম্মণ' বা বিষয় এবং 'সম্পযোগ' বা সাহচর্য্য ও সহভাব-(একুপ্পাদ, এক নিরোধ) শূন্যতাহেতুই নির্ব্বাণ শূন্য। আর রাগাদি প্রণিধি-(উদ্দেশ্য) রহিতত্ব হেতু অপ্রণিহিত। অথবা সংস্কার, সংস্কাররূপ নিমিত্ত ও সংস্কাররূপ প্রণিধিরহিতত্বহেতু নির্ব্বাণ শূন্য, অনিমিত্ত অপ্রণিহিত। ইহা বিশুদ্ধিমার্গে ইন্দ্রিয়সচ্চনিদ্দেশ পরিচ্ছেদে সম্যক্ বিবৃত আছে। অতএব নির্ব্বাণ রাগাদিশূন্য হইলেও 'পরমং সুখং' 'একন্তসুখং' বা 'বিমুত্তিসুখং' ইত্যাদি কিন্তু শূন্য নহে।

বৌদ্ধদের অভিধর্ম্মশাস্ত্রে নির্ব্বাণকে অসঙ্খত ধাতু বলা হয়। অসঙ্খত বা অসংস্কৃত অর্থে ভাগশূন্য বা অসংযোজক অর্থাৎ যাহা বহুভাগের রাশি বা সমষ্টিস্বরূপ নহে। ধাতু অর্থে মূলভাব। বৌদ্ধ দর্শনে ধাতুশব্দের অর্থ বিচার করিলে তাহা শক্তির সমলক্ষণ হয়। তন্মতে ধাতু অষ্টাদশ সংখ্যক যথা, চক্ষু ধাতু, চক্ষু বিজ্ঞান ধাতু, মনোধাতু, মনোবিজ্ঞান ধাতু ইত্যাদি। 'মনোবিঞ্ঞান ধাতু সম্ফস্সজং' অর্থাৎ 'মনোবিজ্ঞানের বা মানস বিষয়ের বিজ্ঞানধাতুর সহিত সংস্পর্শজ জ্ঞান' ইত্যাদি বাক্য হইতে ধাতুপদার্থের দ্বারা চক্ষু-আদির শক্তিরূপ অকল্পনীয় ভাবই লক্ষিত হয়। বিভাবিনী টীকাকার ধাতুর এইরূপ অর্থ করেন যথা—"অত্তনো সভাবং ধারেন্তীতি ধাতুয়ো অথবা যথা সম্ভবং অনেকপকারং সংসার দুঃখং বিদধন্তি" (৭ম

পরিচ্ছেদ)। স্বভাব ধারণ করাও শক্তির কার্য্য, কারণ চক্ষুঃশক্তিই চক্ষুর স্বভাব ধারণ করিয়া রাখে বলা যাইতে পারে। আর ‘ধাতু কুসলতা’ অর্থে শক্তির উৎকর্ষ বলিয়া বৌদ্ধশাস্ত্রে ব্যাখাত হয়।

অট্ঠকথাকার বুদ্ধঘোষ ধাতুর ব্যাখ্যাকালে নিঃসত্ত্ব ও নির্জীবত্ব পুনঃ পুনঃ স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন। নিঃসত্ত্ব অর্থে যে একেবারে নাই—এরূপ নহে তাহা হইলে অসঙ্খত ধাতুর এত বিবরণ দিবার কি প্রয়োজন ছিল, অসৎ পদার্থের উল্লেখ না করিলেই হইত। বৌদ্ধশাস্ত্রে সত্ত্ব অর্থে প্রতীতভাব বা phenomenon তজ্জন্য পঞ্চস্কন্ধের বা প্রতীত ভাবের সমষ্টিবিশেষের নাম সত্ত্ব বা জীব। অতএব নিঃসত্ত্ব অর্থে প্রতীত্য ভাবের ন্যায় সত্তাশূন্য। আর, নির্জীব অর্থে জীবনশূন্য অথবা ‘বেদগু’শূন্য বা জ্ঞাতৃত্বশূন্য। চক্ষুরাদির শক্তিরূপ মূলভাবকে জীবনশূন্য (কারণ জীবনও phenomenon এর অন্তর্গত) বা বেদগুশূন্য বলিলে সাংখ্যের সহিত কিছুই বিরোধ হয় না; কারণ সাংখ্যমতেও সমস্ত বিকার অচেতন ত্রিগুণোপাদানক। আর অসঙ্খত ধাতুকে এবং পরমসুখকেও জীবনশূন্য ও বেদগুশূন্য বলিলে কোন ক্ষতি নাই কারণ তাহার আর স্বতন্ত্র বেদগু কে থাকিবে?

শাশ্বতদৃষ্টি নাম শুনিয়া অনেকে ভ্রান্ত হন, ব্রহ্মজাল সূত্র হইতে তাহার সংক্ষিপ্ত অনুবাদ দিতেছি, পাঠক দেখিবেন আত্মতত্ত্বের সহিত বিরুদ্ধতা বিষয়ে উহার কোনও সম্বন্ধ নাই। (বুদ্ধ বলিতেছেন) “হে ভিক্ষুগণ, কোন কোন শাশ্বতবাদী ব্রাহ্মণ ও শ্রমণ আছেন, যাহারা আত্মা ও লোককে শাশ্বত বলেন। তাঁহারা কি শক্তির দ্বারা ও কি অবলম্বন করিয়া উহা বলেন? তাঁহারা বীর্য্য, যোগ, অপ্রমাদ ও সম্যক্ মনসিকারের দ্বারা সমাধিলাভ করিয়া সেই সমাধিবলে পরিশুদ্ধ চিত্তের দ্বারা এক, দুই, দশ, শত, সহস্র, শতসহস্র বা ততোধিক পূর্ব্ব জন্ম স্মরণ করিতে পারেন। তাঁহারা জানিতে পারেন যে আমরা অমুক অমুক নামে এতকালে উৎপন্ন হইয়াছিলাম। তাহাতে তাঁহারা মনে করেন যে এই লোক ও আত্মা

শাশ্বত, কূটস্থ ও ঐষিকস্থায়িরূপে স্থিত। কিন্তু এই সকল সত্ত্বেরা সন্ধাবিত (বিপ্লুত) হয় এবং সংসারচ্যুতি ও উৎপাদ প্রাপ্ত হয়।" ইহাই শাশ্বত বাদ। ব্রহ্মজাল সূত্রে এই বাদ হইতে আরম্ভ করিয়া চারি 'আরূপ্যায়তনা-রূপগদেবত্ব' (যোগশাস্ত্রের বিদেহলীন দেবত্ব) পর্য্যন্তকে মিথ্যাদৃষ্টি বলিয়া উক্ত হইয়াছে। ইহাতে কৈবল্যাপেক্ষা সালোক্য, সারূপ্য, সার্ষ্টি আদি সগুণ মুক্তির হেয়তামাত্র উক্ত হইল। কৈবল্যবাদী ঋষিগণও এইরূপ বলেন। সর্ব্বজ্ঞাতৃত্ব ও সর্ব্বভাবাধিষ্ঠাতৃত্বরূপ ব্রহ্মলোকের পরম ঐশ্বর্য্যেও বিরাগবান্ হইলে তবে কৈবল্য হয়।

পরন্তু বৌদ্ধভাষায় যাহা 'আত্মা' আর্যভাষায় তাহা অনাত্মা। অভি-ধানের বৈপরীত্য থাকিলেও অভিধেয় পদার্থ এক। যেহেতু পঞ্চস্কন্ধময় উপাধিকে বৌদ্ধেরা 'আত্মা' নামে অভিহিত করেন আর আর্যমতে তাহাই অনাত্মা। নির্ব্বাণের পরম সুখকে বৌদ্ধেরা আত্মা বলিতে অনিচ্ছুক, তৎপক্ষে এই যুক্তি দেন যে ব্যবহারিক আত্মা ও নির্ব্বাণসুখ যে পৃথক্ তাহা লক্ষ্য করা কর্ত্তব্য। ঋষিরাও ব্যবহারিক আত্মাকে অনাত্মা বলিয়া ঠিক তাহাই লক্ষ্য করান। ফলতঃ একই বাচ্য পদার্থের এই বাচক-বৈপরীত্য অবলম্বন করিয়া পরবর্ত্তী সম্প্রদায়াভিমানিগণ তুমুল সংগ্রাম বাধাইয়া গিয়াছেন এবং অদ্যাপি অনেক স্থূলদর্শী ব্যক্তিগণের ইহা বুদ্ধিমোহ উৎপাদন করে।

যদি ব্যবহারিক আত্মা (বৌদ্ধদের অত্তা) ও নির্ব্বাণসুখ সম্পূর্ণ সম্বন্ধ-শূন্য হয় তবে এই 'আমি' কেন নির্ব্বাণের জন্য মহান্ প্রযত্ন করিবে ? বস্তুত এই 'আমি' বৈরাগ্যের দ্বারা স্বীয় অঙ্গচ্ছেদ করিতে করিতে নির্ব্বাণসুখে যাইয়া উপনীত হয়। তজ্জন্য ঋষিরা নির্ব্বাণকে আমিত্বের প্রকৃত স্বরূপ ও ব্যবহারিক আমিত্বকে মিথ্যা বা অযথারূপ বলেন। 'আমি নির্ব্বাণ পাইব'—এই আশা নির্ব্বাণলাভ পর্য্যন্ত বিদ্যমান থাকিবে অতএব এই আমিত্বকে নির্ব্বাণ সুখের সহিত সম্বন্ধশূন্য বলা যাইতে পারে না।

বৌদ্ধেরাও বলেন 'তথাগতো বিমুত্তিসুখং পটিসম্বেদি' অর্থাৎ পঞ্চস্কন্ধান্তর্গত তথাগতের বিমুক্তিসুখ প্রতিসংবেদ্য পদার্থ হইল। সাংখ্যেরাও বুদ্ধি ও পুরুষের প্রতিসংবেদন সম্বন্ধ স্বীকার করেন।

অতএব নির্ব্বাণ অর্থে অভাবপ্রাপ্তি নহে তাহা স্বরূপে স্থিতি। বৌদ্ধেরা পঞ্চস্কন্ধের সমষ্টিবিশেষকে আত্মা-নামে অভিহিত করেন আর তাহার নিরোধ হইলে যে 'অনন্ত', অনুৎপন্ন, অসঙ্খত ধাতুরূপ পরমসুখ থাকে তাহাকে অনাত্মা (পঞ্চস্কন্ধাতীত) নাম দেন। আর ঋষিরা সেই পঞ্চস্কন্ধসমষ্টিকে অনাত্মা বলেন এবং নির্ব্বাণের স্বয়ংবোধকে স্বরূপ আত্মা বলেন। অতএব বৌদ্ধদের বলিতে হয় আত্মজ্ঞানরূপ ভ্রান্তি ত্যাগ করিয়া আত্মাতীত নির্ব্বাণসুখ লাভ কর, আর ঋষিদের বলিতে হয় অনাত্মজ্ঞানরূপ ভ্রান্তি ত্যাগ করিয়া স্বরূপ আত্মায় স্থিত হও। সুতরাং বাচক ভিন্ন হইলেও বাচ্য অভিন্ন।

ফলত বৌদ্ধদের আদর্শ ও ধর্ম্মনীতি যেমন উৎকৃষ্ট তাঁহাদের দর্শন সেরূপ নহে। ইহার কয়েকটা সঙ্গত কারণ আছে, যথা—

(১) বুদ্ধদেব যে আন্বীক্ষিকী (metaphysics) সম্বন্ধে কোন উপদেশ করিতেন না তাহা পালি বৌদ্ধশাস্ত্রেই পাওয়া যায়। যাহারা সমাধিসিদ্ধ মহাপুরুষ তাঁহারা সাক্ষাৎ উদাহরণস্বরূপ হওয়াতে সাধারণ লোককে পরমার্থ নিশ্চয় করাইবার জন্য যুক্তি বা অনুমানমূলক দর্শন শাস্ত্রের তত প্রয়োজন হয় না, উদাহরণের অসাক্ষাতেই দর্শনশাস্ত্র অধিক ফলদায়ী। অতএব বুঝিতে হইবে বৌদ্ধদর্শন বুদ্ধের নহে বুদ্ধের ভক্তগণের। বুদ্ধের ২।৪ শত বর্ষ পর হইতে সহস্রাধিক বর্ষ পর্য্যন্ত সংস্কৃত বৌদ্ধশাস্ত্রকারেরা আন্বীক্ষিকীর প্রভূত আলোচনা করিয়া গিয়াছেন, নচেৎ আত্মরক্ষা করা সম্ভব হইত না।

(২) মহাপুরুষদের ভক্তগণের জন্যই আমরা তাঁহাদের যথাযথ বিবরণ পাই না, ভক্তেরা সত্য বিবরণ না দিয়া যাহা নিজেরা সত্য ও উপযুক্ত

মনে করেন তাহাই বলেন এবং মহাপুরুষদের মুখ দিয়া বলান। বুদ্ধকে খ্যাপিত করিতে যাইয়া তাঁহার ভক্তগণ কত যে অলীক, অবান্তর ও অপ্রয়োজনীয় কল্পনার উদ্ভাবনা করিয়াছেন তাহা গণনা করা যায় না। দর্শন সম্বন্ধেও ঐরূপ। পূর্ব্ব হইতেই মোক্ষমার্গ ও মোক্ষশাস্ত্র প্রচলিত থাকিলেও, অপিচ তৎসম্বন্ধে কোনও মৌলিক কথা বলিবার না থাকিলেও স্বসম্প্রদায়ের বিশিষ্টতা স্থাপনের জন্য বুদ্ধভক্তগণকে অভিনব আকারের বাদ উদ্ভাবন করিতে হইয়াছে নচেৎ গুরুর মৌলিকতা স্থাপিত হয় কিরূপে? এইজন্য বুদ্ধদেব পারদর্শী হইলেও বৌদ্ধ দর্শন সদোষ হইয়াছে।

(৩) বহুবর্ষ পূর্ব্বে যাহা ঘটিয়াছে তাহা পরে লিপিবদ্ধ করিতে যাইলে যে কত দোষ হয় তাহা সহজেই বুঝা যায়। বৌদ্ধশাস্ত্রে বুদ্ধের মুখ দিয়া যে সমস্ত সংবাদ বলান হইয়াছে তাহার অধিকাংশই বহুবর্ষ বা শতাব্দী পূর্ব্বকার বুদ্ধের কথাবার্ত্তা অবলম্বন করিয়া রচিত হওয়াতে কেহ যদি তাহা সব যথাযথ বুদ্ধের উচ্চারিত কথা মনে করেন তবে ভ্রান্ত হইবেন। তজ্জন্য তাদৃশ শাস্ত্রের দোষের জন্য উপদেষ্টা পুরুষ দায়ী নহেন। বর্ত্তমান পালিভাষা বুদ্ধের সময়ে ছিল কিনা তাহাতেও কেহ কেহ সংশয় করেন। অশোকের লিপিতে উহার ব্যবহার নাই।

(৪) বুদ্ধদেবের নির্ব্বাণের পরেই তদীয় শিষ্যগণের মধ্যে নানা মতভেদ হয়। তখন প্রধান প্রধান শিষ্যগণের যাহা অভিমত ও যাহা স্মরণ ছিল তাহা লইয়াই বৌদ্ধশাস্ত্র রচিত হয়। তন্মধ্যে কাশ্যপ অভিধর্ম্ম বা বৌদ্ধদর্শনের গ্রন্থ রচনা করেন। সমস্ত অভিধর্ম্ম যে এক সময়ে রচিত হয় নাই তাহারও প্রমাণ আছে। আর্ষদর্শনের বিষয় সকল যেরূপ স্পষ্ট সংক্ষিপ্ত ও অনবদ্য সূত্রে রচিত বৌদ্ধদর্শন ঠিক তাহার বিপরীত। শব্দ-বাহুল্যময় ঐ শাস্ত্র বহুবর্ষ কণ্ঠে কণ্ঠে থাকিলে যে কিরূপ বিপর্য্যস্ত হইতে পারে তাহা সহজেই অনুমেয়। তবে বুদ্ধদেব গাথাতে যে সব উপদেশ দিয়াছেন তাহা অদুষ্ট থাকিবার কথা, তাই ধর্ম্মপদ এরূপ অনবদ্য।

ফলে বৌদ্ধদের দর্শনের কিছু কিছু দোষ থাকিলেও তাঁহাদের মোক্ষ-মার্গের কিছু দোষ নাই, কারণ বুদ্ধদেব উহারই সম্যক্ শিক্ষা দিয়াছিলেন। আর তাঁহার নির্ব্বাণ মার্গের সহিত আর্ষ নির্ব্বাণ মার্গেরও যে বিশেষ কিছু ভেদ নাই তাহাও দেখান হইয়াছে। তাঁহার 'ধর্ম্মপদের' ন্যায় ধর্ম্মনীতি এবং তাঁহার ন্যায় মুমুক্ষুদের আদর্শ জগতে দুর্লভ।

প্রজ্ঞা পারমিতা

(বোধিচর্য্যাবতারের নবম পরিচ্ছেদস্থ)

বৌদ্ধদের দশটি পারমিতা বা পারগামী কুশলাচরণ আছে। তাহারা যথা—দান, শীল, ক্ষান্তি, উপায়, বল, প্রণিধি, জ্ঞান, বীর্য্য, ধ্যান ও প্রজ্ঞা। যাহারা ভবিষ্যতে বুদ্ধ হইবেন তাঁহাদের নাম বোধিসত্ত্ব। বোধিসত্ত্বেরা বুদ্ধ হইবার পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে দানাদি নিম্ন পারমিতা আচরণ করেন। শেষ জন্মে সন্ন্যাস লইয়া ধ্যানাদি আচরণ করিয়া সমাধিসিদ্ধি করেন ও তদ্দ্বারা প্রজ্ঞা লাভ করেন। তখন ত্যাগই করেন, দানাদি নিম্ন পারমিতা করেন না। এই সমাধিজাত প্রজ্ঞার নাম প্রজ্ঞাপারমিতা। অষ্ট সাহস্রিকা, পঞ্চবিংশতি সাহস্রিকা, শতসাহস্রিকা প্রভৃতি ক্ষুদ্র ও বৃহৎ সংস্কৃত প্রজ্ঞা-পারমিতা নামক ত্রিপেটকের গ্রন্থ আছে। বোধিচর্য্যাবতার গ্রন্থের নবম পরিচ্ছেদের নাম প্রজ্ঞাপারমিতা। তাহা অনূদিত করিয়া প্রকাশিত হইতেছে। প্রজ্ঞাপারমিতা দেবতার ন্যায় বৌদ্ধদের পূজ্য। 'নমস্তস্যৈ ভগবত্যৈ প্রজ্ঞাপারমিতেঽমিতে' ইত্যাদিরূপ প্রজ্ঞাপারমিতার স্তুতি আছে।

ইমং পরিকরং সর্ব্বং প্রজ্ঞার্থং হি মুনির্জগৌ।

তস্মাদুৎপাদয়েৎ প্রজ্ঞাং দুঃখনিবৃত্তিকাঙ্ক্ষয়া ॥ ১

১। এই (পূর্ব্বোক্ত) পরিকর বা সাধনসমূহ কেবল প্রজ্ঞারই জন্য, ইহা মহামুনি বলিয়াছেন। অতএব দুঃখ-নিবৃত্তির ইচ্ছায় প্রজ্ঞাকে উৎপাদন করিবে।

অষ্টম পরিচ্ছেদের চতুর্থ শ্লোকে শমথ এবং বিপশ্যনার কথা প্রতিজ্ঞাত হইয়াছিল। ঐ দুইটিই নির্ব্বাণ সাধনের মুখ্য অঙ্গ। তন্মধ্যে শমথ বা সমাধির সাধন ধ্যানপারমিতায় উক্ত হইয়াছে। বিপশ্যনা অর্থে সমাধি-জাত প্রজ্ঞা। তাহার স্বরূপ কি তাহা এই পরিচ্ছেদে ব্যাখ্যাত হইতেছে।

চিত্তের সম্যক্ স্থৈর্য্যকে শমথ বলে। তাহা ধ্যানের সম্যক্ নিশ্চলতা। পাতঞ্জল শাস্ত্রে আছে যে 'তদেবার্থমাত্র-নির্ভাসং স্বরূপশূন্যমিব সমাধিঃ," বৌদ্ধেরা ঠিক উহাকেই সমাধি বলেন এবং আসীন হইয়া ধারণাধ্যানের অভ্যাস এবং বৈরাগ্য করিয়া (সাংখ্যযোগীদের ন্যায়) সমাধির সাধন করেন। যোগশাস্ত্রে আছে সমাধি হইলে যথাভূত প্রজ্ঞা হয় ("তজ্জয়াৎ প্রজ্ঞালোকঃ")। বৌদ্ধেরাও বলেন "সমাহিতো যথাবজ্জানাতীত্যুক্তবান্ মুনিঃ"। "সমাহিতচেতসো যথাভূতং দর্শনং ভবতি" (ধর্ম্মসঙ্গীতি সূত্র)।

সমাহিত চিত্তের এই যে প্রজ্ঞা তাহা অসমাহিত-চিত্ত শাস্ত্রকারদের দ্বারা আর্য ও বৌদ্ধাদি শাস্ত্রে প্রপঞ্চিত হওয়াতে কিছু কিছু ভিন্নভাব ধারণ করিয়াছে। কিন্তু দৃশ্যজ্ঞানের সম্যক্ নিরোধই যে সেই প্রজ্ঞার ফল তদ্বিষয়ে আর্য ও বৌদ্ধাদি নির্ব্বাণবাদীরা সকলেই একমত। দৃশ্যের স্বরূপ কি তদ্বিষয়ে সাম্প্রদায়িকদের মতভেদ আছে কিন্তু প্রায়শঃ তাহা অভিধেয় শব্দ লইয়াই ভেদ। আর্য ও বৌদ্ধদের মুখ্য ভেদ আত্ম-পদার্থ লইয়া। কিন্তু বুঝিয়া দেখিলে পাঠক দেখিবেন যে একই দৃশ্য পদার্থকে আর্যনির্ব্বাণ-মার্গীরা অনাত্মা বলেন; আর বৌদ্ধেরা ঠিক তাহাকে "আত্মা" বলেন। সুতরাং আর্যভাষায় অনাত্ম ভাব হেয় আর বৌদ্ধ ভাষায় আত্মভাব হেয়। আর্য ভাষায় অনাত্ম দৃশ্যভাব ত্যাগ করিলে যাহা থাকে তাহাই "আত্মা বা পুরুষ," আর বৌদ্ধ ভাষায় আত্মাকে ত্যাগ করিলে যাহা থাকে তাহাই "অনাত্মা"। এই দৃশ্যত্যাগ কার্য্যত উভয় সম্প্রদায়ের একই। সুতরাং শেষে যাহা থাকে তাহাও এক, কিন্তু সম্প্রদায়ভেদে ভিন্ন ভিন্ন আখ্যা।

এই চরম পদার্থকে বৌদ্ধেরা শূন্য বলেন। কিন্তু "অষ্টসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতায়" আছে "শূন্যরূপেণ কৌশিক তিষ্ঠতা" ইত্যাদি। অর্থাৎ শূন্যও 'আছে' বা ভাব পদার্থ। কিন্তু কোন কোন স্থলে আবার তাহাকে "অভাব" বলাতে অনেক গোল হইয়াছে এবং আর্ষশাস্ত্রকারেরা তাহা ধরিয়া বেশ সঙ্গতভাবে তাহা নিরাস করিতে পারিয়াছেন। আবার বৌদ্ধেরাও আর্ষদের আত্মশব্দ ধরিয়া তাহাকে ব্যবহারিক আত্মা মনে করিয়া আর্ষমত নিরাসে প্রয়াস পাইয়াছেন।

বলা বাহুল্য এই চরম পদার্থ দৃশ্যাতীত বা absolute দ্রষ্টা। তাদৃশ পদার্থের লক্ষণ করিতে হইলে সমস্ত দৃশ্যধর্ম্মের নিষেধ করিতে হয়। আর্ষদের আত্মার লক্ষণেও "অদৃষ্ট, অব্যবহার্য্য, অচিন্ত্য" ইত্যাদি দৃশ্য ধর্ম্মের নিষেধ দৃষ্ট হয়। কিন্তু তাদৃশ পদার্থকে শুদ্ধ 'অভাব' "অনাত্মা" বলিলে চলে না, তাই আর্ষশাস্ত্রে তাহার ভাববাচী "আত্মা বা পুরুষ" আখ্যা আছে। আর বৌদ্ধদেরকেও 'শূন্য আছে' এরূপ বলিতে হয়। এইরূপ আখ্যাভেদ লইয়া সাম্প্রদায়িকগণ অনেক বিবাদের সৃষ্টি করিয়াছেন। আর্যগণ বলেন যাহাতে আত্মাভিমান হয় বা আছে তাহা অনাত্মা ও আত্মা হইতে ব্যতিরিক্ত। বৌদ্ধেরাও বলেন আত্মাই অনাত্মা। আর্যগণ কূটস্থ বা নির্ব্বিকার চৈতন্য পদার্থকে অবিকারী ভাব বলেন, আর বৌদ্ধগণ তাহাকে অবিকারী শূন্য বা অভাব বলেন। যাহাকে 'তিষ্ঠতি' বলিতে হয় তাহাকে সম্পূর্ণ অভাব বলিলে যে ভাষার দোষ হয়, সুতরাং ভাষাময় শাস্ত্র-রচনাও চলে না তাহা বিজ্ঞ পাঠক বুঝিবেন। এই দুর্ব্বলতার জন্য শেষে বৌদ্ধমত পরাভূত হইয়া ভারত হইতে অন্তর্হিত হয়। কার্য্যত কিন্তু স্বশাস্ত্রোক্ত নির্ব্বাণমার্গের সাধন করিলে বৌদ্ধেরা আর্যদের নির্দ্দিষ্ট সেই চরম পদেই যাইবেন, কারণ বৌদ্ধগণ সাংখ্যযোগ হইতে সসাধন সমাধি এবং সমস্ত দৃশ্যপদার্থে বৈরাগ্য এই দুই প্রধান বিষয় সম্যক্ গ্রহণ করিয়াছেন।

সংবৃতিঃ পরমার্থশ্চ সত্যদ্বয়মিদং মতং।

বুদ্ধেরগোচরস্তত্ত্বং বুদ্ধিঃ সংবৃতিরুচ্যতে ॥২

২। সংবৃতি সত্য ও পরমার্থ সত্য এই দ্বিবিধ সত্য স্বীকৃত হয়। তন্মধ্যে বুদ্ধির বা জ্ঞানশক্তির যাহা অবিষয় তাহাই পরমার্থ সত্য বা তত্ত্ব এবং যাহা বুদ্ধিগোচর তাহা সংবৃতি সত্য।

সংবৃতি অর্থে অবিদ্যা। অবিদ্যা = যাহাতে অভূত বিষয় খ্যাপিত হয় এবং যথাভূত বিষয় আবৃত হয়, তাদৃশ বিপরীত জ্ঞান, যথা—"অভূতং খ্যাপয়ত্যর্থং ভূতমাবৃত্যবর্ত্ততে।" তাদৃশ অবিদ্যাবহুল বিষয় সাধারণ ব্যক্তিদের নিকট যাহা সত্য বলিয়া বোধ হয় তাহাই সংবৃতি সত্য, যথা—"সত্যং তয়া (সংবৃত্যা অবিদ্যয়া বা) খ্যাতি যদেব কৃত্রিমং। জগাদ তৎসংবৃতিসত্যমিত্যাদি"—অর্থাৎ ছয় ইন্দ্রিয়ের বৈকল্য বিনা যে গ্রাহ্যের গ্রহণ হয় তাহাই লৌকিক বা সংবৃতি সত্য। তাহা ছাড়া যে কল্পিত বিষয় তাহাই সংবৃতি মিথ্যা।

পরমার্থদশাতে এই উভয়ই (সংবৃতি সত্য ও সংবৃতি মিথ্যা) মিথ্যা বলিয়া অবভাত হয়। পরমার্থ = উত্তমার্থ, যাহার অধিগম হইলে অকৃত্রিম বস্তুতত্ত্বের বিজ্ঞান হইয়া সমস্ত সংবৃতিবাসনানুসন্ধী ক্লেশের সম্যক্ প্রহাণ হয়। এই পরমার্থের অন্য নাম সর্ব্বধর্ম্মের নিঃস্বভাবতা, শূন্যতা, তথতা, ভূতকোটি, ধর্ম্মধাতু ইত্যাদি। এইরূপ যে শূন্যতা তাহাই পরমার্থ সত্য। বৌদ্ধদের শূন্যতা বা অভাব সর্ব্বস্থলে অত্যন্তাভাব অর্থে ব্যবহৃত হয় না, কারণ বৌদ্ধ ভাষায় "ভাব" অর্থে "যাহা প্রত্যয় হইতে হয় (ভবন্তি) বা স্বরূপ লাভ করে তাহাই ভাব"। সুতরাং যাহা প্রত্যয় বা কারণ হইতে উৎপন্ন হয় না তাহা "অভাব", সুতরাং তাহা কারণহীন সত্তাও হইতে পারে। তাহা হইলে আর্যমতের সহিত ভেদ প্রধানতঃ শব্দার্থের ভেদমূলক।

তত্র লোকো দ্বিধা দৃষ্টো যোগীপ্রাকৃতকস্তথা।

তত্র প্রাকৃতকোলোকো যোগিলোকেন বাধ্যতে ॥৩

৩। সেই দুই সত্য অনুসারে লোকও দ্বিবিধ দৃষ্ট হয়, তাহা যথা যোগিলোক ও প্রাকৃত লোক। তন্মধ্যে প্রাকৃতলোক যোগিলোকের দ্বারা বাধিত হয়।

লোক অর্থে সমুদায় বা জ্ঞানের রাশি। যোগ অর্থে সমাধি বা সর্ব্ব-ধর্ম্মের অনুপলব্ধি। তাদৃশ যোগযুক্তের নাম যোগী। প্রকৃতি="সংসার প্রবৃত্তির কারণ অবিদ্যা।" প্রকৃতিজাত অর্থে প্রাকৃত। ইহার মধ্যে প্রাকৃত-লোক যোগিলোকের দ্বারা বাধিত হয়। কিন্তু যোগিলোক প্রাকৃতলোকের দ্বারা বাধিত হয় না। কারণ, যোগীদের নিকট উভয়লোকই অনাবৃত থাকে কিন্তু প্রাকৃতেরা যোগিলোকের উপলব্ধি করিতে পারে না। "ন বাধ্যতে জ্ঞানম-তৈমিরাণাং যথোপলব্ধং তিমিরেক্ষণানাং।"

বাধ্যন্তে ধীবিশেষেণ যোগিনোঽপ্যুত্তরোত্তরৈঃ।

দৃষ্টান্তেনোভয়েষ্টেন কার্য্যার্থমবিচারতঃ ॥৪

৪। যোগীদের জ্ঞানও উত্তরোত্তর নির্ম্মল হইতে থাকিলে তাহা পূর্ব্ব পূর্ব্ব যোগিজ্ঞানকে বাধিত (তিরস্কৃত) করিতে থাকে। মায়ামরীচি, গন্ধর্ব্বনগর প্রভৃতির দৃষ্টান্ত যোগী ও প্রাকৃত উভয়ের পক্ষেই সঙ্গত হয়, কারণ যেমন কণ্টকের দ্বারা কণ্টক উদ্ধৃত হয় সেইরূপ মায়াত্মক হেতুর দ্বারা মায়া নিবর্ত্তিত হয় সুতরাং যোগী ও প্রাকৃত উভয়েই কার্য্য-সাধনের জন্য মায়াময় (কার্য্য-সিদ্ধির) হেতু অবিচারে গ্রহণ করিয়া থাকেন। এ বিষয়ে উক্ত হয়—"উপায়ভূতং ব্যবহারসত্যমুপেয়ভূতং পরমার্থ সত্যম্।"

লোকেন ভাবা দৃশ্যন্তে কল্প্যন্তে চাপি তত্ত্বতঃ।

নতু মায়াবদিত্যত্র বিবাদো যোগিলোকয়োঃ ॥ ৫

৫। সাধারণ লোকে ভাব সকলকে গোচর করে এবং তাহারাই যে বস্তুত সৎ এরূপ কল্পনা করে। পরন্তু তাহারা যে মায়ার মত তাহা লোকে উপলব্ধি করিতে পারে না। ইহাই যোগীদের ও সাধারণ লোকের মধ্যে বিবাদ (প্রভেদ)।

প্রত্যক্ষমপিরূপাদি প্রসিদ্ধ্যা ন প্রমাণতঃ।
অশুচ্যাদিষু শুচ্যাদিপ্রসিদ্ধিরিব সা মৃষা ॥ ৬

৬। রূপাদি বিষয় যাহা প্রত্যক্ষ হয় তাহারাও প্রামাণিক বা তাত্ত্বিক নহে। অশুচিতে শুচিখ্যাতি, অনিত্যে নিত্যতাখ্যাতি ইত্যাদিবৎ তাহারা (বিষয়জ্ঞান) মিথ্যা। কথিত আছে—"ইন্দ্রিয়ৈরুপলব্ধং যৎ তত্ত্বত্বেন ভবেদ্যদি। জ্ঞাতাস্তত্ত্ববিদো বালাস্তত্ত্বজ্ঞানেন কিং তদা।"

লোকাবতারণার্থং চ ভাবা নাথেন দেশিতাঃ!
তত্ত্বতঃ ক্ষণিকা নৈতে সংবৃত্যা চেদ্বিরুধ্যতে ॥৭

৭। দৃশ্য পদার্থে অভিনিবিষ্ট লোকদের সুচারুরূপে শূন্যতার অধিগম করাইবার জন্যই নাথ (বুদ্ধদেব) ভাব সকলের বা পঞ্চস্কন্ধ ও দ্বাদশায়তনের বিষয় স্থাপিত করিয়াছেন। পরমার্থত ভাবসকল ক্ষণিক নহে, কারণ যখন ভাব সকল নিঃস্বভাব তখন তাহাদের স্বভাব ক্ষণিকত্ব, এরূপ বলাও যুক্ত নহে। আর যদি বল ঐ ক্ষণিকত্ব স্বভাবও সংবৃতি বা অবিদ্যার দ্বারা উপলব্ধ হয়, তাহা সঙ্গত হয় না। কারণ, তাহাদের অক্ষণিকতা সাধারণ সংবৃত অবস্থায় প্রতীত হয়, ইহা যে দোষ নহে তাহা পরের শ্লোকে বিবৃত হইতেছে।

ন দোষো যোগিসংবৃত্যা লোকাত্তে তত্ত্বদর্শিনঃ।
অন্যথা লোকবাধাস্যাদশুচিস্ত্রীনিরূপণে ॥ ৮

৮। যে সংবৃতির দ্বারা ভাব সকলের ক্ষণিকত্ব প্রতীত হয় তাহা যোগিসংবৃতি (যোগীরাও বুদ্ধির দ্বারা উহার উপলব্ধি করেন আর বুদ্ধিই সংবৃতি)। যোগীরা সাধারণ লোক অপেক্ষা তত্ত্বদর্শী সুতরাং সম্পূর্ণ পরমার্থত না হউক যোগীদের তত্ত্বদৃষ্টিতে ভাবসকল ক্ষণিক। (অর্থাৎ অর্ব্বাগ্‌দর্শীরা ভাবসকলকে অক্ষণিক দেখে, তদপেক্ষা তত্ত্বদর্শী যোগীরা ক্ষণিক দেখেন আর পরমার্থসিদ্ধ হইলে অক্ষণিক বা ক্ষণিক কিছুই থাকে না)।

সাধারণ লোকে স্ত্রী আদিকে শুচি মনে করে কিন্তু তত্ত্বদৃষ্টিতে তাহা সব অশুচি বলিয়া খ্যাত হয়, এ স্থলেও যেমন লোক-প্রতীতির বাধা হয়, ক্ষণিকত্ব বিষয়েও সেইরূপ হয়, অতএব উহাতে দোষ নাই।

পরমার্থত যে সমস্তই স্বপ্নোপম, মায়োপম তাহা প্রজ্ঞাপারমিতায় দেব-পুত্রদের স্থভূতি বলিয়াছেন ; যথা—হে দেবপুত্রগণ ! সমস্ত প্রাণীই মায়োপম স্বপ্নোপম। সমস্ত ধর্ম্ম এমন কি সম্যক্ সম্বুদ্ধত্ব এবং নির্ব্বাণও স্বপ্নোপম, মায়োপম।

মায়োপমাজ্জিনাৎ পুণ্যং সত্তাবেঽপি কথং যথা।
যদি মায়োপমঃ সত্ত্বঃ কিং পুনর্জায়তে মৃতঃ ॥৯

৯। যদি শঙ্কা কর যে মায়োপম বুদ্ধ হইতে কিরূপে পুণ্য হইতে পারে, তদুত্তরে বলি যে মায়োপম না হইলে বুদ্ধ সৎস্বরূপ হইবেন, তাহা হইলেই বা কিরূপে বুদ্ধ হইতে পুণ্য হইতে পারে ? অর্থাৎ আমাদের মতে পুণ্যও মায়োপম সুতরাং মায়োপম বুদ্ধ হইতে মায়োপম পুণ্য হইবে তাহাতে আর কথা কি ? যাহাদের মতে বুদ্ধ পরমার্থ সৎ তাহাদের মতে যেমন পরমার্থ সৎ পুণ্য হয় এ ক্ষেত্রেও সেইরূপ ন্যায়।

আরও শঙ্কা হইতে পারে যে যদি সত্ত্বসকল মায়োপম তবে তাহারা মৃত হইয়া কিরূপে জন্মায় ? উত্তর পরশ্লোকে বলিতেছেন।

যাবৎ প্রত্যয় সামগ্রী তাবন্মায়াপি বর্ত্ততে।
দীর্ঘসন্তানমাত্রেণ কথং সত্ত্বোঽস্তি সত্যতঃ ॥১০

১০। যতকাল প্রত্যয় সামগ্রী (মায়ার হেতু) থাকে, তত কাল মায়াও থাকে। সুতরাং সত্ত্বগণ দীর্ঘকাল থাকিতে পারে। দীর্ঘকাল থাকিলেই যে তাহা পরমার্থ সৎ হইবে তাহার কোনও নিয়ম নাই।

মায়াপুরুষঘাতাদৌ চিত্তাভাবান্ন পাপকং।
চিত্তমায়া সমেতে তু পাপপুণ্যসমুদ্ভবঃ ॥১১

১১। শঙ্কা হইতে পারে মায়াপুরুষকে বধাদি করিলে যেমন পাপ হয়

না, তেমনি অন্য প্রাণীকে বধাদি করিলেও পাপ হওয়া উচিত নহে, কারণ তোমাদের মতে সমস্তই মায়া। এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে মায়ানির্ম্মিত পুরুষের চিত্ত থাকে না বলিয়া তাহার বধাদিতে পাপ হয় না (তবে ঘাতকের অসদভিপ্রায়ের জন্য অশুভ হইতে পারে) কিন্তু চিত্ত-(বিজ্ঞান) রূপ মায়াযুক্ত সত্ত্বের অপকার বা উপকার করিলেই পাপপুণ্য সমুদ্ভূত হয়।

মন্ত্রাদীনামসামর্থ্যান্ন মায়াচিত্তসম্ভবঃ।
সাপি নানাবিধা মায়া নানাপ্রত্যয়সম্ভবা।
নৈকস্য সর্ব্বসামর্থ্যে প্রত্যয়স্যাস্তি কুত্রচিৎ ॥১২

১২। মায়ানির্ম্মিত পুরুষের মায়াচিত্ত হয় না, কারণ মায়াবীর মন্ত্রাদির সে বিষয়ে সামর্থ্য নাই। মায়াও নানাবিধ আছে তাহা নানা কারণ হইতে সমুদ্ভূত হয়। অতএব মায়া এই নামের একত্ব থাকিলেও একরূপ মায়ার দ্বারা অন্যরূপ কার্য্য হয় না। সুতরাং একরূপ মায়াকার্য্য দেখিয়া তাহা সর্ব্বত্র সংযোজিত করিতে যাওয়া ন্যায়সঙ্গত নহে।

একই প্রত্যয়ের বা কারণের কুত্রাপি সর্ব্বসামর্থ্য দেখা যায় না। সুতরাং যথাযোগ্য প্রত্যয় হেতু হইতে যথাযোগ্য মায়া উদ্ভূত হয়। অনিয়মে কিছু হয় না।

নির্বৃতঃ পরমার্থেন সংবৃত্যা যদি সংসরেৎ।
বুদ্ধোঽপি সংসরেদেবং ততঃ কিং বোধিচর্য্যয়া ॥১৩

১৩। (সৌত্রান্তিকাদি বিরুদ্ধবাদীদের বলি যে উক্ত নিয়ম না থাকিলে অর্থাৎ) পরমার্থত কেহ নির্ব্বাণ পাইলে যদি পুনশ্চ সংসৃত হয় তবে বুদ্ধও সংসৃত হইবেন। অতএব বোধিচর্য্যার ফল কি?

প্রত্যয়ানামনুচ্ছেদে মায়াপ্যুচ্ছিদ্যতে ন হি।
প্রত্যয়ানাং তু বিচ্ছেদাৎ সংবৃত্যাপি ন সম্ভবঃ ॥১৪

১৪। প্রত্যয় সকলের উচ্ছেদ না হইলে মায়াও উচ্ছিন্ন হয় না, আর প্রত্যয়ের বিচ্ছেদ হইলে সংবৃতির দ্বারাও আর মায়া হয় না (প্রকৃত-

পক্ষে যথাযোগ্য প্রত্যয়ে সংবৃতিরই উচ্ছেদ হয় বলিয়া আর সংবৃতিকার্য্য থাকে না)। সংবৃতির অপর নাম অবিদ্যা তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। অবিদ্যার উদাহরণ বৌদ্ধদের সূত্রে এইরূপ আছে, যথা—অবিদ্যা কি কি? —এই যে ছয় ধাতু (শরীর ধাতু) তাহাদের যে এক সংজ্ঞা, পিণ্ড সংজ্ঞা, নিত্য সংজ্ঞা, ধ্রুব সংজ্ঞা, শাশ্বত সংজ্ঞা, সুখ সংজ্ঞা, আত্ম সংজ্ঞা, সত্বসংজ্ঞা, জীব সংজ্ঞা, জন্তু সংজ্ঞা, মনুজ সংজ্ঞা, মানব সংজ্ঞা, অহঙ্কার সংজ্ঞা, মমকার সংজ্ঞা ইত্যাদি যে বিবিধ অজ্ঞান তাহাই অবিদ্যা। এইরূপ অবিদ্যা থাকিলে বিষয়ে রাগ, দ্বেষ, মোহ উদ্ভূত হয়। এই রাগ, দ্বেষ ও মোহই সংস্কার, অতএব সংস্কার অবিদ্যা-প্রত্যয় বা অবিদ্যাজনিত। সংস্কার-প্রত্যয় বিজ্ঞান। বিজ্ঞান-প্রত্যয় নাম (বিজ্ঞানসহজন্মা চারি সংজ্ঞাদি অরূপ স্কন্ধ) ও রূপ (মহাভূত)। নামরূপ-প্রত্যয় ষড়ায়তন বা ছয় ইন্দ্রিয়। ষড়ায়তন-প্রত্যয় স্পর্শ বা ঐন্দ্রিয়িক জ্ঞান (মন ও ইন্দ্রিয়)। স্পর্শ-প্রত্যয় বেদনা বা সুখ দুঃখানুভব। বেদনা-প্রত্যয় তৃষ্ণা (বেদনাতে অধ্যবসায়)। তৃষ্ণা-প্রত্যয় উপাদান বা তৃষ্ণার বৈপুল্য। উপাদান-প্রত্যয় ভব বা জন্মহেতু কর্ম্ম। ভবপ্রত্যয় জাতি বা শরীর ধারণ। জাতি-প্রত্যয় জরা, মরণ, শোক পরিদেবন (বিলাপ), দুঃখ, দৌর্ম্মনস্য ও উপায়াস। ইহাই বৌদ্ধদের প্রতীত্যসমুৎপাদ। বিপরীত ক্রমে অবিদ্যানাশ হইলে দুঃখের প্রহাণ হয়।

বৌদ্ধেরা বলেন "যথাক্ষেপং ক্রমাদ্বৃদ্ধঃ সংতানঃ ক্লেশকর্ম্মভিঃ। পরলোকং পুনর্যাতীত্যনাদি ভবচক্রকং। স প্রতীত্যসমুৎপাদো দ্বাদশাঙ্গস্ত্রিকাণ্ডকঃ॥" অর্থাৎ ক্লেশ ও কর্ম্মের দ্বারা ক্রমশঃ সন্তান (আত্মভাব) বৃদ্ধ হইয়া পরলোকে পুনশ্চ যায়। এইরূপে ভবচক্র অনাদি। সেই প্রতীত্যসমুৎপাদ দ্বাদশাঙ্গ ও ত্রিকাণ্ড (দ্বাদশ অঙ্গ অবিদ্যা সংস্কারাদি। ত্রিকাণ্ড=ক্লেশকাণ্ড কর্ম্মকাণ্ড ও দুঃখকাণ্ড)।

যদা ন ভ্রান্তিরপ্যস্তি মায়া কেনোপলভ্যতে॥১৫

১৫। গ্রন্থকার মাধ্যমিক। মাধ্যমিকেরা মায়াবাদী। বিজ্ঞানবাদী

যোগাচারেরা, যাহারা বিজ্ঞানাতিরিক্ত বাহ্যভাব স্বীকার করেন না, তাঁহারা মায়াবাদের এইরূপ দোষ দেন—

যখন আপনারা (মাধ্যমিকেরা) সমস্ত জগৎকে মায়াত্মকত্বহেতু স্বভাব শূন্য বলেন তখন মায়াস্বভাব সংবৃতিগ্রাহিকা (অবিদ্যা বলিয়া জানা) বুদ্ধিও আপনাদের মতে থাকিবে না, অতএব মায়া কিসের দ্বারা উপলব্ধ হইবে ? আমাদের (বিজ্ঞানবাদীদের) মতে তাহা সঙ্গত হইতে পারে কারণ আমাদের বিজ্ঞান পরমার্থ সৎ আর বাহ্যবস্তুই ভ্রান্তি।

যদা মায়ৈব তে নাস্তি তদা কিমুপলভ্যতে।
চিত্তস্যৈব স আকারো যদ্যপ্যন্তোঽস্তি তত্ত্বতঃ ॥১৬

১৬। এতদুত্তরে বিজ্ঞানবাদীদেরকে বক্তব্য যে যখন আপনাদের মতে মায়াই নাই তখন তাহার উপলব্ধির কথা বৃথা। যদ্যপি আপনাদের মতে বাহ্যবস্তু চিত্তেরই আকার তথাপি তাহা বস্তুতঃ আছে (কারণ হস্তী, অশ্বাদি বাহ্যদ্রব্যের জ্ঞাতৃচিত্ত হইতে ব্যতিরিক্ত সত্তা অস্বীকার করার যো নাই।)

চিত্তমেব যদা মায়া তদা কিং কেন দৃশ্যতে।
উক্তং চ লোকনাথেন চিত্তং চিত্তং ন পশ্যতি ॥১৭

১৭। পরন্তু যদি চিত্ত বা দর্শন শক্তি মাত্র থাকে এবং দৃশ্য না থাকে তবে দর্শনই সিদ্ধ হয় না ; সমস্তের অন্ধতা সিদ্ধ হয়। কারণ চিত্তই যখন মায়া তখন কাহাকে কিসের দ্বারা জানা যাইবে ? যদি বল চিত্তের স্বসংবেদন গুণেই নিজের বাহ্যবস্তুস্বরূপ আকার চিত্ত নিজেই জানে তাহাও ঠিক নহে, কারণ লোকনাথ বুদ্ধ বলিয়াছেন যে চিত্ত চিত্তকে জানে না।

ন চ্ছিনত্তি যথাত্মানমসিধারা তথা মনঃ।
আত্মভাবং যথাদীপঃ সম্প্রকাশয়তীতি চেৎ ॥১৮
নৈব প্রকাশ্যতে দীপো যস্মান্ন তমসাবৃতঃ।
নহি স্ফটিকবন্নীলং নীলত্বেঽন্যমপেক্ষতে। ১৯

১৮।১৯। অসিধারা যেরূপ নিজেকে ছিন্ন করিতে পারে না মনও সেই-

রূপ নিজেকে জানিতে পারে না। যদি বল প্রদীপ যেরূপ নিজেকে ও অন্যকে প্রকাশ করে মনও তদ্রূপ স্বপ্রকাশ, তাহাও সঙ্গত হয় না; কারণ ঘটাদির ন্যায় দীপ বস্তুত প্রকাশিত হয় না কারণ তাহা পূর্ব্বে অন্ধকারাবৃত হইয়া থাকে না, তমসাবৃত সৎবস্তুর প্রকাশই প্রকাশন। যাহা পূর্ব্বে তমসাবৃত ভাবে ছিল না তাহার প্রকাশন সম্ভব নহে। স্ফটিক যেরূপ নীলত্বাদির জন্য অন্যের (নীল পুষ্পাদির) অপেক্ষা করে নীলত্ব সেরূপ স্বকীয় নীলত্বের জন্য অন্যের অপেক্ষা করে না।

তথা কিঞ্চিৎপরাপেক্ষমনপেক্ষং চ দৃশ্যতে।
অনীলত্বে ন তন্নীলং নীলহেতুর্যথেক্ষতে॥ ২০

২০। এইরূপ কোনবস্তু পরাপেক্ষপ্রকাশযুক্ত এবং কোন বস্তু পরানপেক্ষপ্রকাশযুক্ত দেখা যায়। যেমন নীল যদি অনীল হইত তাহা হইলে নিজেকে নিজে নীল করিতে পারিত না। সুতরাং নীলগুণ পরনিরপেক্ষ। দীপও সেইরূপ পরনিরপেক্ষ প্রকাশ। চিত্তও সেইরূপ পরনিরপেক্ষ প্রকাশ। সুতরাং বিজ্ঞানবাদীর চিত্তের আত্মপ্রকাশ করারূপ মত (যাহাতে ক্রিয়া ও কারকরূপভেদ সূচিত হয়) সিদ্ধান্তবাদীদের দ্বারা নিরাকৃত হইল। মাধ্যমিকদের কূট যুক্তি "পরনিরপেক্ষ প্রকাশ" অর্থে নিজেকে নিজে প্রকাশ নহে, কারণ তাহাতেও কারক ও ক্রিয়া রূপ ভেদ হয়।

। বলা বাহুল্য, বিজ্ঞানবাদী ও মায়াবাদী ইহাদের উভয় মতের কতকটা সত্য। বিজ্ঞানের দ্বারা যেরূপ বিজ্ঞাত হওয়া যায় তাহাই আমাদের জগৎ ইহা বিজ্ঞানবাদের সত্য সিদ্ধান্ত। কিন্তু কেবল একই বিজ্ঞান হইতে স্বগত হেতুতেই যে জগতের জ্ঞান হয় ইহা সত্য নহে। কোন এক বিজ্ঞান ব্যতীত বাহ্য অন্য হেতু থাকাতেই জগদ্রূপ মায়া দেখা যায় ইহা সমীচীন মত। চিত্তের স্বসংবেদন বিষয়ে দীপের দৃষ্টান্ত বা উদাহরণ ঠিক নহে, কারণ দীপ গ্রাহ্য ও চিত্ত গ্রহণশক্তি। সেইরূপ পরনিরপেক্ষ প্রকাশ বলিয়া নীলগুণাদি গ্রাহ্যের দৃষ্টান্ত দিয়া চিত্তের স্বসংবেদনত্বের ব্যাখ্যান করিতে যাওয়াও সঙ্গত নহে।

আমাদের আত্মভাবের মধ্যে সমস্তই নীলাদিগুণের ন্যায় দৃশ্য নহে। দৃশ্য থাকিলে দ্রষ্টাও থাকিবে। চিত্তের উপরিস্থ সেই দ্রষ্টা হইতেই স্বসংবেদন হয় এই সাংখ্যীয় সিদ্ধান্ত ব্যতীত গত্যন্তর নাই।)

দীপঃ প্রকাশত ইতি জ্ঞাত্বা জ্ঞানেন কথ্যতে।

বুদ্ধিঃ প্রকাশত ইতি জ্ঞাত্বেদং কেন কথ্যতে ॥ ২১

২১। দীপের ও বুদ্ধির স্বয়ংপ্রকাশত্ব বিষয়ে যে সাদৃশ্য নাই তাহা পুনশ্চ দেখান হইতেছে। দীপ প্রকাশিত হয়। ইহা জানিয়া জ্ঞানের দ্বারা বলা যায়। বুদ্ধি প্রকাশিত হয় ইহা কিসের দ্বারা জানিয়া বলা যায়?

অর্থাৎ বুদ্ধির স্বসংবেদন নাই কারণ ঘটের যেমন পৃথক্ জ্ঞাতা বুদ্ধি আছে, বুদ্ধির সেইরূপ কিছুই নাই। তাহা পূর্ব্ব জ্ঞানের সহিত জানা যায় না; কারণ, পূর্ব্বজ্ঞান অবিদ্যমান। পরবর্ত্তী জ্ঞানের দ্বারা পূর্ব্বজ্ঞান জানা সম্ভব নহে। কারণ পূর্ব্বজ্ঞান ক্ষণিক সুতরাং পরজ্ঞানের সহিত তাহার সম্বন্ধ থাকিতে পারে না। সহভাবী জ্ঞানের দ্বারাও হইতে পারে না। কারণ অনুপকার হেতু বা কারণকার্য্য ভাব না থাকাতে তাহা বিষয় হইতে পারে না। স্বয়ংও নহে কারণ তাহা বিপ্রতিপন্ন বা প্রমাণহীন। অতএব উহা কিরূপে হয় তাহা (এই মতে) অজ্ঞেয়। (বলা বাহুল্য মাধ্যমিকদের ব্যাখ্যানের গণ্ডীর ভিতর স্বসংবেদন না পড়িলেও স্বসংবেদন যে আছে তাহা সত্য এবং কেন আছে তাহারও কারণ আছে।)

প্রকাশা বাপ্রকাশা বা যদা দৃষ্টা ন কেনচিৎ।

বন্ধ্যাদুহিতৃলীলেব কথ্যমানাপি সা মুধা ॥ ২২

২২। বুদ্ধি প্রকাশাত্মিকা বা অপ্রকাশাত্মিকা তাহা কেহ দেখে নাই সুতরাং বন্ধ্যাদুহিতার লীলার বর্ণনার ন্যায় উহা বলা বৃথা।

যদি নাস্তি স্বসংবিত্তি র্বিজ্ঞানং স্মর্য্যতে কথং।

অন্যানুভূতে সংবন্ধাৎ স্মৃতিরাখুবিষং-যথা ॥ ২৩

২৩। বিজ্ঞানবাদীরা পুনশ্চ শঙ্কা করেন যে যদি বিজ্ঞানের স্বসংবেদন

না থাকে তবে বিজ্ঞানের স্মরণ হয় কি প্রকারে? কারণ অননুভূত বিষয়ের স্মরণ হওয়া সম্ভব নহে। বিজ্ঞানকালে যদি বিজ্ঞানের অনুভব না হইত তবে উত্তরকালে সেই বিজ্ঞানের স্মরণ হইত কিরূপে? অননুভূত বিষয়ের স্মরণ হয় এরূপ বলিলে অতিপ্রসঙ্গদোষ হয় অর্থাৎ স্মরণের কোনও নিয়ম থাকে না।

এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে, জ্ঞান হইতে ভিন্ন যে গ্রাহ্য বিষয় তাহা অনুভূত হইলে জ্ঞানের স্মৃতি হয়। একের অনুভবে অন্যের (অন্য জ্ঞানের) স্মরণ হইতে অতিপ্রসঙ্গ দোষ হওয়ার শঙ্কাও নাই, কারণ স্মরণ অনিয়মে হয় না, পরন্তু সম্বন্ধ হইতেই হয়। বিজ্ঞান গ্রাহকরূপে বিষয়ের সহিত সম্বদ্ধ। পূর্ব্বানুভূত বিষয়ের যখন উত্তরকালে অনুস্মরণ হয় তখন অনুভববিশিষ্ট হইয়াই (সম্বন্ধ হেতু) বিষয়ের স্মরণ হয়। সুতরাং স্মরণের অতিপ্রসঙ্গ বা বিপ্লব ঘটে না। সম্বন্ধ হইতে কার্য্য হওয়ার উদাহরণ মূষিকবিষ। মূষিকের বিষ যেমন সম্বন্ধ হইতে কালান্তরে উৎপন্ন হয় স্মৃতিও সেইরূপ। মূষিক বিষ একক্ষণে কোন শরীরে সংক্রান্ত হইলে পর কালান্তরে মেঘগর্জ্জন অবলম্বন করিয়া উদ্ভূত হয়, স্মৃতিও সেইরূপ।

প্রত্যয়ান্তরযুক্তস্য দর্শনাৎ স্বং প্রকাশতে।
সিদ্ধাঞ্জন বিধের্দৃষ্টো ঘটো নৈবাঞ্জনং ভবেৎ॥ ২৪

২৪। অন্য কারণের সহিত সম্বন্ধজ্ঞান হইতে চিত্তের স্বং বা নিজত্বের জ্ঞান হয়। অর্থাৎ যেমন কোন কারণ দেখিয়া পরচিত্তের জ্ঞান হয় সেইরূপ স্বচিত্তের আলম্বনাদি দেখিয়া স্বচিত্তের জ্ঞান হয়। (বিজ্ঞানবাদীরা এইরূপ বলিলে আমরা বলিব যে) সিদ্ধাঞ্জন বিধিতে ঘট (নিধি) দেখিলে যেমন সেই ঘট সিদ্ধাঞ্জন হয় না সেইরূপ যে সব কারণে স্বচিত্তের জ্ঞান হয় তাহাও স্বচিত্ত হয় না।

(বলা বাহুল্য স্বসংবেদন, যাহাকে Mill এক paradox বলিয়াছেন, কেন হয় তাহা মাধ্যমিক ও বিজ্ঞানবাদীদের theoryর দ্বারা বুঝিবার

সম্ভাবনা নাই। স্বপ্রকাশরূপ এক পদার্থ ব্যতীত উহা বুঝার উপায় নাই ; ঐ স্বপ্রকাশ পদার্থ দৃশ্য পদার্থের অতীত)।

যথা দৃষ্টং শ্রুতং জ্ঞাতং নৈবেহ প্রতিষিধ্যতে।

সত্যতঃ কল্পনা ত্বত্র দুঃখহেতু নিবার্য্যতে ॥২৫

২৫। শঙ্কা হইতে পারে যে জ্ঞান যদি (সিদ্ধাঞ্জনের বা ঘটের ন্যায়) অবিদিত স্বরূপ হয় তবে কোন জ্ঞেয়ই প্রকাশিত হইবে না। দৃষ্ট, শ্রুত, জ্ঞাত ইত্যাদি ব্যবহার লোকে থাকিত না যদি চিত্ত অব্যক্তস্বভাব হইত।

ইহাতে বক্তব্য এই "দৃষ্টশ্রুতাদি ব্যবহার হইত না" যে বলা হয় তাহা পরমার্থত কি সংবৃতিত ? যদি পরমার্থত নাই বল তবে তাহা আমাদেরও (মাধ্যমিকদেরও) অভিমত কারণ সংবৃতের পরমার্থ চিন্তায় অবতার নাই (আসে না)। আর যদি বল যে লোকপ্রসিদ্ধিতে ঐরূপ ব্যবহার হয় তাহাও আমাদের অভিমত। কারণ, দৃষ্ট-শ্রুত-জ্ঞাত যাহা যেরূপ হয় তাহার আমরা প্রতিষেধ করি না। উহারা যে সত্য বা পারমার্থিক এরূপ কল্পনাই আমরা প্রতিষেধ করি। কারণ তাহা দুঃখের হেতু।

(স্বসংবেদন যে আছে বিজ্ঞানবাদীদের এই মত সত্য, কিন্তু তাহা যে স্বপ্রকাশ নহে ও দৃশ্য, মাধ্যমিকদের এই মতও সত্য। কিন্তু স্বসংবেদনরূপ সংবৃতি কিরূপে হয় তাহা কেহ বুঝান না। সংবৃতি বা অবিদ্যামূলক জ্ঞান "একেকে অন্য জ্ঞানা" তাহা গ্রন্থকারও বলিয়াছেন। সুতরাং সংবৃতির জন্য দুই পদার্থ থাকা চাই। স্বসংবেদন সংবৃত হইলে উহা স্বপ্রকাশ পদার্থের উপর প্রকাশ্য পদার্থের আরোপ হইবে অথবা প্রকাশ্য বুদ্ধির উপর স্বপ্রকাশ পদার্থের আরোপ হইবে। সুতরাং স্বপ্রকাশ দ্রষ্টা ও প্রকাশ্য দৃশ্য এই দুই পদার্থ ব্যতীত স্বসংবেদন বুঝার গত্যন্তর নাই।)

চিত্তাদন্যা ন মায়া চেন্নাপানন্যেতি কল্প্যতে।

বস্তু চেৎ সা কথং নান্যাঽনন্যা চেন্নাস্তি বস্তুতঃ ॥২৬

২৬। প্রাসঙ্গিক কথা সমাপন করিয়া পুনশ্চ প্রকৃত বিষয় বলিতেছেন।

মায়া যদি চিত্ত হইতে অন্য না হয় তবে তাহাকে চিত্ত হইতে অনন্য কল্পনা করিতে হইবে। যদি মায়া বস্তু হয় তবে তাহা চিত্ত হইতে অন্য হইবে না কেন? আর যদি তাহা চিত্ত হইতে অনন্য হয় তবে তাহা বস্তুত নাই ·

অসত্যপি যথা মায়া দৃশ্যা দ্রষ্টৃ তথা মনঃ।

বস্ত্বাশ্রয়শ্চেৎ সংসারঃ সোঽন্যথাকাশবদ্ভবেৎ ॥২৭

২৭। মায়া অসতী হইলেও যেমন তাহা দৃশ্য হয়, মনও সেইরূপ পরমার্থত অসৎ-স্বভাব হইলেও দ্রষ্টা বা দর্শনসমর্থ হয় (ইহাতে ৯।১৫ শ্লোকোক্ত শঙ্কা নিরসিত হইল। অর্থাৎ যদি ভ্রান্তিই না থাকে—মায়া বলিয়া—তবে মায়া কিসের দ্বারা উপলব্ধ হয় এই শঙ্কা)। পরমত লক্ষ্য করিয়া পুনশ্চ বলিতেছেন সংসারকে যদি চিত্তরূপ বস্তুর আশ্রিত পদার্থ বল তবে তাহা চিত্তভিন্ন—সুতরাং অবস্তু হইবে (কারণ বিজ্ঞানবাদে চিত্তই একমাত্র বস্তু)। যেমন আকাশ বাঙ্মাত্র সৎ, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে অসৎ, সুতরাং অর্থক্রিয়াকারিত্ব-হীন পদার্থ, সংসারও সেইরূপ হইবে।

বস্ত্বাশ্রয়েণাভাবস্য ক্রিয়াবত্ত্বং কথং ভবেৎ।

অসৎ সহায়মেকং হি চিত্তমাপদ্যতে তব ॥২৮

২৮। যদি বল সংসার অবস্তু হইলেও চিত্তরূপ বস্তুর আশ্রিত বলিয়া তাহার অর্থ-ক্রিয়াসামর্থ্য হইবে—ইহাও যুক্ত নহে; কারণ বস্তুর আশ্রয়ের দ্বারা অভাবের কিরূপ ক্রিয়াবত্তা সিদ্ধ হইতে পারে (শক্তিই ভাব, আর সর্ব্বশক্তির বিরহ = অভাব)।

গ্রাহ্যমুক্তং যদা চিত্তং তদা সর্ব্বে তথাগতাঃ।

এবং চ কো গুণো লব্ধশ্চিত্তমাত্রেঽপি কল্পিতে ॥২৯

২৯। চিত্ত গ্রাহ্যগ্রাহকআদি আকার-বিনির্ম্মুক্ত অদ্বয় লক্ষণ। কথিত হয় যে এইরূপ চিত্তের একত্বপ্রতিপাদনে আমাদের কোন ক্ষতি হয় না। তাহা সত্য নহে, কারণ সংক্লেশ-(রাগাদি মল) রূপ প্রহেয় চিত্তাংশ থাকাতে চিত্ত এক কিরূপে হয়? আর যদি গ্রাহ্যগ্রাহক নির্ম্মুক্ত অদ্বয়স্বভাব চিত্ত—

এরূপ বল তবে সেই চিত্ত সর্ব্বগত হওয়াতে সমস্ত সত্ত্বেরাই তথাগত বা বুদ্ধ হইত। সর্ব্বগত অদ্বয়স্বভাব চিত্তমাত্র বা বিজ্ঞপ্তিমাত্রকল্পনা করিয়াই বা কি সুবিধা হয়? সর্ব্ব প্রাণীতে সংক্লেশ ত বর্ত্তমান আছেই ইহার প্রহাণ না করিলে নির্ব্বাণ হয় না, সুতরাং সর্ব্বগত চিত্তমাত্রকল্পনায় লাভ কি? (এই "অদ্বয়স্বভাব বিজ্ঞপ্তিমাত্র" আর্যদের "চৈতন্যের" অনুরূপ। বৌদ্ধদের সম্প্রদায়বিশেষ চৈতন্যপদার্থও যে গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা ইহা হইতে জানা যায়। এক বৌদ্ধ সম্প্রদায় আত্মবাদীও ছিল)।

মায়োপমত্বেঽপি জ্ঞাতে কথং ক্লেশো নিবর্ত্ততে।
যদা মায়াস্ত্রিয়াং রাগস্তৎকর্ত্তুরপি জায়তে ॥ ৩০

৩০। অদ্বয়স্বভাব চিত্তকল্পনায় কোন লাভ নাই এরূপ যদি বলা যায় তবে সেই বাদীরা বলিতে পারেন যে জগতের মায়োপমত্ব জানিয়াই বা কিরূপে ক্লেশের নিবৃত্তি হয়। কারণ দেখা যায় যে মায়ানির্ম্মিত স্ত্রী আদিতেও রাগাদি উৎপন্ন হয়। শুদ্ধ যে মায়ার দর্শকদের রাগাদি উৎপন্ন হয় এরূপ নহে পরন্তু যে মায়া দেখায় তাহারও তাহাতে রাগাদি উৎপন্ন হয়।

অপ্রহীণা হি তৎকর্ত্তুর্জ্ঞেয়সংক্লেশ বাসনা।
তদ্দৃষ্টি কালে তস্যাতো দুর্ব্বলা শূন্যবাসনা ॥ ৩১

৩১। মায়াবীর মায়াস্ত্রীতে রাগ উৎপন্ন হওয়ার কারণ আছে তাই হয়। তাহার সংক্লেশ বাসনাঅপ্রহীণ থাকা এবং শূন্যবাসনা দুর্ব্বল থাকাই সেই কারণ। ইহা পূর্ব্বোক্ত শঙ্কার উত্তর।

শূন্যতা-বাসনাধানাদ্ধীয়তে ভাববাসনা।
কিংচিন্নাস্তীতি চাভ্যাসাৎ সাপি পশ্চাৎ প্রহীয়তে ॥৩২

৩২। শূন্যতাবাসনা (সমস্ত মায়াস্বভাব ও নিঃস্বভাব এরূপ জ্ঞানের সংস্কার) আহিত হইলে ভাববাসনা নষ্ট হয়। তৎপরে কিছু নাই এরূপ ভাবের অভ্যাসের দ্বারা শূন্যবাসনাও নষ্ট হয়।

যদা ন লভ্যতে ভাবো যো নাস্তীতি প্রকল্প্যতে।
তদা নিরাশ্রয়োঽভাবঃ কথং তিষ্ঠেন্মতেঃ পুরঃ ॥ ৩৩

৩৩। কিরূপে শূন্যবাসনা নষ্ট হয় তাহা বলিতেছেন—যে ভাবপদার্থ নাই বলিয়া প্রকল্পিত হয় (শূন্যতা ধ্যানকালে) তাহা (ভাবপদার্থ) যখন উপলব্ধ না হয় তখন নিরাশ্রয় অভাব কিরূপে বুদ্ধির অগ্রে থাকিবে?

এই শূন্যতা যে অত্যন্তাভাব নহে তাহা দ্রষ্টব্য। কিছু নাই (যথা রূপশূন্য, বেদনাশূন্য ইত্যাদি) এরূপ মনোভাব বিশেষই এই শূন্যতা বা শূন্যতাবুদ্ধি। ফলত ইহা পারিভাষিক শূন্যতা; প্রকৃত পক্ষে কিন্তু ইহা মনোভাববিশেষ। আর্য দার্শনিকেরা উহাকে ভাবপদার্থ (ধ্যেয়) বলিয়া সংজ্ঞিত করাতে গোল হয় না। বৌদ্ধ শাস্ত্রে উহার অভাববাচক সংজ্ঞা থাকাতে অনেক গোল হয়। কোন কোন বৌদ্ধ সম্প্রদায় শূন্যতাকে অভাব কল্পনা করিয়া ন্যায়সঙ্গত ভাষার দার্শনিক সিদ্ধান্ত করিতে সক্ষম হন না। মাধ্যমিকেরা বলেন শূন্যতা মনসিকার বিশেষ। ভাবাভিনিবেশের প্রহাণের জন্য সর্ব্বধর্ম্মশূন্যতা উপাদেয় (গ্রাহ্য)। শূন্যতাভিমুখতা সিদ্ধ হইলে সেই শূন্যতাও ত্যাজ্য। তাহাতে যে ভাবকল্পনা থাকে তাহাও তৎপরবর্ত্তী বিচারের দ্বারা নিবর্ত্তিত হয়। অতএব শূন্যতা ভাবনাও ভাবকল্পনা। প্রাচীনতর যোগশাস্ত্রমতে পরবৈরাগ্যের দ্বারা চিত্তকে অন্তর্মুখ করিয়া বিষয় হইতে নিবৃত্ত করিলে বিষয়াভাবে চিত্ত নিরুদ্ধ হয়। বৌদ্ধেরা ইহাই ভিন্ন (কিন্তু অসঙ্গত) ভাষায় বুঝাইবার চেষ্টা করেন।

যদা ন ভাবো নাভাবো মতেঃ সংতিষ্ঠতে পুরঃ।
তদান্যগত্যভাবেন নিরালম্বা প্রশাম্যতি ॥ ৩৪

৩৪। যখন ভাব বা অভাব বুদ্ধির অগ্রে থাকে না তখন অন্য গতির অভাবে বুদ্ধি নিরালম্বা হইয়া প্রশমিত বা নিবৃত্ত বা নিরুদ্ধ হয়। (ইহা এবিষয়ে সার কথা। ভাব অর্থে রূপাদি স্কন্ধ। অভাব অর্থে "উহারা

নাই” এরূপ মনসিকার। তাহাতে বিষয়গ্রহণ রুদ্ধ হয় কিন্তু ভাবের যে অভাব হয় না তাহা দ্রষ্টব্য। ইহাই যুক্ততম সাংখ্যমত।)

চিন্তামণিঃ কল্পতরুর্যথেচ্ছা পরিপূরণঃ।
বিনেয় প্রণিধানাভ্যাং জিনবিম্বং তথেক্ষ্যতে ॥ ৩৫

৩৫। চিন্তামণি (চিন্তিত ফলদাতা রত্ন) ও কল্পতরু যেমন ইচ্ছার পূর্ণতাকারক সেইরূপ জিনদের মূর্তিও বিনেয় (শিষ্যত্ব) ও প্রণিধির (বোধিসত্ত্বাবস্থায় প্রাণীদের হিতসংকল্পের) বশে সত্ত্বদের সর্ব্ব কামনার নিষ্পাদন করিতে সমর্থ হয়। অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত সংকল্পহীন শূন্যতাভাবনায় জিনদের চিত্ত সমাহিত থাকিলে কিরূপে তাঁহাদের দ্বারা অভীষ্টলাভ হয় তাহার উত্তর দেওয়া হইল।

যথা গারুড়িকঃ স্তম্ভং সাধয়িত্বা বিনশ্যতি।
স তস্মিংশ্চির নষ্টেঽপি বিষাদীনুপশাময়েৎ ॥ ৩৬
বোধিচর্য্যানুরূপ্যেণ জিনস্তম্ভোঽপি সাধিতঃ।
করোতি সর্ব্বকার্য্যাণি বোধিসত্ত্বেঽপি নির্বৃতে ॥ ৩৭

৩৬।৩৭। যেমন কোন গারুড়িক বা বিষবৈদ্য মন্ত্রাভিসংস্কৃত করিয়া এক স্তম্ভ স্থাপন করিয়া যায় এবং পরে সে উপরত বা মৃত হইলেও দীর্ঘকাল সেই স্তম্ভ বিষাদির উপশান্তি করিতে থাকে সেইরূপ বোধিসত্ত্বেরা বোধিচর্য্যারূপ মন্ত্র সাধনের দ্বারা জিনরূপ স্তম্ভ (জিনেরাও কর্ম্মহীনত্ব হেতু নির্জীব স্তম্ভের ন্যায়) স্থাপিত করেন; তাহাতে সেই বোধিসত্ত্বেরা নির্বৃত হইলেও সেই জিনস্তম্ভ সর্ব্বকার্য্য (সংসৃতি বিষোপশম) সাধন করে।

অচিত্তকে কৃতা পূজা কথং ফলবতী ভবেৎ।
তুল্যৈব পদ্যতে যস্মাত্তিষ্ঠতো নির্বৃতস্য চ ॥ ৩৮

৩৮। অচিত্তক বুদ্ধকে পূজা করিলে কিরূপে সেই পূজা ফলবতী হয়? কারণ শাস্ত্রে জীবিত ও পরিনির্বৃত (মৃত) উভয়রূপ বুদ্ধকে পূজা করিলে তুল্যফল হয় বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

পুণ্য দ্বিবিধ ত্যাগান্বয় ও পরিভোগান্বয়। দাতার ত্যাগজনিত পুণ্য হয় আর দত্তদ্রব্য বুদ্ধাদিরা পরিভোগ করিলে তজ্জনিত পুণ্যও হয়। সুতরাং পরিনির্বৃত বুদ্ধের উদ্দেশ্যে দান করিলে ত্যাগান্বয় পুণ্য অবশ্যই হইবে।

আগমাচ্চ ফলং তত্র সংবৃত্যা তত্ত্বতোঽপি বা।

সত্যবুদ্ধে কৃতা পূজা সফলেতি কথং যথা ॥৩৯

৩৯। ভগবানের পূজাতে যে ফল হয় তাহা সংবৃতিত ও পরমার্থত উভয় প্রকারেই হয় এবং তাহা আগম হইতে জানা যায়। পরমার্থসৎ বুদ্ধের পূজা করিলে সফল হয় অতএব স্থিত (জীবিত) বা পরিনির্বৃত (মৃত) ভগবান্ যেরূপ হউন না কেন তাহার পূজাতে কাহারও সংবৃত ফল কাহারও বা পারমার্থিক ফল হয়। আগমে আছে যে "তিষ্ঠন্তং পূজয়েদ্যস্তু যশ্চাপি পরিনির্বৃতং। সমচিত্ত প্রসাদেন নাস্তি পুণ্য বিশেষতা ॥"

সত্যদর্শনতো মুক্তিঃ শূন্যতাদর্শনেন কিং।

ন বিনানেন মার্গেণ বোধিরিত্যাগমো যতঃ ॥৪০

৪০। বৈভাষিকেরা শূন্যতাবাসনা ধ্যানের দ্বারা সর্ব্বাবরণের প্রহাণ হয় এরূপ স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন যে চারিটী আর্য্য সত্য (দুঃখ, দুঃখসমুদয়, দুঃখমুক্তি ও দুঃখমুক্তির পথ এই চারি আর্য্য সত্য) ভাবনা করিলেই মুক্তি হয়। শূন্যতা দর্শন করিয়া কি হয়? এতদুত্তরে বলি যে শূন্যতা ভাবনারূপ ঐ মার্গ ব্যতীত যে বোধি উৎপন্ন হয় না তাহা আগম বলেন। প্রজ্ঞা-পারমিতাদি মহাযান শাস্ত্রে শূন্যতা ভাবনার সবিশেষ উপদেশ আছে। আর সেই প্রজ্ঞাপারমিতাই মোক্ষমার্গ বলিয়া কথিত হইয়াছে যথা—বুদ্ধৈঃ প্রত্যেকবুদ্ধৈশ্চ শ্রাবকৈশ্চ নিষেবিতা। মার্গস্ত্বমেকা মোক্ষস্য নাস্ত্যন্য ইতি নিশ্চয়ঃ।

নন্বসিদ্ধং মহাযানং কথং সিদ্ধস্ত্বদাগমঃ।

যস্মাদুভয় সিদ্ধোঽসৌ ন সিদ্ধোঽসৌ তবাদিতঃ ৪১

৪১। ইহাতে বিরুদ্ধবাদীরা বলেন যে মহাযানই অসিদ্ধ, অতএব

আপনারা যে আগমকে প্রমাণ দেন তাহাও সিদ্ধ নহে। কেন সিদ্ধ নহে, মহাযানেরা এই প্রশ্ন করিলে প্রতিবাদীরা বলেন বা বলিবেন যে আমাদের আগম যখন আমাদের ও মহাযানদের উভয়ের নিকট বুদ্ধ-বচন বলিয়া সিদ্ধ, তখন আমাদের আগমই সিদ্ধ। মহাযানে আমাদের আস্থা নাই, সুতরাং তাহা উভয়ত সিদ্ধ আগম নহে। তদুত্তরে আমরা বলি যে যদি উভয়ত সিদ্ধতাই আগমের সত্যতার লক্ষণ হয় তবে আদিতে যখন 'উভয়' ছিল না তখন তোমাদের আগম কিরূপে যথার্থাগম হইয়াছিল ?

যৎপ্রত্যয়া চ তত্রাস্থা মহাযানেঽপি তাং কুরু।
অন্যোভয়েষ্ট সত্যত্বে বেদাদেরপি সত্যতা ॥ ৪২

৪২। যন্নিবন্ধন নিজের আগমে আস্থা মহাযানেও তাদৃশ আস্থা কর্ত্তব্য। অস্মদুভয়ের যাহা ইষ্ট নহে তাহাই যদি সত্য হয় তবে বেদাদিরও সত্যতা হইবে।

সবিবাদং মহাযানমিতি চেদাগমং ত্যজ।
তীর্থিকৈঃ সবিবাদত্বাৎ স্বৈঃ পরৈশ্চাগমান্তরং ॥ ৪৩

৪৩। যদি বল যে আমার আগম যে বুদ্ধ-বচন তদ্বিষয়ে বিবাদ নাই, কিন্তু মহাযান সেরূপ নহে। এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে মহাযান সবিবাদ বলিয়া ত্যাজ্য হইলে তোমার নিজের আগমও ত্যাগ কর। কারণ তীর্থিক-দের (অন্যান্য দার্শনিকদের) এমন কি স্বসম্প্রদায়স্থদের নিকটও তোমার আগম সবিবাদ বলিয়া শুদ্ধ মহাযান কেন, অন্য সব আগমই ত্যাগ কর।

শাসনং ভিক্ষুতামূলং ভিক্ষুতৈব চ দুঃস্থিতা।
সাবলম্বনচিত্তানাং নির্ব্বাণমপি দুঃস্থিতং ॥ ৪৪

৪৪। যাঁহারা বলেন "সত্যদর্শনতোমুক্তিঃ শূন্যতা দর্শনেন কিং" তাঁহা-দের মত খণ্ডনার্থ বলিতেছেন—ভগবানের শাসনের (বিধিনিষেধের দেশ-নার) মূল যে ভিক্ষুতা তাহা সালম্বন চিত্তদের হয় না। পরন্তু সালম্বনচিত্ত-

ব্যক্তিদের পক্ষে নির্ব্বাণও দুর্ঘট অতএব অবলম্বনহীন শূন্যতা দর্শনই মুক্তির হেতু।

ক্লেশ প্রহাণান্মুক্তিশ্চেত্তদনন্তরমস্তু সা।
দৃষ্টং চ তেষু সামর্থ্যং নিঃক্লেশস্যাপি কর্ম্মণঃ॥ ৪৫

৪৫। আর্য্য সত্যদর্শন হইতে ক্লেশপ্রহাণ, ক্লেশ প্রহাণের পর মুক্তি, এরূপ মত যুক্ত হয় না, কারণ প্রহীণক্লেশ ব্যক্তিদেরকে অক্লিষ্টকর্ম্মের ফল-ভোগ করিতে হয়। উদাহরণ যথা মৌদ্গল্যায়ন। তিনি অর্হৎ হইলেও পূর্ব্ব কর্ম্মের ফলে মারিত হইয়াছিলেন।

তৃষ্ণা তাবদুপাদানং নাস্তি চেৎ সংপ্রধার্য্যতে।
কিমক্লিষ্টাপি তৃষ্ণৈষাং নাস্তি সম্মোহবৎসতী॥ ৪৬

৪৬। যদি বল আর্য্যসত্যদর্শন হইতে অবিদ্যাদির নাশ হয়, তন্নাশে সংস্কার নষ্ট হয়, সংস্কার নাশে তৃষ্ণা নষ্ট হয়; তৃষ্ণাই পুনর্ভবের কারণ সুতরাং তৃষ্ণা না থাকিলে পুনর্জ্জন্ম হইতে পারে না। অতএব আর্য্য সত্যদর্শনই মুক্তির কারণ শূন্যতা দর্শন মোক্ষ কারণ নহে। এতদুত্তরে বক্তব্য এই—যদি বল তাদৃশ মুক্ত পুরুষের পুনর্ভবের উপাদানভূতা তৃষ্ণা নাই, তাহাও ঠিক হয় না। কারণ সাবলম্বনচিত্ত ব্যক্তিদের তৃষ্ণাভাব ঘটা সম্ভব নহে। জিজ্ঞাসা করি আপনাদের ঐ মুক্তপুরুষের অক্লিষ্টীভূত অজ্ঞানের (সংমোহের) ন্যায় অক্লিষ্টা তৃষ্ণাও কি নাই?

বেদনা-প্রত্যয়া তৃষ্ণা বেদনৈষাং চ বিদ্যতে।
সালম্বনেন চিত্তেন স্থাতব্যং যত্র তত্র বা॥ ৪৭

৪৭। তৃষ্ণা বেদনাসম্ভবা আর উক্ত যোগীদের বেদনা বর্ত্তমান থাকে সুতরাং তৃষ্ণাও থাকে। যদি বল নিরবিদ্য ব্যক্তির বেদনা হইলেও তৃষ্ণা হয় না কিন্তু ভাবাভিনিবিষ্টদের নিরবিদ্যত্বও অসিদ্ধ নহে—তথাপি ন্যায়বলে শূন্যতাধ্যান বিহীন ব্যক্তিতে তৃষ্ণার সদ্ভাব সিদ্ধ হয়।

যখন মুক্ত সন্তানেও (মুক্তচিত্তবৃত্তি প্রবাহেও) কর্ম্মের ফলদানে সামর্থ্য

দেখা যায়, এবং বেদনা থাকিলে যখন তৃষ্ণাও থাকে, তখন সালম্বন চিত্তদের ক্লেশপ্রহাণ হওয়া সন্দেহস্থল সুতরাং বিমুক্তিও অনিশ্চিত।

শূন্যতাদর্শন-হীনদেরকে সালম্বনচিত্তে যে-কোন বিষয়ে অবস্থান করিতে হয়। আর্য্যসত্য এবং তাহার ভাবনাফল আদি আলম্বনে আসঙ্গ থাকাতে নির্ব্বাণ লাভ তাঁহাদের পক্ষে সন্দেহ স্থল হইয়া দাঁড়ায়।

বিনা শূন্যতয়া চিত্তং বদ্ধমুৎপদ্যতে পুনঃ।
যথাসংজ্ঞি সমাপত্তৌ ভাবয়েত্তেন শূন্যতাং॥ ৪৮ *

৪৮। অতএব শূন্যতা বিনা চিত্ত বদ্ধ থাকে, সুতরাং পুনশ্চ উৎপন্ন হয়; যেমন অসংজ্ঞি সমাপত্তিতে চিত্ত দীর্ঘকাল নিরুদ্ধ থাকিয়াও পুনঃ উৎপন্ন হয়, সেইরূপ। অতএব শূন্যতাকে ভাবনা করিবে।

সক্তিত্রাসান্ত নির্ম্মুক্ত্যা সংসারে সিধ্যতি স্থিতিঃ।
মোহেন দুঃখিনামর্থে শূন্যতায়া ইদং ফলং॥ ৪৯

৪৯। আসক্তিস্থান ও ভয়স্থান (শাশ্বতদৃষ্টি ও উচ্ছেদ দৃষ্টি) পরিত্যাগ করিয়া, দুঃখী প্রাণীদের কল্যাণার্থ অবিদ্যা আশ্রয় করিয়া সংসারে স্থিতি হয়—ইহাই শূন্যতার ফল।

* নিম্নস্থ শ্লোকত্রয় এই স্থানে প্রক্ষিপ্ত দৃষ্ট হয়। ইহারা ৯।৪২ শ্লোকের পর থাকিলে অপ্রাসঙ্গিক হইত না। টীকাকার ইহাদের প্রক্ষিপ্ততা সম্বন্ধে কয়েকটী হেতুও দিয়াছেন।

যৎসূত্রেঽবতরেদ্বাক্যং তচ্চেদ্বুদ্ধোক্তমিষ্যতে।
মহাযানং ভবৎ সূত্রৈঃ প্রায়স্তুল্যং ন কিং মতং॥ ১
একেনাগম্যমানেন সকলং যদি দোষবৎ।
একেন সূত্রতুল্যেন কিং ন সর্ব্বং জিনোদিতং॥ ২
মহাকাশ্যপমুখ্যৈশ্চ যদ্বাক্যং নাবগাহ্যতে।
তত্ত্বয়ানববুদ্ধত্বাদগ্রাহ্যং কঃ করিষ্যতি॥ ৩

অর্থাৎ দুঃখী প্রাণীদের প্রতি কারুণ্যবশে সংসারে থাকিলেও শূন্যতা ভাবনার দ্বারা সংসারদোষে লিপ্ত হইতে হয় না।

তদেবং শূন্যতাপক্ষে দূষণং নোপপদ্যতে।
তস্মান্নির্বিচিকিৎসেন ভাবনীয়ৈব শূন্যতা॥ ৫০

৫০। এইরূপে শূন্যতাপক্ষে দূষণ ঘটে না। অতএব সংশয় রহিত-চিত্তে শূন্যতা ভাবনা করা কর্ত্তব্য।

ক্লেশজ্ঞেয়াবৃতিতমঃ প্রতিপক্ষো হি শূন্যতা।
শীঘ্রং সর্ব্বজ্ঞতাকামো ন ভাবয়তি তাং কথং॥ ৫১

৫১। ক্লেশরূপ ও জ্ঞেয় বিষয়রূপ যে আবরণ সেই আবরণরূপ তমর বা অজ্ঞানের শূন্যতাই হচ্ছে প্রতিপক্ষ। যাঁহারা শীঘ্র সর্ব্বজ্ঞতা লাভে ইচ্ছু তাঁহারা কেন শূন্যতা ভাবনা করেন না?

যদ্দুঃখজননং বস্তু ত্রাসস্তস্মাৎ প্রজায়তাং।
শূন্যতা দুঃখশমনী ততঃ কিং জায়তে ভয়ং॥ ৫২

৫২। যে বস্তু দুঃখের জনক তাহাই ভয়জনক হয়। শূন্যতা দুঃখ-শান্তিকারী অতএব তাহাতে ভয় কোথায়?

যতস্ততো বাস্তু ভয়ং যদ্যহং নাম কিংচন।
অহমেব ন কিংচিচ্চেদ্ভয়ং কস্য ভবিষ্যতি॥ ৫৩

৫৩। যদি 'আমি' বলিয়া কিছু থাকে তবেই ভয় (যেরূপে আগত হউক না কেন) হইতে পারে। 'আমি' যখন 'কিছু নহে' হইয়া যায় তখন কাহার ভয় হইবে?

দন্তকেশনখা নাহং নাস্থি নাপ্যস্মি শোণিতং।
ন শিংঘানং ন চ শ্লেষ্মা ন পূয়ং লসিকাপি বা॥ ৫৪

৫৪। দন্ত, নখ, কেশ, অস্থি, শোণিত, শিংঘান (শিকৃনী), শ্লেষ্মা, পূয় ও লসিকা ইহার কিছুই আমি নহি।

নাহং বসা ন চ স্বেদো ন মেদোঽন্ত্রাণি নাপ্যহং।
ন চাহমন্ত্রনির্গুণ্ডী গূথমূত্রমহং ন চ॥ ৫৫

৫৫। বসা, স্বেদ, মেদ, অন্ত্র, অন্ত্রনির্গুণ্ডী (সূক্ষ্ম অন্ত্রস্থ নাড়ী), বিষ্ঠা বা মূত্র ইহার কিছুই আমি নহি।

নাহং মাংসং ন চ স্নায়ু নোষ্মাবায়ুরহং ন চ।
ন চ ছিদ্রাণ্যহং নাপি ষড়্‌বিজ্ঞানানি সর্ব্বথা॥ ৫৬

৫৬। মাংস, স্নায়ু, উষ্মা, বায়ু, ছিদ্র (দেহগত) ও ছয় বিজ্ঞানও (চক্ষু, শ্রোত্র, ঘ্রাণ, জিহ্বা, কায়ও মন হইতে জাত বিজ্ঞান) সর্ব্বথা আমি নহি।

এইরূপে অহং প্রত্যয় নির্বিষয় দেখা যায়। অতএব অহংপ্রত্যয় মূলহীন শূন্য। ইহাই শূন্যাত্মবাদের যুক্তি। বলা বাহুল্য এই যুক্তি সদোষ। শরীর যে প্রকৃত অহং পদার্থ নহে তাহা প্রায় সর্ব্ববাদীরাই বলেন। শব্দাদি বিজ্ঞানও যে অহং নহে তাহাও সত্য। কিন্তু তাহা ছাড়া আত্মবিজ্ঞানও আছে। সেই আত্মবিজ্ঞানই অহং। অহং-প্রত্যয়ের অতিরিক্ত এক আত্মভাব থাকাতেই সেই আত্মবিজ্ঞান হইতে পারে। নচেৎ একস্বরূপ আত্মবিজ্ঞান ('আমি জ্ঞাতা', এতদ্‌রূপ) হয় কিরূপে? শরীরাদি যখন স্পষ্টতই অহং নহে এবং তাহারা যখন বহু, তখন অবিভাজ্য একস্বরূপ অহম্বোধ হয় কেন, বৌদ্ধেরা তাহার উত্তর দিতে পারেন না। যদি বলা যায় যে উহা ভ্রান্তি তাহাতেও বৌদ্ধবাদ নষ্ট হয়। কারণ ভ্রান্তি = এক পদার্থে অন্যের আরোপ। তাহা ছাড়া কোন ভ্রান্তি নাই। আত্মস্থলে কিসের উপর কিসের আরোপ হইবে? অবশ্যই বলিতে হইবে অনাত্মার উপর আত্মার আরোপ বা আত্মার উপর অনাত্মার আরোপ। সুতরাং আত্মা ও অনাত্মা নামক দুই সত্তার স্বীকার ব্যতীত গত্যন্তর নাই। তন্মধ্যে অনাত্মভাব = শরীরাদি জড় বিকারশীল দৃশ্যভাব। প্রকৃতআত্মভাব সুতরাং

প্রকৃত প্রস্তাবে উহার বিপরীত বা নির্বিকার চিদ্রূপ দ্রষ্টৃভাব। ইহাই নির্গুণ আত্মবাদীদের সিদ্ধান্ত।

টীকাকার এস্থলে নৈয়ায়িক আদি অনেক দার্শনিকদের মত উদ্ধৃত করিয়াছেন ও গ্রন্থকারের উক্তির দ্বারা তাহা খণ্ডন করার প্রয়াস পাইয়াছেন। বলা বাহুল্য পরের মত যাহা উদ্ধৃত হইয়াছে তাহা প্রায়ই প্রকৃত নহে। সাংখ্য সম্বন্ধে টীকাকার এইরূপ বলিয়াছেন—কাপিলেরা নিত্য, ব্যাপক, নির্গুণ, স্বচৈতন্যাত্মক, অকর্ত্তা, ভোক্তা আত্মা স্বীকার করেন। প্রকৃতিই কর্ত্রী ও ফলনেত্রী! বিপর্য্যাসেই পুরুষে কর্ত্তৃত্বাদি আরোপিত হয়। ইহা মন্দ কথা নহে; কিন্তু পরে বলিয়াছেন যে—"যখন পুরুষের শব্দাদি বিষয়ভোগের ঔৎসুক্য হয় তখন প্রকৃতি তাহা জানিয়া পুরুষের সহিত সংযুক্তা হয় ও তদনন্তর শব্দাদি সর্গ করে" ইত্যাদি। অমনা পুরুষের ঔৎসুক্য এবং জড়া প্রকৃতির তাহা জানা যে সাংখ্যমত নহে পরন্তু তাহা যে আলোক-অন্ধকারের ন্যায় বিরুদ্ধ, তাহা বলা বাহুল্য।

বৌদ্ধদের ধারণা এই—ছয় বিজ্ঞান যে আত্মা নহে তাহা সহন করিতে না পারিয়া সাংখ্যাদিরা বলেন যে আমরা শব্দাদি বিজ্ঞানকেই চিদাত্মক আত্মা বলি।

বস্তুত সাংখ্যাদি নির্গুণবাদীরা কুত্রাপি শব্দাদি বিজ্ঞানকে আত্মা বলেন না। আত্মাকে বিজ্ঞানের বা বুদ্ধির অতিরিক্ত পদার্থ বলেন। উক্ত ভ্রান্ত ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া গ্রন্থকার নিম্নে সেই মতের খণ্ডন করিতেছেন।

> শব্দজ্ঞানং যদি তদা শব্দো গৃহ্যেত সর্ব্বদা।
> জ্ঞেয়ং বিনা তু কিং বেত্তি যেন জ্ঞানং নিরুচ্যতে ॥ ৫৭

৫৭। যদি আত্মা শব্দজ্ঞানাত্মক হয় (এবং তোমাদের মতে তাহা নিত্য বলিয়া), তবে শব্দ সর্ব্বদাই গৃহীত হইতে থাকিবে। (এতদুত্তরে আত্মবাদীরা বলিতে পারেন, শব্দজ্ঞান সর্ব্বদা না থাকিলেও আত্মবিজ্ঞান

সর্ব্বদা থাকে তাহা কদাপি নিরুদ্ধ হয় না)। পরন্তু শব্দাদি বিষয় সর্ব্বদা থাকে না দেখা যায়, কিন্তু যদি বল যে জ্ঞান নিত্যই উপস্থিত থাকে, তবে বলি সেই জ্ঞানের জ্ঞেয় না থাকাতে তাহা কি জানে? জ্ঞেয়াভাবে জ্ঞান কিরূপে নিরূপিত হইতে পারে? (ইহা সত্য বটে, কিন্তু আত্মবাদীরা বাহ্যবিষয়জ্ঞান ও আত্মজ্ঞান এই দ্বিবিধ জ্ঞান স্বীকার করেন। বাহ্যবিষয় না থাকিলেও আত্মজ্ঞান থাকে, কদাপি জ্ঞান যায় না বা নির্বিষয় জ্ঞান হয় না। আত্মবিষয়ক বিজ্ঞানের কদাপি—যতদিন বিজ্ঞান থাকে—অভাব হয় না, আত্মবিজ্ঞানের বিষয় আত্মা নিজেই; তাই তাহাকে স্বপ্রকাশ বলিতে হয়)।

অজানানং যদি জ্ঞানং কাষ্ঠং জ্ঞানং প্রসজ্যতে।
তেনাসংনিহিতজ্ঞেয়ং জ্ঞানং নাস্তীতি নিশ্চয়ঃ ॥ ৫৮

৫৮। (জ্ঞেয়াভাবে) কিছু না জানিলেও যদি জ্ঞান হয় বল তবে কাষ্ঠও এক জ্ঞান হয়। অতএব জ্ঞেয়হীন জ্ঞান নাই ইহা নিশ্চয়।

তদেব রূপং জানাতি তদা কিং ন শৃণোত্যপি।
শব্দস্যাসংনিধানাচ্চেত্তস্তজ্ জ্ঞানমপ্যসৎ ॥ ৫৯

৫৯। শব্দজ্ঞান যদি আত্মা হয়, তবে তাহা রূপগ্রহণ করিতে পারিবে না। আর তাহা যদি রূপ গ্রহণ করে তবে তাহা শ্রবণ করিবে না। যদি বল শব্দের অসন্নিধান হেতু শব্দ গৃহীত হয় না, (তবে বলি) সেই কালের শব্দজ্ঞান অসৎ অর্থাৎ তাহা শব্দজ্ঞানই নহে।

(বলা বাহুল্য সাংখ্যাদিরা শব্দজ্ঞানকে আত্মা বলেন না, আর শব্দজ্ঞান যে রূপজ্ঞান হয় এরূপও বলেন না। জ্ঞানশক্তি বা বুদ্ধি শব্দাদি বিষয়যোগে তাহা প্রকাশ করে ইহাই স্পষ্টত তাঁহাদের দ্বারা স্বীকৃত হয়)।

শব্দগ্রহণরূপং যত্তদ্রূপ-গ্রহণং কথং।
একঃ পিতা চ পুত্রশ্চ কল্প্যতে ন তু তত্ত্বতঃ ॥৬০

৬০। যাহা 'শব্দ গ্রহণ' তাহা কিরূপে 'রূপ গ্রহণ' হইতে পারে?

"পিতা ও পুত্র একই" এরূপ কথা কেবল কল্পিত মাত্র, ইহা তাত্ত্বিক কথা নহে।

সত্ত্বং রজস্তমো বাপি ন পুত্রো ন পিতা যতঃ।
শব্দগ্রহণযুক্তস্তু স্বভাবস্তস্থ নেক্ষ্যতে ॥৬১

৬১। সত্ত্ব, রজ বা তম এই (সাংখ্যসম্মত) ত্রিগুণ যখন স্বস্বভাবে অবস্থিত তখন তাহারা পিতাও নহে পুত্রও নহে। তাহাদের শব্দগ্রহণযুক্ত স্বভাব দেখা যায় না। (ইহাও গুণত্রয় সম্বন্ধে ভ্রান্তি। সত্ত্ব প্রকাশশীল, রজ ক্রিয়াশীল ও তম স্থিতিশীল। শব্দাদি সমস্ত ভাবেই ঐ তিন স্বভাব লক্ষিত হয়। বলয় কুণ্ডলাদিতে পরিণত সুবর্ণে যেমন সুবর্ণস্বভাব থাকে, কার্য্যসমূহে সেইরূপ গুণত্রয়েরও প্রকাশাদি স্বভাব থাকে। সাংখ্যেরা 'পিতা পুত্র' এই উপমা ব্যবহার করিয়া থাকিলে ঐ অর্থেই করিয়াছেন)।

তদেবান্যেন রূপেণ নটবৎ সোঽপ্যশাশ্বতঃ।
স এবান্যস্বভাবশ্চেদপূর্ব্বেয়ং তদেকতা ॥৬২

৬২। যদি বল নট যেমন এক হইলেও ভিন্ন ভিন্ন রূপে অবতীর্ণ হয়, শব্দজ্ঞানও সেইরূপ রূপাদিজ্ঞানরূপে প্রাদুর্ভূত হয়। তাহা বলিলে সেই শব্দজ্ঞানরূপ আত্মা অশাশ্বত বা অনিত্য হইবে। (সাংখ্যাদিরাও তাহাই বলেন। শব্দাদিজ্ঞান প্রাকৃত ভাব ও তাহারা অনিত্য। তাহা আত্মা নহে)। আর যদি বল সেই শব্দজ্ঞান এক হইলেও তাহার ভিন্ন ভিন্ন স্বভাব উৎপন্ন হয়—তাহা হইলে বলি যে তাহার সেই একতা অপূর্ব্ব পদার্থ।

অন্যদ্রূপমসত্যং চেন্নিজং তদ্রূপমুচ্যতাং।
জ্ঞানতা চেত্ততঃ সর্ব্বপুংসামৈক্যং প্রসজ্যতে ॥৬৩

৬৩। যদি বল আত্মার যে বিষয়োপাধিক রূপ তাহা অসত্য এবং তাহার নিজরূপই সত্য, তবে আত্মার জ্ঞানতামাত্র স্বরূপ হয়। তাহাতে সর্ব্ব পুরুষের ঐক্য আসিয়া পড়ে। (ইহাও দোষাবহ নহে, সর্ব্বপুরুষের মাত্র জাতিগত ঐক্য আছে)।

চেতনাচেতনে চৈক্যং তয়োর্যেনাস্তিতা সমা।
বিশেষশ্চ যদা মিথ্যা কঃ সাদৃশ্যাশ্রয়স্তদা ॥ ৬৪

৬৪। কিঞ্চ, চেতন (পুরুষ) ও অচেতন (প্রকৃতি) এই দুই পদার্থের অস্তিতা নামক সমান ধর্ম্ম থাকাতে উহারা দুইই এক হয়। তাহাদের ভেদ বা বিশেষ যখন মিথ্যা, তখন তাহাদের সাদৃশ্য কোথায়? বিশেষই সাদৃশ্যের আশ্রয়; যেমন গো-সদৃশ গবয়, এস্থলে গোত্ববিশেষই গবয়ের সাদৃশ্যের আশ্রয়। গ্রন্থকারের মতে চেতনাচেতনের ভেদ যখন মিথ্যা তখন তাহাদের সাদৃশ্য নাই, সুতরাং চেতনের অস্তিতা নাই।

(কিন্তু চেতনাত্মবাদীরা চেতন ও অচেতনের বা দ্রষ্টা ও দৃশ্যের প্রকৃত ভেদ দেখান। অস্তিতাবিষয়ে সমান হইলেও দ্রব্যের ভেদ থাকিতে পারে। অশ্বও অস্তি, শৃগালও অস্তি, অতএব অশ্ব = শৃগাল, এরূপ ন্যায়াভাস গ্রন্থকারের সিদ্ধান্তে আসে)।

অচেতনশ্চ নৈবাহমাচৈতন্যাৎ পটাদিবৎ।
অথ জ্ঞ শ্চেতনা যোগাদজ্ঞো নষ্টঃ প্রসজ্যতে ॥ ৬৫

৬৫। চেতনাত্মবাদীদের মত নিরাস করিয়া অচেতনাত্মবাদীদের (গ্রন্থকারের মতে নৈয়ায়িকাদি—যাহারা আত্মাকে অচেতন ও চেতনাযোগে চেতন বলেন তাঁহাদের) মত নিরাস করিতেছেন।

"আমি" (অহং) পটাদিবৎ অচেতন নহে, আচৈতন্য হেতু (আচৈতন্য = অচৈতন্যের ভাব বা অচেতনতা)। অর্থাৎ ঘটপটাদি যেরূপ অচেতন, কর্ম্মকর্তৃত্বাদিযুক্ত বলিয়া আত্মা সেরূপ হইতে পারেন না। যদি বল যে আত্মা অচেতন হইলেও চেতনাযোগে বা বুদ্ধিযোগে জ্ঞ বা চেতন হন তাহাও সঙ্গত নহে, কারণ মদ-মূর্চ্ছাবিস্থায় যখন চেতনা নিবৃত্ত হয়, তখন চেতন আত্মা নষ্ট হইয়া যাইবে। (নৈয়ায়িকেরা এতদুত্তরে বলিতে পারেন মূর্চ্ছাবিস্থাতেও চেতনার সম্যক্ নিবৃত্তি হয় না)।

অথাবিকৃত এবাত্মা চৈতন্যেনাস্য কিং কৃতং।
অজ্ঞস্য নিষ্ক্রিয়স্যৈবমাকাশস্যাত্মতা মতা ॥ ৬৬

৬৬। আর আত্মা যদি অবিকারী হন, তবে চৈতন্যযোগে তাঁহার কি হয়? অর্থাৎ সদা অচেতন ও অবিকারী আত্মার বুদ্ধিযোগে চেতনতারূপ বিকার হওয়া সম্ভব নহে।

এইরূপে অজ্ঞ, নিষ্ক্রিয়, আকাশকল্প পদার্থের আত্মতা আসিয়া পড়ে।

ন কর্ম্মফলসম্বন্ধো যুক্তশ্চেদাত্মনা বিনা।
কর্ম্মকৃত্বা বিনষ্টেহি ফলং কস্য ভবিষ্যতি ॥ ৬৭

৬৭। যদি বল যে আত্মা-বিনা কর্ম্মফলসম্বন্ধ সিদ্ধ হয় না, কারণ কর্ম্ম করিয়া মৃত হইলে পরলোকগামী এক আত্মা না থাকিলে কাহার সেই কর্ম্মের ফলভোগ হইবে?

দ্বয়োরপ্যাবয়োঃ সিদ্ধে ভিন্নাধারে ক্রিয়াফলে।
নির্ব্ব্যাপারশ্চ তত্রাত্মেত্যত্র বাদো বৃথা ননু ॥ ৬৮

৬৮। আমরাও (বৌদ্ধেরাও) কর্ম্মের ঐরূপ ফল স্বীকার করি। কিঞ্চ আমাদের উভয়ের মতে কর্ম্মফল ভিন্নাধারে (দেহান্তরে) সিদ্ধ হয়। কিন্তু আত্মবাদ ও নৈরাত্ম্যবাদের মধ্যে আত্মবাদে আত্মা নির্ব্বিকার নিষ্ক্রিয় ও নির্ব্ব্যাপার। নির্ব্ব্যাপার পদার্থের দ্বারা কর্ম্মফলসিদ্ধি অসম্ভব বলিয়া আত্মবাদ বৃথা। (নৈয়ায়িকেরা বলিতে পারেন বুদ্ধিযুক্ত আত্মাই পরলোকে যায় সুতরাং কর্ম্মফল সিদ্ধি কেবল মাত্র নির্ব্ব্যাপার পদার্থের দ্বারা হয় না পরন্তু যাদৃশ পদার্থের দ্বারা কর্ম্ম কৃত হয় তাদৃশ পদার্থেই তাহার ফলভোগ হয়)।

হেতুমান্ ফলযোগীতি দৃশ্যতে নৈষ সম্ভবঃ।
সন্তানস্যৈক্যমাশ্রিত্য কর্ত্তা ভোক্তেতি দেশিতং ॥ ৬৯

৬৯। আত্মা না থাকিলে কৃতকর্ম্মের বিপ্রণাশ ও অকৃতের অভ্যাগম হয় এই যে আপত্তি হয়, তদুত্তরে বক্তব্য যে—হেতুমান্ দ্রব্যই (কর্ম্মকর্ত্তা)

যে ফলযোগী (ফলভাগী) হয় সেইরূপ নিয়ম নাই। কারণ, একজন মৃত হয় আর অন্য ব্যক্তি পরলোকাদিতে উৎপন্ন হইয়া ফলভোগ করে। (স্থূল-শরীর সম্বন্ধে ইহা ঠিক বটে কিন্তু প্রকৃত ব্যক্তি যে অন্তঃকরণ তৎসম্বন্ধেই মতভেদ। বৌদ্ধেরা নিম্নলিখিত ভাবে উহা বুঝান)।

সন্তানের অর্থাৎ পঞ্চস্কন্ধরূপ ধর্ম্ম সকলের পূর্ব্বাপর ক্রমে প্রবাহের একত্ব আশ্রয় করিয়া "এক কর্ত্তা" "এক ভোক্তা" এরূপ একত্ব ভগবান্ প্রকাশ করিয়াছেন * (৮।৯৮ শ্লোক দ্রষ্টব্য)। ক্ষণে ক্ষণে নিরোধশীল ও উদয়-শীল ধর্ম্মসন্তানই আত্মা। সেই সন্তানের এক অংশে কর্ম্মাচরণ হয় আর অন্যাংশে ফলভোগ হয়। "যস্মিন্নেব হি সন্তানে আহিতা কর্ম্ম-বাসনা। ফলং তত্রৈব বধ্নাতি কর্পাসে রক্ততা যথা"। কিন্তু এই উদাহরণ একাত্ম-বাদীর প্রতিজ্ঞাকে অধিকতর দৃঢ় করে। তাঁহারা বলিবেন যে কার্পাস পূর্ব্বাপর একই দ্রব্য থাকে। রক্ততা তাহাকে আশ্রয় করিয়া উৎপন্ন হয় বা নিরুদ্ধ হয়।

অতীতানাগতং চিত্তং নাহং তদ্ধি ন বিদ্যতে।
অথোৎপন্ন মহং চিত্তং নষ্টেঽস্মিন্নাস্ত্যহং পুনঃ ॥৭০

৭০। চিত্ত অতীত অনাগত ও বর্ত্তমান। তন্মধ্যে অতীত ও অনাগত চিত্ত যথাক্রমে নষ্ট ও অজাত সুতরাং অহং তাহা নহে। আর বর্ত্তমান চিত্ত

* "অহমেব তদাপীতি মিথ্যেয়ং পরিকল্পনা। অন্যএব মৃতো যস্মাদ্ অন্য-এব প্রজায়তে ॥" বৌদ্ধমতে আত্মা স্কন্ধ বা সমূহ মাত্র। এমন এক আত্ম-ভাব নাই যাহা ইহলোক হইতে পরলোকে গমন করে। পূর্ব্ব ক্রম সকল নিরুদ্ধ হইয়া অভিনব বা ভিন্ন ভিন্ন ক্রম সকল পর পর ক্ষণে উৎপন্ন হইতেছে সুতরাং তন্মতে আত্মা প্রতিক্ষণে অভিনব বা ভিন্ন। 'এক ব্যক্তি' অর্থে বৌদ্ধ দৃষ্টিতে ভিন্ন ভিন্ন উদীয়মান ও লীয়মান ক্রম সমূহের সন্তান বা প্রবাহ মাত্র।

যদি অহং হয় তবে তাহা নষ্ট হইলে আর পুনঃ অহং থাকিবে না। (কিঞ্চ নাশ অর্থে অভাব নহে কিন্তু অবস্থান্তর, সুতরাং অহং অবস্থান্তরে থাকে বলিতে হইবে)।

যথৈব কদলীস্তম্ভো ন কশ্চিদ্ভাগশঃ কৃতঃ।
তথাহমপ্যসদ্ভূতো মৃগ্যমাণো বিচারতঃ॥ ৭১

৭১। যেমন কদলীস্তম্ভকে বিভক্ত করিলে কিছুই থাকে না সেইরূপ বিচারপূর্ব্বক অন্বেষণ করিলে অহং-ভাবও অসদ্ভূত হয়। (এখানেও ন্যায়-দোষ আছে। কদলীস্তম্ভ বিভক্ত হইলে কতকগুলি সৎপদার্থে বিভক্ত হয়, অহং-প্রত্যয়ও সেইরূপ দ্রষ্টা ও দৃশ্যরূপ মৌলিক সৎপদার্থে বিভক্ত হয়। সুতরাং তাহার অসত্তা বাঙ্‌মাত্র)।

যদি সত্ত্বো ন বিদ্যেত কস্যোপরি কৃপেতি চেৎ।
কার্য্যার্থমভ্যুপেতেন যো মোহেন প্রকল্পিতঃ॥৭২

৭২। আত্মপ্রতিষেধ-বিষয়ে অন্য বাধক নিবারণ করিতেছেন। যদি বলা যায় যে সত্ত্ব বা প্রাণী যদি না থাকে তবে কাহার উপর কৃপা করা যায় (সত্ত্বের প্রতি কৃপা বোধিসত্ত্বদের সাধন ইহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে)। এতদুত্তরে বলি—কার্য্যের বা পুরুষার্থের জন্য স্বীকৃত ও মোহের (সংবৃতির দ্বারা প্রকল্পিত যে সত্ত্ব) তাহারই উপর কৃপা করা যায়।

কার্য্যং কস্য ন চেৎ সত্ত্বঃ সত্যমীহা তু মোহতঃ।
দুঃখব্যুপশমার্থং তু কার্য্যমোহো ন বার্য্যতে॥৭৩

৭৩। যদি সত্ত্ব না থাকে তবে কাহার সেই পুরুষার্থরূপ কার্য্য? অর্থাৎ কাহারও নহে। ইহা সত্য বা আমাদেরও অভিমত। আর পুরুষার্থ সাধনে যে ঈহা বা চেষ্টা হয় তাহা মোহবশেই হয়। (কাহার মোহ এবং মোহহীন কে তাহার উত্তর নাই)। দুঃখের উপশমের জন্য কার্য্যগত মোহ বা দুঃখোপগমের জন্য আবশ্যকীয় মোহ বারিত হয় না।

দুঃখহেতুরহংকার আত্মমোহাত্তু বর্দ্ধতে।
ততোঽপি ন নিবর্ত্ত্য শ্চেৎ বরং নৈরাত্ম্যভাবনা ॥ ৭৪

৭৪। কার্য্যমোহের ন্যায় আত্মমোহও বারিত কর না কেন?—দুঃখ-হেতু যে অহংকার তাহা আত্মমোহ হইতে বর্দ্ধিত হয় বলিয়া তাহা করি না। যখন আত্মমোহের দ্বারা অহংকার নিবর্ত্তিত করা সাধ্য নহে, তখন নৈরাত্ম্যভাবনাই শ্রেয়। (কিন্তু আত্মমোহ ব্যতীত দুঃখনিবৃত্তির চেষ্টা হওয়াও সম্ভব নহে, এমন কি নৈরাত্ম্যভাবনাও আত্মমোহ বিশেষ। যেমন সংকল্পের নিরোধ "নিরোধ করিব" এইরূপ এক সংকল্পের দ্বারা হয় সেইরূপ অহংকারও অন্য এক অহংকারের (আমি শূন্য এতদ্রূপ কল্পনাত্মক) দ্বারা নিবর্ত্তিত হয়)।

কায়ো ন পাদৌ ন জঙ্ঘা নোরূ কায়ঃ কটি র্ন চ।
নোদরং নাপ্যয়ং পৃষ্ঠং নোরো বাহূ ন চাপি সঃ ॥ ৭৫
ন হস্তৌ নাপ্যয়ং পার্শ্বৌ ন কক্ষৌ নাংসলক্ষণঃ।
ন গ্রীবা ন শিরঃ কায়ঃ কায়োঽত্র কতরঃ পুনঃ ॥ ৭৬
যদি সর্ব্বেষু কায়োঽয়মেকদেশেন বর্ত্ততে।
অংশা অংশেষু বর্ত্তন্তে স চ কুত্র স্বয়ং স্থিতঃ ॥ ৭৭

৭৫-৭৬-৭৭। নৈরাত্ম্য দেখাইয়া কায়ের অনিত্যতা-স্মৃতির বিষয় বলিতেছেন। পাদদ্বয়, জঙ্ঘা, উরুদ্বয়, কটি, উদর, পৃষ্ঠ, উরঃ, বাহুদ্বয়, হস্তদ্বয়, পার্শ্বদ্বয়, কক্ষদ্বয়, অংস, গ্রীবা ও শির এই সকল অঙ্গের মধ্যে কোন্‌টা কায়?

যদি বল যে এসকলের অবয়বের মধ্যে একদেশ ব্যাপ্ত করিয়া কায় বর্ত্তমান আছে তাহাও ঠিক নহে কারণ অংশ সকলই অংশে বর্ত্তমান আছে, উহার মধ্যে কায় নিজে কোথায় আছে?

সর্ব্বাত্মনা চেৎ সর্ব্বত্র স্থিতঃ কায়ঃ করাদিষু।
কায়াস্তাবন্ত এব স্যুর্যাবন্তস্তে করাদয়ঃ ॥ ৭৮

৭৮। আর যদি বল করাদি সমস্ত অঙ্গের সর্ব্বাত্মায় কায় অবস্থিত আছে তাহা হইলে করাদি যত সংখ্যক, কায়ও তত সংখ্যক।

নৈবান্ত র্ন বহিঃ কায়ঃ কথং কায়ঃ করাদিষু।

করাদিভ্যঃ পৃথগ্ নাস্তি কথং নু খলু বিদ্যতে॥ ৭৯

৭৯। অতএব কায়, করাদির অন্তরে বা বাহিরে নাই, আর করচরণাদি হইতে পৃথক্‌ও নাই, অতএব কায় কোথায় আছে?

তন্নাস্তি কায়মোহাত্তু কায়বুদ্ধিঃ করাদিষু।

সন্নিবেশবিশেষেণ স্থাণৌ পুরুষবুদ্ধিবৎ॥ ৮০

৮০। সেইহেতু কায় বলিয়া কিছু নাই। মোহবশতই করাদিতে কায়বুদ্ধি হয়। যেমন সন্নিবেশবিশেষে স্থাণুতে পুরুষবুদ্ধি হয় কায়-বুদ্ধিও তদ্বৎ।

(বলা বাহুল্য এই যুক্তি অসমীচীন। ইহা নৈরাত্ম্যবাদের প্রমাণরূপে ব্যবহৃত হয়। সমষ্টির সঙ্কেতীকৃত নামই কায়। যদি করচরণাদি নাম না থাকিত, বা কেহ উহা না জানে, তাহা হইলে বা তাহার কাছে এই শব্দময় যুক্তি থাকিত না। আত্মবাদীরাও অহংভাবের সর্ব্বাংশকে আত্মা বলেন না। মনবুদ্ধি আদিকে মনবুদ্ধিই বলেন। কিন্তু অহংভাবের অন্ত-তম মূল পদার্থকেই আত্মা বলেন। উক্ত যুক্তির উত্তরে বলা যাইতে পারে যে সুবর্ণবলয়ের লতাপাতা আদি অবয়বের মধ্যে যেমন এক সুবর্ণই সত্য, অন্য সব মিথ্যা, তেমনি অহংভাবের মধ্যেও প্রকৃতিপুরুষই সত্য অন্যসব মোহকল্পিত ভেদমাত্র। পরন্তু ঐ যুক্তি উল্টাইয়া বলা যাইতে পারে যে করচরণাদিরা কায় ছাড়া কিছুই নহে। করচরণাদির ভেদ মোহকল্পিত, মাত্র কায়ই সত্য। মোহইবা কোথা আছে)।

যাবৎ প্রত্যয়সামগ্রী তাবৎ কায়ঃ পুমানিব।

এবং করাদৌ সাংযাবত্তাবৎকায়োঽত্র দৃশ্যতে॥ ৮১

৮১। যাবৎকাল প্রত্যয়ের (বিপর্য্যস্তবুদ্ধিরূপ হেতুর) সামগ্রী বা

সমবধান, তাবৎকাল কাষ্ঠ বা স্থাণু মানুষের মত প্রতীত হয়; সেইরূপ করাদিতে যতকাল প্রত্যয় সামগ্রী থাকে তত্কাল তাহা কায় বলিয়া কল্পিত হয়।

এবমঙ্গুলিপুঞ্জত্বাৎ পাদোঽপি কতরো ভবেৎ।
সোঽপি পর্ব্বসমূহত্বাৎ পর্ব্বাপি স্বাংশভেদতঃ॥ ৮২

৮২। শঙ্কা হইতে পারে অঙ্গসমবায় যে দেহ তাহা সত্য না হইলেও অঙ্গসকল সত্য দ্রব্য। তদুত্তরে বলিতেছেন—পূর্ব্বোক্ত ন্যায়ে পাদও অঙ্গুলিপুঞ্জ, সুতরাং কিছু নহে। অঙ্গুলিপুঞ্জও পর্ব্বসমষ্টি, সুতরাং কিছু নহে; পর্ব্বসকলও স্বাংশভেদে ভিন্ন হইলে কিছুই হয় না।

অংশা অপ্যণুভেদেন সোঽপ্যণুর্দিগ্বিভাগতঃ।
দিগ্বিভাগো নিরংশত্বাদাকাশং তেন নাস্ত্যণুঃ॥ ৮৩

৮৩। সেই পর্ব্বাংশসকল অণুভেদে বিভক্ত হইলে কিছুই হয় না; অণুসকলও দিগ্বিভাগে বিভক্ত হয় (বৌদ্ধমতে অণু ষড়ংশ)। দিগ্বিভাগ নিরংশ বলিয়া তাহা আকাশ বা শূন্য, সুতরাং অণুও নাই।

*(এই যুক্তির ন্যায়দোষ অঙ্কের দ্বারাও দেখান যায়। কোন পরিমাণকে যতই ভাগ করনা, সর্ব্বদাই কিছু না কিছু থাকিবে। কোটিভাগ শতকোটি ভাগ, কোটি কোটি ভাগ ইত্যাদি কিছু না কিছু হইবেই হইবে, কারণ সংখ্যার সীমা নাই। সুতরাং এইরূপে শূন্য প্রমাণ করিতে যাওয়া ব্যর্থ প্রয়াস। পরন্তু পরমাণুবাদীরা পরমাণুকেই নিরংশ বলেন। পরমাণুর অংশ দিক্ ইহা গ্রন্থকার বলিয়াছেন, আবার দিক্‌কে শূন্য বলিয়াছেন, সুতরাং তাঁহার বলা হইল পরমাণুর অংশ শূন্য বা পরমাণু = অংশশূন্য অর্থাৎ পরমাণুর আর অংশ নাই। ফলত এরূপ বিচার একটী চিরন্তন ন্যায়দোষ)।

এবং স্বপ্নোপমে রূপে কো রজ্যেত বিচারকঃ।
কায়শ্চৈবং যদা নাস্তি তদা কা স্ত্রী পুমাংশ্চ কঃ॥ ৮৪

৮৪। এই হেতু স্বপ্নোপম রূপে কোন্ বিচারক ব্যক্তি অনুরক্ত হই-বেন? কায়ই যখন নাই তখন কে পুরুষ কেই বা স্ত্রী? (দেহটা শূন্য এরূপ প্রমেয় না হইলেও উহা যে অবয়বসমষ্টি এরূপ চিন্তা করিয়া তাহাতে রাগ উঠাইয়া ফেলিবার চেষ্টা করা সমীচীন প্রথা। ইহার নাম কায়স্মৃত্যুপস্থান)।

যদ্যস্তি দুঃখং তত্ত্বেন প্রহৃষ্টান্ কিং ন বাধতে।
শোকাদ্যার্ত্তায় মৃষ্টাদি সুখং চেৎ কিং ন রোচতে॥ ৮৫

৮৫। অতঃপর বেদনা-স্মৃত্যুপস্থান কথিত হইতেছে। বেদনা=সুখ, দুঃখ ও অদুঃখাসুখ।

দুঃখ যদি তাত্ত্বিকভাব হয় তবে প্রহৃষ্টদের তাহা বাধিত করে না কেন? আর মৃষ্টাদি (সুরস অন্নপানাদি) যদি সুখ হয় তবে শোকাদির দ্বারা আর্ত্ত ব্যক্তিদের তাহা ভাল লাগে না কেন?

বলীয়সাভিভূতত্বাত্তদি তন্নানুভূয়তে।
বেদনাত্বং কথং তস্য যস্য নানুভবাত্মতা॥ ৮৬

৮৬। যদি বল বলীয় অন্য ভাবের দ্বারা অভিভূত হওয়াতেই সে-ক্ষেত্রে সুখ দুঃখ অনুভূত হয় না, তবে বলি যাহার অনুভবাত্মতা নাই তাহার বেদনাত্ব কোথায়?

অস্তি সূক্ষ্মতয়া দুঃখং স্থৌল্যং তস্য হৃতং ননু।
তুষ্টিমাত্রাঽপরা চেৎস্যাত্তস্মাৎসাঽপ্যস্য সূক্ষ্মতা॥ ৮৭

৮৭। যদি বলা যায় যে তখন দুঃখ সূক্ষ্মভাবে থাকে আর তাহার স্থৌল্য তখন অপগত হয় তাহাও ঠিক নহে, কারণ তখন তুষ্টির মাত্রা যদি অল্প হয় তাহা হইলে তাহা সুখেরই সূক্ষ্মতা দুঃখের নহে।

বিরুদ্ধপ্রত্যয়োৎপত্তৌ দুঃখস্যানুদয়ো যদি।
কল্পনাভিনিবেশো হি বেদনেত্যাগতং ননু॥ ৮৮

৮৮। সুখকালে দুঃখ হয় না কেন, তদুত্তরে যদি বলা যায় যে তখন

বিরুদ্ধ প্রত্যয়ের বা হেতুর উৎপাদ হইতেই দুঃখ হয় না, তাহা হইলে বলিতে হইবে যে সুখাদি বেদনা কেবল কল্পনার দ্বারা অভিনিবেশ মাত্র। দুঃখ উপস্থিত হইলেও যদি তদ্বিরুদ্ধ হেতুতে অভিনিবিষ্ট হওয়া যায়, তবে দুঃখ কোন এক বেদনাই হয় না। সুখ সম্বন্ধেও সেই নিয়ম।

অতএব বিচারোঽয়ং প্রতিপক্ষোঽস্য ভাব্যতে।
বিকল্প-ক্ষেত্রসম্ভূত-ধ্যানাহারা হি যোগিনঃ ॥ ৮৯

৮৯। অতএব এই সিদ্ধান্ত আসিতেছে যে বেদনা যখন অভিনিবেশ-স্বভাব তখন সেই সুখাদি অভিনিবেশের প্রতিপক্ষ ভাবনা করিলে তাহা নিরাকৃত হইতে পারে। এইজন্য যোগীরাও কল্পনাসম্ভূত ধ্যানে অভি-নিবিষ্ট হইয়া অভীষ্টকাল প্রীতিসুখ অনুভব করিয়া বর্ত্তমান থাকেন। তাদৃশ কল্পনীয় বিষয়ের ধ্যানাহারেই তাঁহারা জীবিত থাকেন বলা যাইতে পারে।

সান্তরাবিন্দ্রিয়ার্থৌ চেৎ সংসর্গঃ কুত এতয়োঃ।
নিরন্তরত্বেঽপ্যেকত্বং কস্য কেনাস্তু সঙ্গতিঃ ॥ ৯০

৯০। বেদনা বিষয়েন্দ্রিয়ের সম্পর্কজনিত, সেই মিলন যে অসম্ভব, সুতরাং বেদনা যে কিছুই নহে, তাহা দেখাইতেছেন। ইন্দ্রিয় ও বিষয় যদি অন্তরালযুক্ত হয় তবে তাহাদের মিলন অসম্ভব। আর তাহারা যদি নিরন্তর (অন্তরালহীন) হয়, তবে তাহারা এক, অতএব কাহার সহিত কাহার মিলন হইবে?

নাণোরণৌ প্রবেশোঽস্তি নিরাকাশঃ সমশ্চ সঃ।
অপ্রবেশে ন মিশ্রত্বমমিশ্রত্বে ন সঙ্গতিঃ ॥ ৯১

৯১। পরমাণু নিরংশ, সুতরাং তাহাদের সংসর্গ যুক্তিযুক্ত হইতে পারে এই মত নিরাকরণ করিতেছেন। অণুর মধ্যে অণুর প্রবেশ হওয়া সম্ভব নহে, কারণ তাহা অচ্ছিদ্র বা নিরাকাশ এবং সম বা নিম্নোন্নততাহীন তুল্য। অতএব অণুর ভিতর অণুর প্রবেশ না ঘটিলে তাহাদের মিশ্রত্ব ঘটে না, সুতরাং সংসর্গও ঘটে না।

নিরংশস্য চ সংসর্গঃ কথং নামোপপদ্যতে।
সংসর্গে চ নিরংশত্বং যদি দৃষ্টং নিদর্শয় ॥ ৯২

৯২। পরন্তু নিরংশের সহিত সংসর্গ কিরূপে সিদ্ধ হইতে পারে? দুই দ্রব্যের সংসর্গ আছে অথচ তাহারা নিরংশ এরূপ যদি দেখিয়া থাক তবে উদাহৃত কর।

বিজ্ঞানস্য ত্বমূর্ত্তস্য সংসর্গো নৈব যুজ্যতে।
সমূহস্যাপ্যবস্তুত্বাত্তথা পূর্ব্বং বিচারিতং ॥ ৯৩

৯৩। বিজ্ঞান পদার্থ অমূর্ত্ত, তাহার সহিত সংসর্গ হওয়া যুক্তিযুক্ত নহে। অতএব বিষয়, ইন্দ্রিয় ও বিজ্ঞানের সংসর্গে বেদনা হয় ইহা ঠিক নহে। পরন্তু ঐ তিনের সংঘাতও অবস্তু, কারণ পূর্ব্বে (৯।৮৬) বিচারিত হইয়াছে যে সমূহ অবস্তু।

(স্থূল ইন্দ্রিয়ের সহিত রূপাদির সংসর্গ প্রত্যক্ষত দেখা যায়। ইন্দ্রিয়-গোলকের সহিত বিজ্ঞান কিরূপে সম্বদ্ধ তাহা উক্তরূপ পরমাণু কল্পনা করিয়া বুঝা যাইতে না পারে কিন্তু তাহাদের সংসর্গ স্বীকার না করিলে চলে না। অভিনিবেশ বলিলেও সংসর্গ আসে। সাংখ্যমতে গ্রহণ ও গ্রাহ্য উভয়ই অভিমানাত্মক। ঐ প্রথাতেই উহা বুঝা যায়)।

তদেবং স্পর্শনাভাবে বেদনাসম্ভবঃ কুতঃ।
কিমর্থময়মায়াসঃ বাধা কস্য কুতো ভবেৎ ॥ ৯৪

৯৪। এইরূপে স্পর্শের অভাবে বেদনা কিরূপে সিদ্ধ হয়? অতএব সুখের প্রাপ্তির ও দুঃখের পরিহারের জন্য এই প্রয়াস কেন? আর কাহার (বেদক আত্মা নাই বলিয়া) কি হইতে (উপঘাতহেতু দুঃখও কিছু নয় বলিয়া) বাধা হয়?

যদা ন বেদকঃ কশ্চিদ্বেদনা চ ন বিদ্যতে।
তদাবস্থামিমাং দৃষ্ট্বা তৃষ্ণে কিং ন বিদীর্য্যসে ॥ ৯৫

৯৫। যখন কেহ বেদক নাই আর বেদনাও যখন নাই তখন হে

তৃষ্ণে ! এবংবিধ অবস্থা (নিজের জন্ম হেতুর শূন্যতারূপ অবস্থা) দেখিয়া তুমি বিদীর্ণ হওনা কেন ? [বিরুদ্ধবাদী এস্থলে বলিতে পারে তৃষ্ণাও যে নাই তাহা আবার "বিদীর্ণ হবে" কিরূপে ? কিঞ্চ 'বিদীর্ণতাও' নাই 'হওয়াও' নাই। ফলতঃ এইরূপ মায়াবাদে সবই অসৎ, কিন্তু প্রয়োজনানুরোধে কোনটাকে একবার সৎ ধরিয়া অপর কোনওটাকে অসৎ ধরিয়া বলাতে ঐ বাদটা প্রলাপবৎ হইয়া উঠে। বেদক, বেদনা ও তৃষ্ণা এই তিনের সত্তা বা অসত্তা সমান। তিনই নাই অতএব বিদীর্ণ কে হবে ? হয় এরূপ বল (অথবা তাহাও বলা ব্যর্থ), না হয় বল তিনই আছে। ইহার মধ্যে তৃষ্ণানাশ কর্ত্তব্য, বিষয়াভিনিবেশ নাশে বেদনা যায় ইত্যাদি কথা সমীচীন। কিন্তু এই যে মায়াবাদ নামক দৃষ্টি অনুসারে উহা সাধন করিতে বলা হইয়াছে সেই বাদটা সমীচীন নহে]।

দৃশ্যতে স্পৃশ্যতে চাপি স্বপ্নমায়োপমাত্মনা।
চিত্তেন সহজাতত্বাদ্বেদনা তেন নেক্ষ্যতে। ৯৬

৯৬। স্বপ্নমায়োপম চিত্তের দ্বারা বিষয় দৃষ্ট ও স্পৃষ্ট হয়। কারণ তাহা চিত্তের সহিতই উৎপন্ন হয়। অতএব বেদনা বস্তুত নাই।

পূর্ব্বং পশ্চাচ্চ জাতেন স্মর্য্যতে নানুভূয়তে।
স্বাত্মানং নানুভবতি ন চান্যেনানুভূয়তে॥ ৯৭

৯৭। পূর্ব্ববেদনা পশ্চাজ্জাত জ্ঞানের দ্বারা স্মরণ করা যায় কিন্তু অনুভব (সাক্ষাৎ জ্ঞান) করা যায় না (তৎকালে অবিদ্যমান হেতু)। বেদনা নিজেকে অনুভব করে না (স্বসংবেদন সিদ্ধ নহে বলিয়া) এবং অন্য কেহও অনুভব করেনা। অতএব বেদনা স্মরণমাত্র সুতরাং অসৎ (স্মরণটা অসৎ কেন ? তাহার উত্তর নাই)।

ন চাস্তি বেদকঃ কশ্চিদ্বেদনাতো ন তত্ত্বতঃ।
নিরাত্মকে কলাপেঽস্মিন্ ক এব বাধ্যতেঽনয়া॥৯৮

৯৮। বেদক বলিয়া কেহ নাই সুতরাং বেদন তত্ত্বত নাই। এ

আত্মহীন কলাপে (পঞ্চস্কন্ধরূপে) কে বেদনার দ্বারা বাধিত হইবে? ফলতঃ সুখদুঃখাদি বেদনা কিছু নহে, ব' শূন্যস্বভাব সুতরাং তাহাতে উদ্বিগ্ন হওয়া অকর্ত্তব্য এইরূপ স্মৃতির উপস্থানই সাধ্য বেদনাস্মৃত্যুপস্থান।

নেন্দ্রিয়েষু ন রূপাদৌ নান্তরালে মনঃস্থিতং।
নাপ্যন্তর্ন বহিশ্চিত্তমন্যত্রাপি ন লভ্যতে ॥৯৯

৯৯। অতঃপর চিত্তস্মৃত্যুপস্থান বলা যাইতেছে। মন ইন্দ্রিয়গণে নাই রূপাদিতে নাই কিম্বা ইন্দ্রিয় ও বিষয়ের অন্তরালেও নাই। অন্তরে ও বাহিরে বা অন্য কোথাও চিত্ত পাওয়া যায় না।

যন্ন কায়ে ন চান্যত্র ন মিশ্রং ন পৃথক্ কচিৎ।
যন্ন কিংচিদতঃ সত্বাঃ প্রকৃত্যা পরিনির্বৃতাঃ ॥১০০

১০০। যাহা শরীরে বা অন্যত্র নাই বা বাহ্যাভ্যন্তরে ও মিশ্রভাবে নাই বা পৃথক্‌ভাবেও নাই, তাহা সুতরাং কোন বস্তু নহে। অতএব সত্বগণ প্রকৃতিত পরিনির্বৃত বা মুক্তস্বভাব।

জ্ঞেয়াৎপূর্ব্বং যদি জ্ঞানং কিমালম্ব্যাস্য সম্ভবঃ।
জ্ঞেয়েন সহ চেজ্‌জ্ঞানং কিমালম্ব্যাস্য সম্ভবঃ॥১০১
অথ জ্ঞেয়াদ্ভবেৎ পশ্চাত্তদা জ্ঞানং কুতো ভবেৎ।
এবং চ সর্ব্বধর্ম্মাণামুৎপত্তির্নাবসীয়তে ॥১০২

১০১।১০২। জ্ঞেয়ের পূর্ব্বে যদি জ্ঞান হয় অথবা জ্ঞেয়ের সহিত যদি জ্ঞান হয় তবে তাহা কি আলম্বন করিয়া উৎপন্ন হইবে? আর জ্ঞেয় হইতে যদি পশ্চাৎ জ্ঞান হয়, তবেই বা জ্ঞান কিরূপে হইবে? জ্ঞেয়ের পূর্ব্বে হইলে জ্ঞেয় আলম্বন হইবে না, সহ হইলেও জ্ঞেয় জ্ঞানের পূর্ব্বভাবিকারণ বা আলম্বন হইবে না, আর পশ্চাৎ হইলে জ্ঞানকালে জ্ঞেয় থাকে না বলিয়া আলম্বন হইবে না। অতএব চিত্ত শূন্য এইরূপ ভাবনীয়। ইহাই চিত্তস্মৃত্যুপস্থান। ধর্ম্মস্মৃত্যুপস্থান যথা—"এইরূপে সর্ব্বধর্ম্মের উৎপত্তি প্রতীত হয় না।" উৎপত্তি না হইলে নিরোধও হয় না, অতএব সর্ব্বধর্ম্ম উৎপত্তি-নিরোধহীন শূন্য।

(এই সকল স্মৃত্যুপস্থান সাধন করা চিত্তনিরোধের উপায় বটে, কিন্তু যে যুক্তিতে উহার কর্ত্তব্যতা সিদ্ধ করার চেষ্টা করা হইয়াছে তাহা যে নিতান্ত অসার তাহা সহজেই বুঝা যায়)।

যদ্যেবং সংবৃতির্নাস্তি ততঃ সত্যদ্বয়ং কুতঃ।
অথ সাপ্যন্যসংবৃত্যা স্যাৎসত্ত্বো নির্বৃতঃ কুতঃ ॥১০৩

১০৩। সর্ব্বধর্ম্মের শূন্যতা কথিত হইল। বলিতে পার—যদি তাহা ঠিক হয় তাহা হইলে সত্যদ্বয় (৯।২) কিরূপে যুক্ত হয় (কারণ ইহাতে সংবৃতিসত্য নাই বলা হইল)। আর যদি বলা যায় যে অন্য (অমুক্ত ব্যক্তির) সংবৃতির দ্বারা সংবৃতিসত্য দৃষ্ট হইতে থাকে, তাহা হইলে শঙ্কা হইবে যে নির্ব্বাণ প্রাপ্ত পুরুষও যখন অন্যের সংবৃতির বা বুদ্ধির দ্বারা বিষয়ীকৃত হয়, তখন সত্ত্ব বরাবরই থাকিবে কদাপি নির্বৃত (নির্ব্বাণপ্রাপ্ত বা শূন্যভূত) হইবে না।

পরচিত্তবিকল্পোঽসৌ স্বসংবৃত্যা তু নাস্তি সঃ।
স পশ্চান্নিয়তঃ সোঽস্তি ন চেন্নাস্ত্যেব সংবৃতিঃ ॥১০৪

১০৪। শঙ্কার উত্তর—সেই যে নির্বৃতসত্ত্বকে বিষয়ীকরণ, তাহা পরচিত্তের কল্পনামাত্র। নির্বৃতের স্বসংবৃতির দ্বারা সেই পরিনির্বৃতসত্ত্ব থাকিবে না। (কারণ তাঁহার সংবৃতিই তখন থাকিবে না)। "ইহার পর ইহা হয়" এরূপ নিয়মবুদ্ধি থাকিলেই সংবৃতি থাকে। পরিনির্বৃত পুরুষের তাহা যখন থাকে না তখন সংবৃতিও থাকে না।

কল্পনা কল্পিতং চেতি দ্বয়মন্যোন্যনিশ্রিতং।
যথাপ্রসিদ্ধমাশ্রিত্য বিচারঃ সর্ব্ব উচ্যতে ॥১০৫

১০৫। কল্পনা এবং কল্পিত বিষয় এই দুইটী অন্যোন্যাশ্রিত। যথাপ্রসিদ্ধকে আশ্রয় করিয়া অর্থাৎ লোকব্যবহার গ্রহণ করিয়া সমস্ত বিচার বলা হয়।

বিচারিতেন তু যদা বিচারেণ বিচার্য্যতে।
তদানবস্থা তস্যাপি বিচারস্য বিচারণাৎ ॥১০৬

১০৬। বিচারও যখন কাল্পনিক স্বভাব, তখন তাহাও বিচার্য্য এরূপ শঙ্কার উত্তর দিতেছেন। বিচারিত বিষয় পুনঃ বিচারের দ্বারা বিচার করিলে তাহাতে অনবস্থা দোষ হয়। কারণ, তাহাতে বিচারের বিচার তাহার বিচার ইত্যাদি অপ্রতিষ্ঠা আসে।

বিচারিতে বিচার্য্যে তু বিচারস্যাস্তি নাশ্রয়ঃ।
নিরাশ্রয়ত্বান্নোদেতি তচ্চ নির্ব্বাণমুচ্যতে ॥১০৭

১০৭। বিচার্য্য বিষয় বিচারিত হইয়া গেলে আর বিচারের আশ্রয় থাকে না। নিরাশ্রয়ত্ব হেতু আর কোন বিচার উঠে না তখন সেই নির্ব্বি-চার অবস্থাকে নির্ব্বাণ বলা যায়।

যস্য ত্বেতদ্দ্বয়ং সত্যং স এবাত্যন্তদুঃস্থিতঃ।
যদি জ্ঞানবশাদর্থো জ্ঞানাস্তিত্বে তু কা গতিঃ ॥১০৮

১০৮। যাহার নিকট বিচার ও বিচার্য্য এই দুই ভাব পরমার্থ সত্য সে অত্যন্ত দুঃস্থিত ব্যক্তি (কারণ তাহার কদাপি নির্ব্বাণ হইবে না)। যদি জ্ঞানবশে বা প্রমাণসামর্থ্যে অর্থ বা প্রমেয় ব্যবস্থাপিত হয় এরূপ বল তাহাতেও জ্ঞানের অস্তিত্ব সিদ্ধ হয় না। কারণ স্বসংবেদন এইমতে স্বীকৃত নাই সুতরাং জ্ঞানের অস্তিত্ব কিসের দ্বারা নিরূপিত হইবে? (অতএব জ্ঞান শূন্যস্বভাব সুতরাং বিচার ও বিচার্য্য পরমার্থ সত্য নহে)।

অথ জ্ঞেয়বশাজ্ জ্ঞানং জ্ঞেয়াস্তিত্বে তু কা গতিঃ।
অথান্যোন্যবশাৎসত্ত্বমভাবঃ স্যাদ্দ্বয়োরপি ॥১০৯

১০৯। আর যদি বল জ্ঞেয়বশে জ্ঞান হয়, তবে জ্ঞেয়ের অস্তিত্ব কিরূপে সিদ্ধ হইবে? পরস্পরের বশে যদি পরস্পরের সত্তা হয়, তবে উভয়েরই অভাব হইবে। (বিরুদ্ধবাদী বলিতে পারে "উভয়েরই ভাব হইবে")।

পিতা চেন্ন বিনা পুত্রাৎ কুতঃ পুত্রস্য সম্ভবঃ।
পুত্রাভাবে পিতা নাস্তি তথাসত্ত্বং তয়োর্দ্বয়োঃ॥ ১১০

১১০। যদি পুত্রবিনা পিতা না থাকে তবে পুত্র কিরূপে হইবে? পুত্রের অভাবে পিতাও থাকে না। সেইরূপ জ্ঞান ও জ্ঞেয় এই দুইয়ের একতরের অভাব বলিয়া উভয়েরই অভাব।

(বলা বাহুল্য পুত্র হওয়া না থাকিলে পিতা 'শব্দ' থাকিত না। যখন তাহা আছে তখন উভয়ই আছে। সেইরূপ জ্ঞান এবং জ্ঞেয়ও আছে)।

অঙ্কুরো জায়তে বীজাদ্বীজং তেনৈব সূচ্যতে।
জ্ঞেয়াজ্ জ্ঞানেন জাতেন তৎসত্তা কিং ন গম্যতে॥১১১

১১২। শঙ্কা হইতে পারে—অঙ্কুর বীজ হইতে জন্মায় তাহাতে বীজ সূচিত হয়। সেইরূপ জ্ঞেয় হইতে জ্ঞান জাত হয়, অতএব তাহার (জ্ঞেয়ের) সত্তা কেননা উপলব্ধ হইবে?

অঙ্কুরাদন্যতো জ্ঞানাদ্বীজমস্তীতি গম্যতে।
জ্ঞানাস্তিত্বং কুতো জ্ঞাতং জ্ঞেয়ং যত্তেন গম্যতে॥১১২

১১২। শঙ্কার উত্তর—জ্ঞানপদার্থ অঙ্কুর হইতে ভিন্ন। সেই জ্ঞানের দ্বারা বীজ আছে বলিয়া নিশ্চিত হয়। কিন্তু জ্ঞানের অস্তিত্ব কিরূপে জানা যাইবে (এই বাদে স্বসংবেদন স্বীকৃত নহে বলিয়া) যাহাতে জ্ঞেয়ের সত্তা নিশ্চিত হইবে? (বিরুদ্ধবাদী বলিতে পারেন—জ্ঞানাস্তিত্ব যে নাই তাহা কিরূপে জানা যাইবে?)

এইরূপে মাধ্যমিকেরা সিদ্ধান্ত করিয়া বলেন যে "বাস্তবপক্ষে জ্ঞান ও জ্ঞেয় সিদ্ধ হয় না বলিয়া বিচার করা চলেনা। কাল্পনিক পক্ষে যথা-প্রসিদ্ধ ব্যবহার আশ্রয় করিয়া বিচার চলে।" ইহাতে বিরুদ্ধবাদী বলিতে পারেন যে বিচার যখন ব্যবহারিক তখন তাহাতে অব্যবহারিক পদার্থ আনা সর্ব্বথা অযুক্ত। ব্যবহারিক সত্তা ও অসত্তা লইয়া বিচার করিলে সতের অভাব ও অসতের ভাব বলা সঙ্গত হইতে পারে না। ঐ যথাপ্রসিদ্ধ সত্য

লইয়া বিচার করা উচিত। ব্যবহারত দেখা যায় সমস্ত সৎ পদার্থ (বিকারী হইলে) অবস্থান্তর প্রাপ্ত হয়, অসৎ হয় না। আর যাহা অসৎ তাহার সম্বন্ধে কিছু বক্তব্যই নহে। পরমার্থের জন্য কোন নির্ব্বিকার পদার্থ স্বীকার করিলে তাহাকে বিকারী পদার্থের বিরুদ্ধধর্ম্মা অথচ সৎপদার্থ স্বীকার করিতে হইবে ; সাংখ্যের পুরুষ তাদৃশ পদার্থ)।

লোকঃ প্রত্যক্ষতস্তাবৎসর্ব্বং হেতুমুদীক্ষতে।
পদ্মনালাদিভেদো হি হেতুভেদেন জায়তে ॥১১৩

১১৩। কোনও ভাবপদার্থ স্বত, পরত, স্বত-পরত বা অহেতুতে উৎপন্ন হয় না। ইহা বৌদ্ধমত। তদ্বিরুদ্ধ স্বভাববাদীদের মত নিরসিত হইতেছে। তাঁহারা বলেন রাজীবকেশরের বৈচিত্র্য, ময়ূরচন্দ্রিকা, কণ্টকের তৈক্ষ্ণ্য আদি অহেতুতে স্বভাবত উৎপন্ন হয়। তদুত্তরে বলিতেছেন—লোকেদের দ্বারা প্রত্যক্ষ করিয়া সর্ব্বদ্রব্যের হেতু প্রমিত হয়। পদ্মনালাদির ভেদ হেতুর ভেদেই উৎপন্ন হয়, অহেতুতে নহে।

কিংকৃতো হেতুভেদশ্চেৎ পূর্ব্বহেতু প্রভেদতঃ।
কস্মাচ্চেৎ ফলদো হেতুঃ পূর্ব্বহেতুপ্রভাবতঃ ॥১১৪

১১৪। সেই হেতুভেদ কিরূপে হয়? পূর্ব্বহেতুর প্রভেদ হইতে তাহা হয়। হেতু কেন ফলদ হয়?—পূর্ব্বহেতুর প্রভাবেই তাহা হয়।

ঈশ্বরো জগতো হেতুঃ বদ কস্তাবদীশ্বরঃ।
ভূতানি চেদ্ভবত্বেবং নামমাত্রেঽপি কিংশ্রমঃ ॥ ১১৫

১১৫। স্বভাববাদ নিরাকরণ করিয়া ঈশ্বরবাদ নিরাকরণ করিতেছেন। হেতু ব্যতীত কার্য্য হয় না ইহা সত্য, কিন্তু সেই হেতু ঈশ্বর বা শঙ্কর (ইহা ঈশ্বরবাদীর মত, তাঁহাদের জিজ্ঞাস্য) বল সেই ঈশ্বর কে? (পৃথিব্যাদি ভূতই ত সমস্তের কারণ দেখা যায় অতএব) পৃথিব্যাদি ভূতই কি ঈশ্বর? তাহা হইলে ভিন্ন নাম মাত্র লইয়া শ্রম করা হইতেছে।

অপিত্বনেকেঽনিত্যাশ্চ নিশ্চেষ্টা ন চ দেবতাঃ।
লঙ্ঘ্যাশ্চাশুচয়শ্চৈব ক্ষ্মাদয়ো ন স ঈশ্বরঃ ॥ ১১৬

১১৬। অপিচ অনেক, অনিত্য, নিশ্চেষ্ট, অতিক্রমণীয় ও অশুচি পার্থিবাদি দ্রব্য আছে, তাহারা দেবতা বা ঈশ্বর হইতে পারে না।

নাকাশমীশোঽচেষ্টত্বাৎ নাত্মা পূর্ব্বনিষেধতঃ।
অচিন্ত্যস্থ চ কর্ত্তৃত্বমপ্যচিন্ত্যং কিমুচ্যতে ॥ ১১৭

১১৭। আকাশও অচেষ্ট বলিয়া ঈশ্বর নহে। আত্মাও পূর্ব্বে নিরস্ত হওয়াতে ঈশ্বর নহে। যদি বল ঈশ্বর অচিন্ত্য, তাহা হইলে বলি সেই অচিন্ত্য পদার্থের কর্ত্তৃত্বও অচিন্ত্য, অতএব অবাচ্য। তথাপি তাহা বল কেন? (বৌদ্ধেরাও বলেন "প্রতীত্যসমুৎপাদস্য অচিন্ত্যত্বাৎ" প্রতীত্য সমুৎপাদ অচিন্ত্য হইলেও যেমন তৎসম্বন্ধে বৌদ্ধদের বহু বক্তব্য আছে, ঈশ্বরবাদীদেরও সেইরূপ)।

তেন কিং স্রষ্টুমিষ্টংচ আত্মা চেৎ নম্বসৌ ধ্রুবঃ!
ক্ষ্মাদি স্বভাব ঈশশ্চ জ্ঞানং জ্ঞেয়াদনাদি চ ॥ ১১৮
কর্ম্মণঃ সুখদুঃখে চ বদ কিং তেন নির্ম্মিতং।
হেতোরাদি র্ন চেদস্তি ফলস্যাদিঃ কুতো ভবেৎ ॥ ১১৯

১১৮। ১১৯। ঈশ্বর কি সৃষ্টি করিতে অভিপ্রায় করেন? যদি বল আত্মাকে—কিন্তু তাহাও ত্বন্মতে ধ্রুব। পৃথিবী, অপ্, তেজ, বায়ু, আকাশ, কাল, দিক্ ও মন ইহাদের স্বভাব, ঈশ্বর এবং (অনাদি) জ্ঞেয় হইতে উৎপদ্যমান জ্ঞান ইহা সব অনাদি, আর কর্ম্ম হইতেই সুখ ও দুঃখ হয়, অতএব বল ঈশ্বর কি নির্ম্মাণ করিয়াছেন?

যদি হেতুর আদি না থাকে তবে ফলের আদি কিরূপে থাকিবে?

কস্মাৎ সদা ন কুরুতে নহি সোঽন্যমপেক্ষতে।
তেনাকৃতোঽন্যো নাস্ত্যেব তেনাসৌ কিমপেক্ষতাং ॥ ১২০

১২০। ঈশ্বর সর্ব্বদা কেন সমস্তই করেন না? কারণ (তোমাদের

মতে) তিনি ত অন্য কিছুর অপেক্ষা করেন না অতএব অমুক কারণের অপেক্ষায় তিনি ইহা করেন না এরূপ বলিতে পার না)। ঈশ্বর করেন নাই এরূপ যখন কিছু নাই তখন তিনি কিসের অপেক্ষা করিবেন ?

অপেক্ষতে চেৎ সামগ্রীং হেতু র্ন পুনরীশ্বরঃ।
নাকর্ত্তুমীশঃ সামগ্র্যাং ন কর্ত্তুং তদভাবতঃ॥ ১২১

১২১। (আর যদি বল ঈশ্বর নিমিত্তকারণ তাহা ছাড়া সামগ্রী বা সমবায়ি ও অসমবায়ি কারণ আছে তাহাতে) যদি বল তিনি সামগ্রীর বা সমবায়ের অপেক্ষা করেন তাহা হইলে ঈশ্বর (সম্পূর্ণ) হেতু নহেন। সমবায়িকারণের করণবিষয়ে তিনি সমর্থ নহেন তাহাও বলিতে পার না (সর্ব্বশক্ত বলাতে) আবার সামগ্রীর কর্ত্তা এরূপও বলিতে পার না কারণ (ঈশ্বর ছাড়া) তাহা নাই।

করোত্যনিচ্ছন্নীশশ্চেৎ পরায়ত্তঃ প্রসজ্যতে।
ইচ্ছন্নপীচ্ছায়ত্তঃ স্যাৎ কুর্ব্বতঃ কুত ঈশতা॥ ১২২

১২২। সমবায়ি কারণ থাকিলে তবে ঈশ্বর কর্ত্তা ইহা ধরিলে বলিতে হইবে সেই কারণের দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া ঈশ্বর কার্য্য করেন। সুতরাং ইচ্ছা না থাকিলেও তাঁহাকে কার্য্য করিতে হয় অতএব তিনি পরায়ত্ত। স্বেচ্ছায় কার্য্য করিলেও তিনি ইচ্ছার আয়ত্ত। অতএব এইরূপে যিনি কার্য্য করেন তাঁহার ঈশ্বরতা কোথায় ? (জগৎকর্ত্তা সগুণ ঈশ্বর ইচ্ছাবান্ পুরুষ। তিনি স্বেচ্ছায় করেন। স্বেচ্ছায় করাকে 'ইচ্ছায়ত্ত' বলিলে তাদৃশ ইচ্ছায়ত্ততা দোষাবহ নহে)।

যেঽপি নিত্যানণূনাহু স্তেঽপি পূর্ব্বং নিবারিতাঃ।
সাংখ্যাঃ প্রধান মিচ্ছন্তি নিত্যং লোকস্য কারণং॥ ১২৩

১২৩। (নিত্যপরমাণুবাদী মীমাংসকাদি মতও অতঃপর নিরাকৃত হইতেছে)—যাঁহারা পরমাণুসকলকে নিত্য বলেন তাঁহাদের মত ত পূর্ব্বে

নিবারিত হইয়াছে (৯।৮৭ দ্রষ্টব্য)। আর সাংখ্যেরা নিত্য প্রধানকে লোকের কারণ বলেন।

সত্ত্বং রজস্তমশ্চেতি গুণা অবিষমস্থিতাঃ।
প্রধানমিতি কথ্যন্তে বিষমৈর্জগদুচ্যতে ॥ ১২৪

১২৪। সত্ত্ব, রজ ও তম অবিষমভাবে স্থিত এই তিন গুণকে প্রধান বলা যায়। তাহাদের বৈষম্যই জগৎ।

একস্য ত্রিস্বভাবত্বময়ুক্তং তেন নাস্তি তৎ।
এবং গুণা ন বিদ্যন্তে প্রত্যেকং তেঽপি হি ত্রিধা ॥ ১২৫

১২৫। একের ত্রিস্বভাব অযুক্ত (কেন অযুক্ত তাহা বৌদ্ধদের গ্রন্থে নাই) সুতরাং তাহা (প্রধান) নাই। (যদি বল যে ত্রিগুণাত্মকত্বরূপ এক স্বভাব না থাকুক, ত্রিস্বভাব তিন গুণ আছে) তাহাও নহে কারণ তাহারা প্রত্যেকে ত্রিধা। অর্থাৎ সাংখ্যেরা বলেন যে সমস্ত ত্রিগুণাত্মক। সত্ত্বাদিরাও সমস্তের অন্তর্গত সুতরাং সত্ত্ব বা রজ বা তম প্রত্যেকে ত্রিগুণাত্মক। (ইহা অবশ্য বালোচিত যুক্তি। সাংখ্যেরা গুণ সকলকে ত্রিগুণাত্মক বলেন না গুণবিকার দ্রব্যকে তাহা বলেন। একই দ্রব্যের দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, ও স্থৌল্য এই ত্রিস্বভাব, অগ্নির দহন প্রকাশাদি স্বভাব প্রভৃতি উদাহরণ)।

গুণাভাবে চ শব্দাদেরস্তিত্বমতি দূরতঃ।
অচেতনে চ বস্ত্রাদৌ সুখাদেরপ্যসংভবঃ ॥ ১২৬

১২৬। এইরূপে গুণের অভাবে শব্দাদির অস্তিত্বও অতিদূর। আর অচেতন ত্রিগুণাত্মক বস্ত্রাদিতে গুণধর্ম্ম সুখাদিও অসম্ভব। (ইহার উল্টা যুক্তি সত্য। তাহা যথা শব্দাদি সৎ, তাহারা প্রকাশ, ক্রিয়া ও স্থিতিস্বভাব অতএব তাহারা ত্রিগুণাত্মক সৎ। আর সাংখ্যেরা বলেন গ্রহণেই [মনে] প্রকাশাদি [সুখাদি] গুণধর্ম্ম, কিন্তু গ্রাহ্যে [বস্ত্রাদিতে] প্রকাশ্যাদি [সুখকরত্বাদি] ধর্ম্ম)।

তদ্ধেতুরূপা ভাবাশ্চেন্নন্থ ভাবা বিচারিতাঃ।
সুখাদ্যেব চ তে হেতু ন চ তস্মাৎ পটাদয়ঃ ॥ ১২৭

১২৭। যদি বল যে ভাব সকল সুখাদির হেতু, কিন্তু তাহা নহে। কারণ ভাব সকল মায়ার মত নিঃস্বভাব বলিয়া বিচারিত হইয়াছে। (এখানেও যুক্তি দোষ। সুখাদিও মায়া বস্ত্রাদিও মায়া অতএব বস্ত্রাদি হইতে সুখাদি হইবে না কেন ?) তোমাদের (সাংখ্যের) মতে সুখাদিই পটাদির হেতু অতএব পটাদি সুখাদির হেতু নহে।

(সাংখ্যেরা ত্রিগুণকেই হেতু বলেন ; গ্রহণগত অন্যতম ত্রিগুণধর্ম্ম সুখকে বা দুঃখকে পটাদির হেতু বলেন না। সুখ সত্ত্বপ্রধান ত্রিগুণধর্ম্ম)।

পটাদেস্তু সুখাদি স্যাত্তদভাবাৎ সুখাদ্যসৎ।
সুখাদীনাং চ নিত্যত্বং কদাচিন্নোপলভ্যতে ॥ ১২৮

১২৮। পটাদি হইতে সুখাদি যদি হয় তবে পটাদির অভাবে সুখাদি অসৎ অতএব সুখাদির নিত্যত্ব কদাপি উপলব্ধ হয় না। (সুখাদি 'অসৎ' নহে কিন্তু বিকারী। সত্ত্বাদি গুণই নিত্য কিন্তু প্রত্যেক গুণবিকার নিত্য নহে। তাহারা আগমাপায়ী। তাহারা ভাবান্তর প্রাপ্ত হয় কদাপি অসৎ হয় না)।

সত্যামেব সুখব্যক্তৌ সংবিত্তিঃ কিং ন গৃহ্যতে।
তদেব সূক্ষ্মতাং যাতি স্থূলং সূক্ষ্মং চ তৎ কথং ॥ ১২৯

১২৯। যদি সুখব্যক্তি সত্য হয় তবে সুখসংবেদন সর্ব্বদা হয় না কেন ? যদি বল তাহা তখন সূক্ষ্মতা প্রাপ্ত হয় বলিয়া গৃহীত হয় না, তবে বলি তাহা স্থূল হইলে পুনঃ সূক্ষ্ম হইবে কিরূপে ? কারণ নিত্যত্বহেতু এক বস্তুর নানা স্বভাব যুক্তিযুক্ত নহে। (ইহাও অসার আপত্তি। গুণসকল পরিণামি-নিত্য। এক ধর্ম্ম ব্যক্ত হয় আর এক ধর্ম্ম অব্যক্ত হয় এইরূপ যে বিকার বা পরিণাম তাহার প্রবাহই নিত্য। ভাবসকল ত্রিস্বভাব বলিয়া পর্য্যায়-ক্রমে এক স্বভাবের উদারভাব ও অপরের সূক্ষ্মভাব বা লয় হয়। তাহাই

বিকার। জগৎ বিকারী তাহা প্রত্যক্ষ সিদ্ধ অতএব তাহার মূলও বিকারী। একস্বভাব নিত্যপদার্থ মূল হইলে জগৎ বিকারী হইত না)।

স্থৌল্যং ত্যক্ত্বা ভবেৎ সূক্ষ্মম্ অনিত্যে স্থৌল্যসূক্ষ্মতে।
সর্ব্বস্য বস্তুনস্তদ্বৎ কিং নানিত্যত্বমিষ্যতে ॥ ১৩০

১৩০। স্থূলতা ত্যাগ করিয়া যখন ভাবসকল সূক্ষ্ম হয় (বল), তখন (বলি) স্থূলতা ও সূক্ষ্মতা অনিত্য, সর্ব্ববস্তুরও কি সেইরূপ অনিত্যতা তোমাদের (সাংখ্যদের) ইষ্ট হওয়া উচিত নহে? (মূল কারণ প্রধান ছাড়া সমস্ত কার্য্যই সাংখ্যমতে অনিত্য, কার্য্যেরাই স্থূলসূক্ষ্মরূপে ভাবান্তর প্রাপ্ত হয়)।

ন স্থৌল্যং চেৎ সুখাদন্যৎ সুখস্যানিত্যতা স্ফুটং।
নাসদুৎপদ্যতে কিঞ্চিদসত্ত্বাদিতি চেন্মতং ॥ ১৩১

১৩১। স্থৌল্য যদি সুখ হইতে ভিন্ন না হয় তাহা হইলে স্থৌল্যের নিবৃত্তি হইলে সুখেরও নিবৃত্তি হইবে সুতরাং সুখ স্পষ্টত অনিত্য হইবে। (ইহা দোষ নহে কারণ অনিত্য অর্থে অভাব নহে)। আর অবিদ্যমানতা-হেতু কোন অসৎ পদার্থ উৎপন্ন হয় না ইহা যদি আপনাদের মত হয় তবে—

ব্যক্তস্যাসত উৎপত্তিরকামস্যাপি তে স্থিতা।
অন্নাদোঽমেধ্যভক্ষঃ স্যাৎ ফলং হেতৌ যদি স্থিতং ॥ ১৩২

১৩২। অসৎ ব্যক্তের উৎপত্তি হয় ইহা ইচ্ছা না করিলেও আপনাদের মতে উহা আসিয়া পড়িতেছে। পরঞ্চ ফল যদি হেতুতে থাকে তবে অন্ন-ভোজী অমেধ্যভোজী হইবে। (ইহা এবং বক্ষ্যমাণ উদাহরণ বালোচিত আপত্তি। অসৎ ব্যক্ত উৎপন্ন হয় না; উৎপন্ন ভাবের সাধারণ নামমাত্র 'ব্যক্ত'। যাহা উৎপন্ন হয় তাহা পূর্ব্বে সূক্ষ্মরূপে থাকে। নিমিত্তের দ্বারা উপাদান পরিবর্ত্তিত হইলে কার্য্য হয়। অন্ন শরীরস্থ নিমিত্তের যোগে তবে অমেধ্য হয় অমনি হয় না)।

পটার্ঘেণৈব কর্পাসবীজং ক্রীত্বা নিবস্যতাং।

মোহাচ্চেনেক্ষতে লোকঃ তত্ত্বজ্ঞস্যাপি সা স্থিতিঃ। ১৩৩

১৩৩। (কিঞ্চ কারণে কার্য্য থাকিলে) বস্ত্রের মূল্যে কার্পাসবীজ ক্রয় করিয়া তাহাই পরিধান করুন। যদি বলেন যে মোহবশে লোকে কারণে কার্য্যের সূক্ষ্মাবস্থা দেখিতে পায় না, তাহাও ঠিক নহে কারণ তত্ত্বজ্ঞেরাও তাহা দেখিতে পান না। অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞেরাও মৃত্তিকা না খাইয়া অন্ন খান, কার্পাসবীজ পরিধান না করিয়া কার্পাসবস্ত্রই পরিধান করেন। (সাংখ্যেরাও বলিতে পারেন যে সূক্ষ্মদর্শী অর্হতেরা চিবাইয়া শূন্য খান না, কিন্তু প্রণীত (মিষ্ট) খাদনীয় ও ভোজনীয়ের দিকেই ঝোঁকেন। কিঞ্চ লোকে বস্ত্রের মূল্যের অর্দ্ধাপেক্ষা কমমূল্যে কার্পাসবীজ ক্রয় করিয়া বপন চয়ন বয়নাদি নিমিত্তে বস্ত্রের উদ্ভাবন করিয়া তবে পরিধান করে। কার্পাস বীজ যে বস্ত্রের একমাত্র কারণ তাহা উন্মাদেও বলে না)।

লোকস্যাপি চ তজ্‌জ্ঞানমস্তি কস্মান্ন পশ্যতি।

লোকাপ্রমাণতায়াং চেদ্ ব্যক্তদর্শনমপ্যসৎ॥ ১৩৪

১৩৪। সাধারণ লোকেরও সেই জ্ঞান আছে অতএব তাহারাই বা কেন কারণে কার্য্য দেখিতে পায় না। যদি বল লোকদের দৃষ্টি অপ্রামাণিক তবে ব্যক্তের দর্শনও (যাহা লোকগোচর) অসৎ।

(উত্তরে সাংখ্যেরা বলিতে পারেন যে লোকদেরও শূন্যতাজ্ঞান আছে তবে তাহারা জগৎকে শূন্য দেখেনা কেন? ফলত তত্ত্বজ্ঞান দ্বিবিধ, আনু-মানিক এবং যোগজ সাক্ষাৎকার। অনুমানের দ্বারা সামান্যত সকলেই ঐ সত্য জানিতে পারে। যোগীরাই উহা সাক্ষাৎকার করিয়া কারণকার্য্য-ক্রমে ত্রিকালের জ্ঞানলাভ করেন।

বৌদ্ধেরাও ত্রিকালজ্ঞান স্বীকার করেন কিন্তু তাহা কিরূপে হয় বুঝাইতে পারেন না। সৎকার্য্যবাদের দ্বারাই উহা বুঝা যায়। 'অপ্রমাণ' ও ও 'অসৎ' এই দুই শব্দ একার্থক ধরিয়া এই স্থলে ন্যায়াভাস সৃষ্ট হইয়াছে।

অপ্রমাণ অর্থে এস্থলে মিথ্যাজ্ঞান বা উল্টাজ্ঞান আর অসৎ অর্থে অভাব। লোকদের দর্শন ভ্রান্ত তাহা সত্য, ব্যক্তদর্শনও তাদৃশ মিথ্যাজ্ঞান—অসৎ নহে—তাহা সাংখ্যসম্মত)।

প্রমাণমপ্রমাণং চেৎ নন্নু তৎ প্রমিতং মৃষা।
তত্ত্বতঃ শূন্যতা তস্মাদ্ভাবানাং নোপপদ্যতে ॥ ১৩৫

১৩৫। সাংখ্যেরা সিদ্ধান্তবাদীদের (বৌদ্ধদের) মতে এইরূপ দোষ দেন—যদি আপনাদের মতে প্রমাণ অপ্রমাণ হয় (মায়াত্মক বলিয়া) তবে প্রমাণের দ্বারা প্রমিত বিষয় মিথ্যা হইবে। তাহাতে আপনারা যে ভাব-পদার্থে শূন্যতা প্রমাণ করেন তাহাও অলীক কথা হইবে।

কল্পিতং ভাবমস্পৃষ্ট্বা তদভাবো ন গৃহ্যতে।
তস্মাদ্ভাবো মৃষা যোহি তস্যাভাবঃ স্ফুটং মৃষা ॥ ১৩৬

১৩৬। উক্ত দোষের পরিহার করিতেছেন—কল্পিত এক ভাব পদার্থ গ্রহণ না করিয়া তাহার অভাব গৃহীত হয় না। অতএব ভাবটা যদি মিথ্যা হয় তবে তাহার অভাব স্পষ্টতই মিথ্যা।

(উত্তরটা অসার, কারণ ভাবপদার্থ কল্পনা করিয়া জানা যায় না কিন্তু প্রত্যক্ষত জানা যায়; আর অভাব পদার্থ সর্ব্বথা কাল্পনিক। আর প্রমাণই যখন নাই তখন 'ভাবোমৃষা' ইহাই বা কিরূপে প্রমাণ কর)?

তস্মাৎস্বপ্নে সুতে নষ্টে সো নাস্তীতি বিকল্পনা।
তদ্ভাবকল্পনোৎপাদং বিবধ্নাতি মৃষা চ সা ॥ ১৩৭

১৩৭। অতএব স্বপ্নে পুত্র নষ্ট হইলে 'সে নাই' এরূপ যে বিকল্পনা হয় তাহাতে সেই পুত্রের অস্তিত্বকল্পনার উৎপাদ নিষিদ্ধ হইলেও সেই ভাবাভাব কল্পনা সবই মিথ্যা।

(কাল্পনিক বিষয় মিথ্যা—অসৎ নহে—হইতে পারে, কিন্তু কল্পনাশক্তিটা কি? তাহা অসতী অথচ তদ্দ্বারা সমস্ত হয়। আর মিথ্যা থাকিলে সত্যও আছে। সত্য কি? তাহা কিসের দ্বারা জানা যায়? মিথ্যাকল্-

নার দ্বারাও এতন্মতে সত্য জানা যাইবে ইত্যাদি নানা ন্যায়দোষের প্রসঙ্গ হয়; বৌদ্ধেরা তাহার উত্তর দিতে পারেন না)।

তস্মাদেবং বিচারেণ নাস্তি কিংচিদহেতুতঃ।
ন চ ব্যস্তসমস্তেষু প্রত্যয়েষু ব্যবস্থিতং ॥ ১৩৮

১৩৮। অতএব এইরূপ বিচারের দ্বারা সিদ্ধ হয় যে কিছুই অহেতুতে নাই। আর ব্যস্তে (স্বত অথবা পরত) বা সমস্তে (স্বতপরত দুই মিলিয়া) কোনরূপে বস্তুর উৎপাদ ব্যবস্থিত বা প্রতিষ্ঠিত নহে।

অন্যতো নাপি চায়াতং ন তিষ্ঠতি ন গচ্ছতি।
মায়াতঃ কো বিশেষোঽস্য যন্মূঢ়ৈঃ সত্যতঃ কৃতং ॥ ১৩৯

১৩৯। কোন পদার্থ অন্য কিছু হইতে আসেনা, তাহারা থাকেও না যায়ও না। ইহা সব মায়া ছাড়া আর কিছু নহে। মূঢ়েরাই ইহাকে সত্য করিয়াছে। (কিন্তু মায়া অগত্যা আছে বা সত্য)।

মায়য়া নির্ম্মিতং যচ্চ হেতুভির্যচ্চ নির্ম্মিতং।
আয়াতি তৎ কুতঃ কুত্র যাতি চেতি নিরূপ্যতাং ॥ ১৪০

১৪০। যাহা মায়ার দ্বারা নির্ম্মিত এবং যাহা হেতুর দ্বারা নির্ম্মিত তাহা কোথা হইতে আসে কোথায়ই বা যায় নিরূপণ করুন।

যদন্যসংনিধানেন দৃষ্টং ন তদভাবতঃ।
প্রতিবিম্বসমে তস্মিন্ কৃত্রিমে সত্যতা কথং ॥ ১৪১

১৪১। যে বস্তুরূপ অন্যের (হেতুর) সন্নিধানের দ্বারা দৃষ্ট হয় কিন্তু অন্যের অভাবে দৃষ্ট হয় না তাহা পরাধীন বৃত্তি বলিয়া প্রতিবিম্বের মত কৃত্রিম। তাহার সত্যতা কোথায়?

বিদ্যমানস্য ভাবস্য হেতুনা কিং প্রয়োজনম্।
অথাপ্যবিদ্যমানোঽসৌ হেতুনা কিং প্রয়োজনম্ ॥ ১৪২

১৪২। বিদ্যমান ভাবের হেতুতে কি প্রয়োজন আর উহা অবিদ্যমান হইলেই বা হেতুতে কি প্রয়োজন?

নাভাবস্য বিকারোঽস্তি হেতুকোটিশতৈরপি।
তদবস্থঃ কথংভাবঃ কো বাঙ্গো ভাবতাং গতঃ॥ ১৪৩

১৪৩। শতকোটি হেতুর দ্বারাও অভাবের বিকার হয় না অতএব অভাবের বিকারাবস্থা কিরূপে ভাব হইবে? অন্য বা কি ভাবত প্রাপ্ত হইবে?

নাভাবকালে ভাবশ্চেৎ কদা ভাবো ভবিষ্যতি।
নাজাতেন হি ভাবেন সোঽভাবোঽপগমিষ্যতি॥ ১৪৪

১৪৪। অভাবকালে যদি ভাব না থাকে তবে ভাব কবে হইবে। যাবৎ ভাব না হয় তাবৎ অভাবের অপগম হয় না।

ন চানপগতেঽভাবে ভাবাবসরসম্ভবঃ।
ভাবশ্চাভাবতাং নৈতি দ্বিস্বভাবপ্রসঙ্গতঃ॥ ১৪৫

১৪৫। অভাব অপগত না হইলে ভাবাবসর সম্ভব হয় না। ভাবও কখনও অভাবতা প্রাপ্ত হয় না যেহেতু তাহাতে দ্বি-স্বভাবের প্রসঙ্গ হয়।

(এই সকল শব্দমাত্রময় হেত্বাভাস সৃষ্টি করিয়া জগৎ নাই প্রমাণের চেষ্টা করা হইয়াছে। ভাব অর্থে যাহা আছে; অভাব অর্থে যাহা নাই। সুতরাং সংভাব, অসংভাব, সংঅভাব, অসং অভাব ইত্যাদি প্রয়োগ ব্যর্থ শব্দাড়ম্বর মাত্র)।

এবং চ ন নিরোধোঽস্তি ন চ ভাবোঽস্তি সর্ব্বদা।
অজাতমনিরুদ্ধং চ তস্মাৎ সর্ব্বমিদং জগৎ॥ ১৪৬

১৪৬। এইরূপে বিনাশ নাই এবং বস্তুর সত্তাও নাই। এই সমস্ত জগৎ জন্মায় নাই এবং নাশও হয় নাই।

(এই প্রাচীনতর মায়াবাদ বর্ত্তমান মায়াবাদের মূল। সেইজন্য মায়াবাদীদের প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ বলা হয়। আধুনিক মায়াবাদীরাও এইরূপ উপায়েই জগৎ নাই প্রমাণ করিতে যান)।

স্বপ্নোপমাস্তু গতয়ো বিচারে কদলীসমাঃ।
নির্বৃতানির্বৃতানাং চ বিশেষো নাস্তি বস্তুতঃ॥ ১৪৭

১৪৭। দেবমনুষ্যাদি লোকে যে গতি হয় তাহা স্বপ্নোপম। তাহা বিচার করিলে কদলীকাণ্ডের ন্যায় নিঃসার হয়। মুক্ত ও বদ্ধদের বস্তুত প্রভেদ নাই।

(বস্তুই যখন নাই তখন 'বস্তুত' কাহাকে বলা যাইবে? আর্ষ-দার্শনিকেরাও এইরূপ বলেন বটে কিন্তু তাহা মুক্তস্বভাব পুরুষকে লক্ষ্য করিয়া। "বন্ধ মোক্ষৌ কুতো মে" ইত্যাদি বৈদান্তিকের গাথা দ্রষ্টব্য)।

এবং শূন্যেষু ধর্ম্মেষু কিং লব্ধং কিং হৃতং ভবেৎ।
সৎকৃতঃ পরিভূতো বা কেন কঃ সংভবিষ্যতি॥ ১৪৮
কুতঃ সুখং বা দুঃখং বা কিং প্রিয়ং বা কিমপ্রিয়ম্।
কা তৃষ্ণা কুত্র সা তৃষ্ণা মৃগ্যমাণা স্বভাবতঃ॥ ১৪৯
বিচারে জীবলোকঃ কঃ কো নামাত্র মরিষ্যতি।
কো ভবিষ্যতি কো ভূতঃ কো বন্ধুঃ কস্য কঃ সুহৃৎ॥১৫০

১৪৮—৫০। এইরূপে ধর্ম্মসকল শূন্য প্রতিপন্ন হওয়াতে—কি লব্ধ কি বা হৃত হয়? কাহার দ্বারা কে সৎকৃত বা পরিভূত হয়? সুখ বা দুঃখ, প্রিয় বা অপ্রিয় কোথায়? স্বভাব ধরিয়া অন্বেষণ করিলে তৃষ্ণা কি হয় বা কোথায় থাকে? বিচার করিয়া দেখিলে জীবলোক কি? কেই বা এখানে মরে,কেই বা হয়,কেই বা হইয়াছিল,কে বা বন্ধু আর কেবা কাহার সুহৃৎ?

(বৌদ্ধেরা যে দৃষ্টি হইতেই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হউন না কেন ইহা সর্ব্বথা সত্য এবং সমস্ত মোক্ষদার্শনিকদের অভিমত। বৈদান্তিকেরা জগৎকে মায়াময় বলেন, সাংখ্যেরাও বলেন যে মূল কারণ অব্যক্ত অদর্শনীয়, যাহা দৃষ্টিপথ প্রাপ্ত হয় তাহা মায়ার মত তুচ্ছ)।

সর্ব্বমাকাশসংকাশং পরিগৃহ্নন্তু মদ্বিধাঃ।
প্রকুপ্যন্তি প্রহৃষ্যন্তি কলহোৎসবহেতুভিঃ॥১৫১

১৫১। এই সমস্তই আকাশকল্প, আমাদের মত মূঢ় জনেরাই ইহাতে স্বরূপ আরোপ করিয়া গ্রহণ করে এবং কলহে প্রকুপিত ও উৎসবে প্রহৃষ্ট হয়।

শোকায়াসৈর্বিষাদৈশ্চ মিথশ্ছেদনভেদনৈঃ।
যাপয়ন্তি সুকৃচ্ছ্রেণ পাপৈরাত্মসুখেচ্ছবঃ ॥ ১৫২

১৫২। আত্মসুখেচ্ছু জনেরা শোক, আয়াস ও বিষাদ এবং পরস্পর ছেদন ভেদনরূপ পাপে অতি কষ্টে কাল কাটায়।

মৃতাঃ পতন্ত্যপায়েষু দীর্ঘতীব্রব্যথেষু চ।
আগত্যাগত্য সুগতিং ভূত্বা ভূত্বা সুখোচিতাঃ ॥ ১৫৩

১৫৩। মৃত হইয়া তাহারা দীর্ঘকাল তীব্রব্যথাদায়ী নরকে পতিত হয়, অথবা সুখকর সুগতি প্রাপ্ত হইয়া পুনঃ পুনঃ উৎপন্ন হইতে থাকে।

ভবে বহুপ্রপাতশ্চ তত্র চাসত্ত্বমীদৃশম্।
তত্রান্যোন্যবিরোধশ্চ ন ভবেত্তত্ত্বমীদৃশম্ ॥ ১৫৪

১৫৪। সংসারে বহুবিধ প্রপাত বা উপঘাত আছে এবং উক্তরূপ অসত্ত্ব বা অতত্ত্ব আছে। আর তাহাতে অন্যোন্যবিরোধ আছে এবং ঈদৃশ তত্ত্বও তাহার নহে (এতাদৃশ বস্তুতে অনেকাকার সমারোপিত হয় বলিয়া)।

তত্র চানুপমাস্তীব্রা অনন্তদুঃখসাগরাঃ।
তত্রৈবমল্পবলতা তত্রাপ্যল্পত্বমায়ুষঃ ॥১৫৫

তত্রাপি জীবিতারোগ্যব্যাপারৈঃ ক্ষুৎক্লমশ্রমৈঃ।
নিদ্রয়োপদ্রবৈর্বালসংসর্গৈঃ নিষ্ফলৈস্তথা ॥ ১৫৬

বৃথৈবায়ুর্হত্যাশু বিবেকস্তু সুদুর্লভঃ।
তত্রাপ্যভ্যস্তবিক্ষেপনিবারণগতিঃ কুতঃ ॥ ১৫৭

১৫৫—৫৭। আর সংসারে অনুপম, তীব্র, অনন্ত দুঃখ সাগর আছে এবং হীনবীর্য্যতা ও অল্পায়ুষ্কতাও আছে। আর তাহাতে জীবন ও আরোগ্যের চেষ্টায় ক্ষুধা, ক্লান্তি, শ্রমে ও নিদ্রায়, উপদ্রবে, নিষ্ফল বালসংসর্গে

আয়ু বৃথা ও শীঘ্রই নষ্ট হইয়া যায়। বিবেক এই সংসারে সুদুর্লভ; আর সংসারে পূর্ব্বাভ্যস্ত অস্থৈর্য্যের নিবারণ করার উপায়াবলম্বন কোথায়?

তত্রাপি মারো যততে মহাপায়প্রপাতনে।
তত্রাসন্মার্গ-বাহুল্যাদ্বিচিকিৎসা চ দুর্জ্জয়া॥ ১৫৮

১৫৮। আর তাহাতে (সংসারে) মার মহাদুর্গতিতে ফেলিবার চেষ্টা করিতেছে এবং তথায় বহুবিধ অসৎমার্গ থাকাতে দুর্জ্জয়া বিচিকিৎসা বা সংশয় আছে।

পুনশ্চ ক্ষণদৌর্লভ্যং বুদ্ধোৎপাদোঽতিদুর্লভঃ।
ক্লেশৌঘো দুর্নিবারশ্চেত্যহো দুঃখপরম্পরা॥১৫৯

১৫৯। আর সংসারে কথঞ্চিৎ সুগতি প্রাপ্ত হইলেও অষ্টবিধ ক্ষণসম্পদ দুর্লভ, বুদ্ধোৎপাদও অতি দুর্লভ। তাহাতে দুর্নিবার ক্লেশরাশি আছে অতএব অহো! সংসারে কেবল দুঃখের অবিরল প্রবাহ।

অহো বতাতিশোচ্যত্বমেষাং দুঃখৌঘবর্ত্তিনাম্।
যে নেক্ষন্তে স্বদৌঃস্থিত্যমেবমপ্যতিদুঃস্থিতাঃ॥ ১৬০

১৬০। অহো! এই দুঃখস্রোতে নিমগ্ন প্রাণীদের অবস্থা অতি শোচনীয়। তাহারা এইরূপে অতিশয় দুঃস্থিত হইয়াও নিজেদের দৌঃস্থিত্য বুঝিতে পারে না।

স্নাত্বা স্নাত্বা যথা কশ্চিদ্বিশেদ্বহ্নিং মুহুর্মুহুঃ।
স্বসৌস্থিত্যং চ মন্যন্ত এবমপ্যতিদুঃস্থিতাঃ॥ ১৬১

১৬১। কোনও উপহতবুদ্ধি ব্যক্তি যদি পুনঃ পুনঃ স্নান করিয়া (শীতের জন্য) মুহুর্মুহু অগ্নিতে প্রবেশ করে সেইরূপ সত্ত্বেরাও অতিদুঃস্থিত হইয়াও নিজের সৌস্থিত্য কল্পনা করে।

অজরামরলীলানামেবং বিহরতাং সতাং।
আয়াস্যন্ত্যাপদো ঘোরাঃ কৃত্বা মরণমগ্রতঃ॥১৬২

১৬২। অজর অমরের মত লীলা বা চেষ্টা করিয়া নিশ্চিন্তভাবে বিহরণ-কারী প্রাণীদের মরণকে সম্মুখে করিয়া ঘোর আপদ সকল উপস্থিত হয়।

এবং দুখাগ্নিতপ্তানাং শান্তিং কুর্যামহং কদা।
পুণ্যমেঘসমুদ্ভূতৈঃ সুখোপকরণৈঃ স্বকৈঃ ॥১৬৩

১৬৩। নিজের পুণ্যরাশিসমুদ্ভূত সুখকর উপকরণের দ্বারা এইরূপে? দুঃখাগ্নিতপ্ত প্রাণীদের কবে আমি (বুদ্ধ হইয়া) শান্তিবিধান করিব ?

কদোপলম্ভদৃষ্টিভ্যো দেশয়িষ্যামি শূন্যতাম্।
সংবৃত্যানুপলম্ভেন পুণ্যসংভারমাদরাৎ ॥ ১৬৬

১৬৪। কবে উপলম্ভদৃষ্টিতে বা সাক্ষাৎ উপলব্ধি করিয়া (ব্যবহারদৃষ্টি আশ্রয় করিয়া নহে) শূন্যতার উপদেশ করিব ? আর কবে অনুপলম্ভপূর্ব্বক (দেয়, দায়ক ও প্রতিগ্রাহক এই তিন ভাব ত্যাগ করিয়া) সসংকারে পুণ্যসংভারের উপদেশ করিব ?

উপসংহারে ব্যবহারদৃষ্টি ও পারমার্থিক দৃষ্টি বিচার্য্য। ব্যবহার ও পরমার্থ এই দুই শব্দের অর্থ লইয়া অনেক গোল হয় এবং ঐ দুই পদের অনেক দার্শনিক অপব্যবহার হয়। ব্যবহার দৃষ্টি অর্থে সাধারণত আমরা অন্তর্বাহ্য বিষয় যেরূপ জানি এবং যে অর্থে বা প্রয়োজনে ব্যবহার করি। পরমার্থ অর্থে পরম প্রয়োজন যে মোক্ষ তাহা। তদর্থে যাহা জ্ঞেয় ও কার্য্য তদ্বিষয়ক জ্ঞানই পরমার্থ দৃষ্টি। পরমার্থ বিষয়ের যথার্থ জ্ঞান পর-মার্থ সত্যজ্ঞান, আর ব্যবহার বিষয় লইয়া বা তাহাকে ভিত্তি করিয়া পর-মার্থ সত্যে আমরা উপনীত হই।

এক্ষণে বুঝিতে হইবে যে পরমার্থ দৃষ্টি ও পরমার্থ সিদ্ধি—এই দুইটি পৃথক্ পদার্থ। চিত্তবৃত্তির নিরোধ হইলে পরমার্থসিদ্ধি হয়। সুতরাং তখন বাক্য ও মনের নিবৃত্তি হয় অর্থাৎ তখন কোন বাহ্যজ্ঞান থাকে না, কথাও থাকে না, অতএব সত্যমিথ্যা আদি কোনও পদার্থের দৃষ্টি থাকে

না। আর পরমার্থ দৃষ্টি অর্থে পরম অর্থসাধনের উপযোগী প্রজ্ঞা বা দর্শন। তাহাতে অবশ্য চিত্ত বা জ্ঞান-ইচ্ছাদি সব থাকে সুতরাং সত্য-মিথ্যা, ভাব-অভাব, সৎ-অসৎ, কার্য্য-অকার্য্য ইত্যাদি সব যথাযথ জানিতে ও করিতে হয়। বাদীদের কেহ বলেন এই অবস্থায় জগৎ শূন্য, কেহ বলেন তাহা মায়া ; কেহ বা বলেন অব্যক্ত ত্রিগুণ ইত্যাদি। ইহাদের মধ্যে কোন্‌টা যথার্থের বা সত্যের ভাষণ তাহাই বিচার্য্য।

অনেকের এরূপ দার্শনিক অপরিপাক আছে যে তাঁহারা পরমার্থ **সিদ্ধি** ও পরমার্থ দৃষ্টি এই দুইয়ের ভেদ করিতে না পারিয়া পরমার্থসিদ্ধিতে যাহা হয় পরমার্থদৃষ্টিতে তাহার অবতারণা করিয়া ঐ অপরিপাকের পরিচয় দেন। পরমার্থদৃষ্টিতে প্রত্যক্ষানুমানাদি প্রমাণের দ্বারা পদার্থ প্রমিত করিয়া চলিতে হয়, তাহাতে 'অপ্রমেয়, অনির্বাচ্য' ইত্যাদি কথা বলা নিতান্ত অযুক্ততা।

বৌদ্ধেরা বলেন 'নির্ব্বাণং শূন্যোপমং মায়োপমং তথাগতঃ শূন্যোপমঃ মায়োপমঃ', এইরূপ কথা সর্ব্ববাদীদের অনুমত ; কারণ, সাংখ্য-বেদান্ত আদি নির্ব্বাণবাদীরা সকলেই জগৎকে ও জাগতিক দ্রব্যকে ঐরূপ ভ্রান্তি বলেন। ঐ চরম অবস্থায় যাওয়ার জন্য ঐ ভ্রান্তি বা অবিদ্যা যে ত্যাজ্য তাহাও সর্ব্বসম্মত। ঐ পদ উপলব্ধি করার জন্য যুক্তিযুক্ত দর্শন চাই। 'নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাঽভাবো বিদ্যতে সতঃ' এই সত্য স্বস্থ ও সরল ন্যায়প্রবণ-চিত্ত দার্শনিকদের মূল অবলম্ব্য তথ্য। কিন্তু শূন্যবাদীদের বলিতে হয় সতের মূল শূন্য, মায়াবাদীদের বলিতে হয় তাহা অনির্বাচ্য, আরম্ভবাদী-দের বলিতে হয় তাহা অসৎ—ইত্যাকার অযুক্ত কথা বলিয়া ইঁহাদের অসম্যক্ পরমার্থ দর্শন খাড়া করিতে হয়।

যদি সবই শূন্য, তবে—শূন্য দুঃখের জন্য, শূন্য দেহী সত্ত্ব, শূন্য চারি আর্য্যসত্যের প্রজ্ঞা পূর্ব্বক শূন্য অষ্টাঙ্গিকমার্গে গমন করিয়া শূন্য নির্ব্বাণের শূন্য লাভ করে। সেইরূপ সব মায়াময় বা মিথ্যা হইলে—মিথ্যা জীব,

মিথ্যা বেদের মিথ্যা প্রমাণে মিথ্যা কর্ত্তব্য মিথ্যা সাধন করিয়া মিথ্যা মুক্তি লাভ করে। এরূপ 'শূন্য' ও 'মিথ্যা' পদ পরমার্থ-দর্শনে ব্যবহার করা যে সম্পূর্ণ অন্যায্যও অপ্রয়োজন তাহা বলা বাহুল্য।

ইতি কাপিলমঠাচার্য্যকৃত বোধিচর্য্যাবতারের
নবম পরিচ্ছেদ প্রজ্ঞাপারমিতার
অনুবাদ সমাপ্ত।

গ্রন্থ সমাপ্ত।